বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা



নন্দগোপাল সেনগুপ্ত

বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, বর্ত্তমানে দৈনিক যুগান্তরের সহযোগী সম্পাদক এবং 'শতাব্দী ও সাহিত্য', 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ', 'সেতু', 'মিছে কথা', 'কাঁটা তার' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

চক্রবর্ত্তী, চাটার্জ্জি এণ্ড কোং লিমিটেড্

পুস্তকবিক্রেতা ও প্রকাশক

১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীরমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, এম্. এস্-সি.
১৫নং কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা

প্রথম মুদ্রণ, ১৯৪০
মূল্য দুই টাকা

মুদ্রাকর—
শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর সেন
মডার্ণ ইণ্ডিয়া প্রেস
৭নং ওয়েলিংটন স্কোয়ার,
কলিকাতা

বরেণ্য

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কবিসার্ব্বভৌমেষু

গ্রন্থকারের অপরাপর বই

সেতু	কবিতা	১।০
ছন্দপতন	গল্প	১৲
মিছে কথা	”	১৲
হারাণবাবুর ওভারকোট	”	।৶০
প্রেম ও পাদুকা	নক্সা	১।০
সুইসাইড	নক্সা ও নাটিকা	১৲
বনটিয়া	নাটিকা	॥০
অদৃশ্য সঙ্কেত	উপন্যাস	১৲
দু নৌকোয়	”	১।০
কাঁটা তার	”	১৲
ধোঁয়া	”	২৲
শতাব্দী ও সাহিত্য	প্রবন্ধ	২৲

সুধাংশুশেখর সেনগুপ্তের সঙ্গে লেখা

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ	প্রবন্ধ	৸০

ভূমিকা

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন শান্তিনিকেতনে ছিলাম, সেই সময় কবি আমাকে লোক-শিক্ষা বিভাগের পাঠ্য-তালিকার জন্যে প্রাচীন ও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের পরিচায়ক একখানি বই লিখবার ভার দেন। তিনি বলেন যে প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের পন্থা না ধরে, আমি যেন বিষয়টিকে সাহিত্যের দিক থেকেই অনুসরণ করি এবং সমাজ ও সংস্কৃতির যে অবস্থায়, যখন যে চিন্তাধারা জন্মলাভ করেছে, তৎকালীন সাহিত্য তার প্রভাবে কি ভাবে রূপান্তরিত হয়ে এসেছে, সেই দিকটা উদ্ঘাটিত করে দেখানোই যেন আমি এই বইয়ের লক্ষ্য স্বরূপ নিই। বলাবাহুল্য আমি সানন্দেই কবির নির্দ্দেশ শিরোধার্য্য করি এবং যত শীঘ্র সম্ভব প্রাচীন অধ্যায়গুলি (বর্ত্তমান বইয়ের প্রথম খণ্ড) লিখে তাঁর হাতে উপস্থিত করি। কবি সমস্তটা যত্ন নিয়ে পড়েন এবং পরবর্ত্তী অংশগুলি লিখে শেষ করারও তাগিদ দেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আকস্মিকভাবেই শিক্ষায়তন থেকে এসে পড়ি সাংবাদিকতার ভেতর এবং পরিকল্পিত বইয়ের পাণ্ডুলিপিটিও পড়ে থাকে অনেক দিন পর্য্যন্ত উপেক্ষিত হয়ে।

ইতিমধ্যে 'বাতায়ন' সম্পাদক বন্ধু অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল মহাশয় তাঁর কাগজে ধারাবাহিকভাবে সাহিত্য-প্রসঙ্গ লেখার ভার দিলেন এবং প্রতি সপ্তাহে তাগাদা দিয়ে দিয়ে দিলেন আমার পালানোর পথ বন্ধ করে। তখন ত্রিলোচন শর্ম্মার ব-নামে আধুনিক কাল নিয়ে লেখা সুরু করলাম এবং এক বৎসরে সমস্তটা শেষ করে ফেললাম। ইতিমধ্যে প্রাচীনকাল

সম্বন্ধীয় অধ্যায়গুলিও প্রবন্ধ-আকারে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুই পর্ব্ব একত্র করে এবং বিধিমতো সংস্কার ও সংশোধন করে তখন তৈরি করলাম এই বই। সাহিত্যক্ষেত্রে আমার শুভানুধ্যায়ী বন্ধুরা এবং পরিচিত সাহিত্যিক ও সাংবাদিক অনেকেই বইটি প্রকাশ করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। অধ্যাপক কুমুদচন্দ্র রায়চৌধুরী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আগ্রহে শেষে বইটি ছাপা হল। এইজন্যে কবিগুরু, বন্ধু অবিনাশচন্দ্র, রায়চৌধুরী মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়, সকলের কাছেই আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞ।

'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' বাংলা সাহিত্যের বিধিবদ্ধ ইতিহাস নয়। ক্রম-বিকাশের ধারা বোঝাবার জন্যে এতে মোটামুটিভাবে একটা ঐতিহাসিক কাঠামো অনুসরণ করলেও, প্রধানতঃ আমি লক্ষ্য রেখেছি, এক-একটি ভাবধারার উদ্ভব ও তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কি করে এক-একটি সাহিত্য-পর্য্যায় গড়ে তুলেছে, তারই স্বরূপ বিশ্লেষণ করার ওপর। তাই সাহিত্যিক এই বইয়ে উপলক্ষ্য, সাহিত্যই এর প্রধান অবলম্বন এবং সমসাময়িক রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আবহাওয়ার ভেতর তার কখন কি রকম রূপান্তর হয়েছে, সেই দিকটাই আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি বিশেষ করে। আধুনিক দৃষ্টি ও মননশীলতার আলোয় বিচার করেছি, কাজেই অনেক ক্ষেত্রে Trans-valuation of values হয়েছে, যা সমালোচনার ইতিহাসে চিরকালই হয়ে থাকে।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও রাজেন্দ্রলাল মিত্র থেকে একেবারে আজ পর্য্যন্ত, বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই। তাঁদের কয়েক জনের রচিত বইয়ের তালিকা আমি গ্রন্থ-ঋণে উদ্ধৃত করেছি। এঁরা ছাড়াও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারুচন্দ্র

বন্দ্যোপাধ্যায়, অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী, প্রমথ চৌধুরী, কালিদাস রায় প্রমুখ মনীষীদের রচনায় বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন স্তর আলোচিত হয়েছে। যতটা সম্ভব, আমি এই সব রচনা পড়েছি এবং এঁদের মতের সঙ্গে যেখানে আমার মিল হয়েছে, সেখানে এঁদের অনুগমনই করেছি—যেখানে হয়নি, সেখানে অবশ্য স্বকীয় মতই ব্যক্ত করেছি। পাদটীকা এবং উদ্ধৃতি দিয়ে ভারাক্রান্ত না করে, সেই সমস্ত সমর্থন ও প্রতিকূলতার ক্ষেত্রগুলি আমি পাঠক-পাঠিকার অনুসন্ধিৎসার ওপরই ছেড়ে দিয়েছি।

এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায় যখন খণ্ড-প্রবন্ধ রূপে নানা সাময়িক-পত্রে বেরিয়েছিল, তখন অনেকে চিঠিপত্রে এবং সাক্ষাৎ আলোচনায় আমায় অনেক নূতন চিন্তার সঞ্চয় দিয়ে উপকৃত করেছেন। এঁদের মধ্যে প্রথম রূপে আবার কবি-গুরুকে স্মরণ করছি, তারপর স্বর্গীয় দীনেশ-চন্দ্রকে। ময়মনসিংহ গীতিকা ও বাউল সঙ্গীত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ একখানি চিঠিতে আমায় যা লিখেছিলেন, তা আমার মতের পরিপন্থী হলেও, সেই অপূর্ব্ব চিঠিখানি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

বাউলের গান শিলাইদহে খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি। নিঃসংশয়ে জানি বাউল সঙ্গীতে একটা অকৃত্রিম বিশিষ্টতা আছে যা চিরকেলে আধুনিক। হাল আমলের কলেজে পাশ করা সেটা জাল করতে পারে না, সে তাদের ক্ষমতার অতীত। ইংরেজী পোড়ো বাউলের রচিত গান আছে, দেখেছি তা, তা অস্পৃশ্য। আমার অনেক গান বাউলের ছাঁচের, কিন্তু জাল করতে চেষ্টাও করিনি। সেগুলো স্পষ্টত রবীন্দ্র-বাউলের রচনা। কাব্য পরিচয়ে যে বাউলের গানগুলো আছে, সে আমার মাথায় কিম্বা কলমে আসত না, লোক ঠকাতে গেলে নিশ্চিত ধরা পড়তুম। ময়মনসিংহ গীতিকাও অনেকটা তাই। প্রচলিত লোক সাহিত্যে গ্রন্থসত্ব থাকে না, মুখে মুখে তার ব্যবহার চলে, নানা হাতের ছাপ পড়ে, তবু মোটের ওপর তার ঐক্য ধারা নষ্ট হয় না। ওর মধ্যে যে একটি আশ্চর্য্য কবিত্ব আছে, ইতিপূর্বে তার এমন দুর্যোগ ঘটেনি যাতে একেবারে তার সুর কেটে যায়, তাল কেটে যায়। ওর ভেতরকার

জিনিষ রয়ে গেছে, সেটা নষ্ট করবার সাধ্য কারো নেই—বাইরে দুটো একটা যায়গায় একটু আধটু চুণবালির পলস্তারা লাগালেও ইমারৎটা বাতিল হয়ে যায় না। ময়মনসিংহ গীতিকার কাল-নির্ণয় চলে না, জাত-নির্ণয় চলে, ওটা আবহমান কালের, কেবল ওটা কলেজি কালের বাইরে। এই কাল ওতে রিফু করতে যায় যদি, সেটা তখনি ধরা পড়বে এবং সেটাতে সবটার দাম নষ্ট হবে না।

দীনেশচন্দ্রের বৈষ্ণব কাব্য সংক্রান্ত চিঠিখানি হারিয়েছি, আর একখানি চিঠি কতকগুলি ব্যক্তিগত কারণে আমি মুদ্রিত করতে কুণ্ঠিত বোধ করছি। কিন্তু শুধু স্নেহ, যত্ন ও সহৃদয়তাই পাইনি, কুৎসা, অপভাষণ এবং অশিষ্ট ব্যবহারও পেয়েছি প্রচুর এবং তাও করেছেন আমার শ্রদ্ধেয় বহু কবি-সাহিত্যিকই। স্বনামে ও ব-নামে নানা সাময়িক পত্রে তাঁরা আমায় গালাগালি দিয়েছেন, কিন্তু বিধিসম্মত সৌজন্য সহকারে বিতর্কে প্রবৃত্ত হননি। বাংলা সাহিত্য জাতির সম্পদ এবং এর যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরা আপনারও যতটা আমারও ততটাই শ্রদ্ধা এবং বন্দনার পাত্র। কিন্তু শ্রদ্ধা করেও সমালোচনা করা যায়, ভক্তি অক্ষুণ্ণ রেখেও বিরোধিতা করা যায়, আধুনিক বাংলায় আমরা কারুর কাছেই সে শিক্ষা পাইনি। তাই আমার নিরপেক্ষ সমালোচনার ভেতর নাস্তিকতার আভাস পেয়ে, অনেকেই আঁৎকে উঠেছিলেন। অবশ্য একথা স্বীকার করবো যে ভুল-চুক, দোষ-ত্রুটি, অবিচার-অপবিচার আমার থাকারই কথা। প্রথমতঃ, আমি দিবারাত্রি নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকি, অখণ্ড অবসর ও অবহিত চিত্ত নিয়ে সাহিত্য-সেবার সুযোগ আমার নেই, দ্বিতীয়তঃ, প্রাচীনতম কাল থেকে আধুনিকতম কাল পর্য্যন্ত সমগ্র বাংলা সাহিত্যের পরিচায়ক বই আমার আগে কেউ লেখেন নি, আমাকেই আমার পথ তৈরি করে যেতে হয়েছে! কিন্তু তা সত্ত্বেও এটুকু অবশ্যই আমি মনে করতে পারি যে দীর্ঘদিন ধরে যে সমস্ত চিন্তা আমি

অধ্যয়ন, অনুসন্ধান ও আলোচনার ভেতর দিয়ে যাচাই করে এসেছি, বাংলা সাহিত্যের অনুসন্ধিৎসু ছাত্র ও ভাবী দিনের ঐতিহাসিকতার ভেতর প্রয়োজনের পাথেয় নিতান্ত কম পাবেন না। আপাততঃ এই পর্য্যন্ত। সেণ্টসব্যেরী বা লেগুই ও কাজামিয়ঁার মতো লেখকরা যেদিন বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় হস্তক্ষেপ করবেন, সেদিন আমার বই হয়ত আর কাজে লাগবে না। সেই সম্ভাবনীয়তার পথ যদি একটুও প্রশস্ত করে দিয়ে থাকি ত সেখানেই আমার সাফল্য।

যুগান্তর সম্পাদকীয় বিভাগ নন্দগোপাল সেনগুপ্ত
১লা ডিসেম্বর, ১৯৪০

গ্রন্থ-পঞ্জী

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ... রামগতি ন্যায়রত্ন

বাঙ্গালা সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব ... রাজনারায়ণ বসু

Literature of Bengal ... Romesh Ch. Dutt

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ... দীনেশচন্দ্র সেন

Bengali Literature in the 18th Century ... Sushil Kumar De

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ... সুকুমার সেন

মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস ... আশুতোষ ভট্টাচার্য্য

বৈষ্ণব সাহিত্য ... সুশীলকুমার চক্রবর্ত্তী

History of Brojobuli Literature ... Sukumar Sen

ভিক্টোরিয়া যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য ... হারাণচন্দ্র রক্ষিত

সংবাদপত্রে সেকালের কথা ... ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

Post-Chaitanya Sahajia Cult ... Manindra Mohan Bose

বঙ্গভাষার লেখক ... বঙ্গবাসী কার্য্যালয়

বঙ্গের কবিতা ... অনাথকৃষ্ণ দেব

প্রাচীন সাহিত্য }
আধুনিক সাহিত্য } ... রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত ... নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

বিদ্যাসাগর ... বিহারীলাল সরকার

মাইকেল মধুসূদনের জীবন-চরিত ... যোগীন্দ্রনাথ বসু

মধুসূদন ... শশাঙ্কমোহন সেন

বঙ্কিম-প্রসঙ্গ ... অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত

বঙ্কিম জীবনী … শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হেমচন্দ্র … অক্ষয়চন্দ্র সরকার

কবি হেমচন্দ্র … মন্মথনাথ ঘোষ

রঙ্গলাল … „

আমার জীবন ১।৫ … নবীনচন্দ্র সেন

রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ শিবনাথ শাস্ত্রী

কালীপ্রসন্ন সিংহ … ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূদেব চরিত … মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়

গিরিশ প্রতিভা … হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

দ্বিজেন্দ্রলাল … দেবকুমার রায় চৌধুরী

এষার কবি … প্রিয়লাল দাশ

কান্তকবি রজনীকান্ত … নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত

রবীন্দ্র জীবনী ১।২ … প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবি দীপিতা … সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

কাব্যে রবীন্দ্রনাথ … বিশ্বপতি চৌধুরী

Rabindranath Tagore … E. J. Thompson

শরৎ প্রতিভা … সুবোধ সেনগুপ্ত

শরৎ সাহিত্যে পতিতা … মাখনলাল রায় চৌধুরী

আধুনিক বাংলা সাহিত্য … মোহিতলাল মজুমদার

বাংলা উপন্যাস … শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গসাহিত্যের নবযুগ … শশীভূষণ দাশগুপ্ত

Western Influence on Bengali Literature … Priaranjan Sen

সূচী

প্রথম খণ্ড : প্রাচীন কাল

দ্বিতীয় খণ্ড : আধুনিক কাল

প্রথম খণ্ড : প্রাচীন সাহিত্য

বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত কাব্য

[বর্ণাশ্রম শাসিত হিন্দু-বাংলায় অনুন্নতদের স্থান সুখের ছিল না। তাঁরা আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম্মের মতো একটি সাম্যবাদী ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু এক দিকে মুসলীম আক্রমণ, অন্য দিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অভ্যুদয়ে সমস্ত ভারত থেকেই বৌদ্ধধর্ম্ম অপসৃত হল—বাংলাতেও দেখা দিল তার প্রতিক্রিয়া। বাঙালী বৌদ্ধেরা তখন নিরাশ্রয় হয়ে, কতক রাজকীয় আশ্রয়ের আশায় ইসলাম ধর্ম্ম গ্রহণ করলেন, কতক আবার তান্ত্রিকতার আড়ালে বৌদ্ধবাদকে গোপন করে হিন্দু ধর্ম্মের ভেতর ফিরে এলেন। এঁরাই হলেন বৌদ্ধ সহজিয়া—এঁরা একাধারে পৌত্তলিক এবং শূন্যবাদী, সন্ন্যাসব্রতী এবং বামাচারী। চর্য্যাপদ, শূন্যপুরাণ, ময়নামতীর গান, গোরক্ষবিজয় ইত্যাদি বইয়ে এই বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পারস্পরিক মিশ্রণের পরিচয় পাওয়া যায়। এর মধ্যে চর্য্যাপদগুলি প্রায় হাজার বছরের পুরাণো, একেবারে তুর্কী বিজয়ের সমকালীন রচনা। পরবর্ত্তীগুলির প্রাচীনতা নিয়ে মতভেদ আছে—তবে ওরা খুব প্রাচীন না হলেও, এই ধারারই অনুপূরক বলে সাহিত্যের ইতিহাসে উপেক্ষণীয় নয়। চর্য্যাপদগুলি লিখিত বাংলার প্রাচীনতম নিদর্শন—সে হিসেবে ভাষা-তত্ত্বের দিক থেকে এগুলি যথেষ্ট মূল্যবান। অবশিষ্ট রচনাগুলি বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতি-বিপ্লবের নিদর্শনরূপে ইতিহাসের দিক থেকে অপরিহার্য্য। এইখানে বলে রাখা দরকার যে পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব সাহিত্য, মঙ্গল কাব্য, শ্যামা সঙ্গীত, বাউল গান, এক কথায় সমগ্র প্রাচীন সাহিত্যের ভেতরই এই আদি সহজিয়াবাদের প্রসার ও প্রভাব দেখা যায়।]

[১]

বাংলা দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম স্থায়ী আসন লাভ করতে পারে নি। ওটা থেকেছে মত হিসেবে, তার আশেপাশে প্রচলিত উপধর্ম্মগুলি মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, অথবা তার সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির মিশেল দিয়ে এক একটা যৌগিক রকমের ধর্ম্মমত গড়ে তুলতে হয়েছে—এদেশের প্রাচীন ইতিহাস, সেই মিশ্রণের ইতিহাস। বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রাদুর্ভাবের আগে বাংলায় দুটো ধর্ম্ম প্রধানতঃ কদর পেয়েছে—শাক্তধর্ম্ম আর শৈবধর্ম্ম। একসঙ্গে জড়িয়ে এই দুটি এ দেশে তান্ত্রিকধর্ম্ম নামে প্রসিদ্ধ। এই তান্ত্রিকতা কত কালের পুরাণো তা নির্ণয় করা কঠিন। অথর্ব্ব-বেদের আভিচারিক প্রক্রিয়াদি থেকে সুরু করে, বহু বিবর্ত্তনের ভেতর দিয়ে আজ পর্য্যন্ত এ অব্যাহত প্রভাবে চলে এসেছে। বোধ হয় এর জন্ম অনার্য্য-প্রভাবে। বৌদ্ধধর্ম্ম যখন ভারতবর্ষেই প্রায় মরে এসেছে, তখন আবার ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের অভ্যুত্থান হতে সুরু হল—সেই সময়ে যে সম্প্রদায়গুলি একদা নানা সামাজিক ও বৈষয়িক কারণে বৌদ্ধ হয়েছিল, তারা ধীরে ধীরে আবার হিন্দুধর্ম্মের ছত্রচ্ছায়ায় এসে দাঁড়ালো। তারা তান্ত্রিকধর্ম্ম ও শৈবধর্ম্মের সঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মকে মিশিয়ে নূতন একটা ধর্ম্মনৈতিক আশ্রয় গড়ে তুললো—প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে সেই মিশ্রণের প্রয়াস বিশেষভাবে দেখা যায়।

বাংলা রচনার প্রাচীনতম নিদর্শন চর্য্যাপদগুলি এই সময়ের রচনা। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে এগুলি আবিষ্কার করেন—এগুলি সাহিত্য নয়, ঠিক বাংলাও নয়। তবু যে কারণে এংলোস্যাক্সন সাহিত্য ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসে প্রথম অধ্যায় অধিকার করে, সেই কারণেই এদেরকেও আমরা উপেক্ষা করতে পারি না। প্রায় হাজার বৎসর আগে, যখন বর্ত্তমান বাংলা ভাষাই গড়ে ওঠে নি, তখন কতকগুলি

বাঙালী বৌদ্ধ কি কারণে বলা কঠিন, অপ্রচলিত সন্ধা ভাষায় এই হেঁয়ালিগুলি রচনা করেন। এদের অর্থ পরিষ্কার নয়, কোন কোনটায় রূপক আছে বোঝা যায়, কিন্তু তার মর্ম্মভেদ দুঃসাধ্য। তবে এদের অনেকগুলির মধ্যে তুক-তাক ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির আভাস আছে—কুৎসিত পদার্থেরও অভাব নেই—তা থেকে অনুমান হয় যে এদের পেছনে তান্ত্রিকতার প্রভাব বিশেষভাবে সক্রিয়। হয়ত অসভ্য জাতিদের লিঙ্গ-পূজা বা অন্যান্য যৌন-পরতন্ত্র বিধি-বিধানও এর ভেতর অল্প স্বল্প মাথা গলিয়ে থাকবে। আর বৌদ্ধ প্রভাব ত খুবই স্পষ্ট—বাসনা-বর্জ্জন ও ত্যাগ, তিতিক্ষা তত্ত্বের প্রাবল্যই তা ধরিয়ে দেয়। একটা দুটো নিদর্শন এখানে দেয়া যাচ্ছে—দেশ-বিদেশের প্রাচীন সাহিত্যে যে সব Riddle বা হেঁয়ালি দেখা যায়, এদের প্রকৃতি তা থেকে কিছুমাত্র বিভিন্ন নয়।

অপ্পণে রচি রচি ভবনির্বাণা।
মিছেঁ লোঅ বন্ধাবএ অপণা ॥
অম্ভে না জানহুঁ অচিন্ত জোই।
জাম মরণ ভবে কইসন হোই ॥
জোইসো জাম মরণ বি তইসো।
জীবন্তে মঅলেঁ নাহি বিশেসো ॥
জানথু জাম মরণে বিসঙ্কা।
সো করউ রস রসানেরে কংখা ॥
জে সচরাচর তিঅস ভমন্তি।
তে অজরামর কিমপি ন হোন্তি ॥
জামে কাম কি কামে জাম।
সরহ ভনতি অচিন্ত সো ধাম ॥

জন্ম, মৃত্যু ও কর্ম্মফলের এই রহস্য-নির্ণয় তান্ত্রিক প্রভাবের সুস্পষ্ট নিদর্শন। নির্ব্বাণগামী বৌদ্ধবাদে এ প্রশ্ন ত পূর্ব্বাহ্নেই নিরস্ত। নীচে বদ্ধ-জীবের ওপর মায়ার প্রভাব বিষয়ক আর একটি পদ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

কাহেরে ঘেনি মেলি আচ্ছো হোঁ কীস।
বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীস॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহি ন ছাড়ই ভুসুক আহেরী॥
তিন ন ছুঁবই হরিণা পিবই পাণী।
হরিণা হরিণীর নিলয় ন জাণী॥
হরিণী বোলই এ হরিণা শুন তো।
এ বন ছাড়ি হোহু ভান্ত॥
তুরংগন্তে হরিণার খুর ন দীসই।
ভুসুক ভনই মূঢ়া হিয়াহি ন পইসই॥

এই সব দোঁহার রচনাকাল নাকি প্রায় দশম শতাব্দী থেকে সুরু, কারণ দোঁহার লেখক লুইপাদ, কাহ্নপাদ ইত্যাদির সাল-তারিখ পাওয়া যায়।

এই সময়েই বাংলাদেশ প্রথম তুর্কীর দ্বারা বিজিত হয়। তখনো বাংলায় মুসলমান ছিল না। বর্ণাশ্রমিক হিন্দুর দ্বারা উৎপীড়িত অনুন্নত সম্প্রদায় সে সময় বোধ হয় আত্মরক্ষার তাগিদেই বৌদ্ধ হয়। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব ভারতবর্ষে স্থায়ী হল না, বাইরে প্রতিষ্ঠিত হল মুসলীম শাসন, আর ভিতরে সজাগ হয়ে উঠলো ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম। প্রতীক-হীন, পূজাপদ্ধতিহীন তত্ত্বসর্ব্বস্ব বৌদ্ধ ধর্ম্মকে তখন তান্ত্রিকতার সঙ্গে মিশিয়ে, বাঙালী বৌদ্ধেরা আবার হিন্দু ধর্ম্মের এলাকায় ফিরে এলেন। যাঁরা সে সুযোগ পেলেন না, তাঁরা রাজশক্তির আশ্রয় পাবার আশায়

মুসলমান হয়ে গেলেন। এই ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লবের মুখেই বর্ত্তমান পর্ব্বের সাহিত্যগুলি জন্মায়।

[২]

এর পরই ধরা হয়ে থাকে ময়নামতীর গান (গোপীচাঁদের গান নামেও পরিচিত), গোরক্ষবিজয় এবং শূন্য পুরাণকে। অনেকে এগুলি আধুনিকতর বলে অনুমান করেন—তা করবার প্রধান কারণ এদের ভাষা। বৌদ্ধ গানের তুলনায় ত বটেই, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষাও এদের হিসাবে ঢের প্রাচীন। এদের ভাষা বেশ ঝঝঝরে এবং মঙ্গলকাব্যাদির ভাষারই মতো স্বচ্ছ—কতকটা আধুনিক ছাপ সমন্বিত। অবশ্য এর একটা কারণ এই হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে বৌদ্ধগান বা কৃষ্ণকীর্ত্তনের মতো এই রচনাগুলো লুপ্ত বা অপ্রচলিতের পর্য্যায়ভুক্ত ছিল না—এগুলো লোকের মুখে মুখে ফিরেছে, এবং হাত ফিরি হতে হতেই এদের জাত বদলে গেছে। হয়ত এদের আসলরূপ অন্যরকম ছিল। তাই বলে এদের আগাগোড়া জাল বলা যেতে পারে না—বিশেষতঃ শূন্যপুরাণের কতকাংশ এবং ময়নামতীর গানকে। ময়নামতীর গান বাংলা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশে ছড়িয়েছিল, বাংলার বিভিন্ন জেলাতে গীত আকারে ত এর প্রচলন ছিলই, হয়ত এখনো আছে। এর বিষয়-বস্তু লক্ষ্য করলেই একে বিশেষ প্রাচীন বলে মনে হবে—গোরক্ষনাথের প্রভাবে ময়নামতীর সিদ্ধিলাভ, ময়নামতীর প্ররোচনায় পুত্র গোপীচাঁদের সন্ন্যাস, প্রব্রজ্যা শেষ করে গোপীচাঁদের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন—এসমস্তই বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচায়ক, যা বাংলার সমাজ জীবন থেকে বহুদিন আগেই অন্তর্হিত হয়েছে। জীবনে প্রত্যক্ষতঃ যে আদর্শের প্রচলন ছিল না, প্রাচীনকালে তা সাহিত্যে পাওয়া যে সহজ

নয়, মঙ্গলকাব্যই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আর এর ভাষাও অপ্রাচীন নয়—অন্ততঃ পক্ষে অনেক স্থলে। একটু উদাহরণ দেয়া যেতে পারে।

গোপীচাঁদ সন্ন্যাসে বেরুতে উদ্যত। তাঁর রাণী অদুনা ও পদুনা তাঁকে নিরস্ত করছেন, তার উত্তরে গোপীচাঁদ বলছেন—

শালবন শিমুলবন চালিতে মান্দার।
সেদিকে হাঁটে হাড়িগুরু দিনেতে আন্ধার ॥
স্ত্রী আর পুরুষে যদি পন্থ বাইয়া যায়।
হেন বা দুষ্টের বাঘ আছে নারী ধরে খায়।

তার উত্তরে এক রাণী বলছেন,

খায় না কেনে বনের বাঘ তাক না করি ডর।
নিতকলঙ্ক মরণ হউক স্বামির পদের পর ॥
তুমি হব বটবৃক্ষ আমি তোমার লতা।
রাঙা চরণ বেড়িয়া রমু পলাইয়া যাবু কোথা ॥

কৃত্তিবাসী রামায়ণে বনগমনের পূর্ব্বে রাম ও সীতায় ঠিক এই ধরণেরই কথা কাটাকাটি দেখা যায়—সেখানে বাঘের বদলে আছে রাক্ষস। এমন অনুমান করা যেতে পারে যে কৃত্তিবাস ময়নামতীর গান শুনে থাকবেন। এর আখ্যান ভাগ অন্ততঃ তত দিনের পুরাণো হওয়া অসম্ভব নাও হতে পারে।

এর হিসাবে গোরক্ষবিজয় বা শূন্যপুরাণকে অবশ্যই অর্ব্বাচীন বলতে হয়। শূন্য পুরাণের সৃষ্টি-প্রকরণ লক্ষ্য করুন—

নাহি রেক নাহি রূপ নাহি ছিল বন্নচিন।
নাহি রবি নাহি শশী নাহি ছিল রাত্তি দিন ॥
নাহি ছিল সৃষ্টি আর নাহি সুর নর।
ব্রহ্মা বিষ্ণু নাহি ছিল, নাহি ছিল অম্বর ॥

বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত কাব্য

শূন্যেতে ভ্রমণ প্রভুর শূন্যে করি ভর।
কাহারে সৃজিব প্রভু ভাবেন মায়াধর॥

এ অংশটুকু সুন্দর। Caedmonএর Paraphraseএ যে সৃষ্টি-সঙ্গীত আছে, একে অসঙ্কোচে তার অনুরূপ বলতে পারি, কিন্তু সন্দেহ হয় রামাই পণ্ডিতের আমলেই এটা লেখা হয়েছিল কি না। এর অবলম্বিত তত্ত্বের ওপর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের দাবী সমধিক, যদিও শূন্যবাদে বৌদ্ধতত্ত্বও কিছু কিছু উঁকি দিয়েছে দেখা যাচ্ছে। এ ছাড়া শূন্যপুরাণে মহম্মদরূপে ধর্ম্ম ঠাকুরের আবির্ভাব আছে মনে হচ্ছে। এই সব কারণে এটাকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টেনে আনলে কোন অন্যায় হয় না মনে করি। গোরক্ষবিজয়ে গুরু মীননাথের আড়ি পেতে শিব-দুর্গার রহস্যালাপ শোনা ও তার ফলে শাপভ্রষ্ট হয়ে মায়ায় বদ্ধ হওয়া ও পরে শিষ্য গোরক্ষনাথের মুখে কায়া-সাধন তত্ত্বের উপদেশ পেয়ে মুক্তিলাভ বর্ণিত হয়েছে। এর অবলম্বন শৈব-মিশ্রিত বৌদ্ধ মত—তত্ত্বগুলি পুরাণ ঘেঁসা। কাজেই এর কঙ্কালটা পুরাণো, কিন্তু রচনাটা বেশ আধুনিক বলে সন্দেহ করা যেতে পারে।

প্রদীপ নিবিলে গুরু কি করিলে তেলে।
আইল বান্ধিয়া কিবা ফল জল আগে গেলে॥
মূল কাটা গেলে গুরু না জীয়ায় গাছ।
বিনি জলে কথাত শুনিছ জীয়ে মাছ॥

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে তান্ত্রিক ও শৈবধর্ম্মের মিশেলে যখন যৌগিক বৌদ্ধধর্ম্মের জন্ম হল, তখন একদিকে যেমন রইলো সন্ন্যাস, নির্ব্বাণ, শূন্য, অন্যদিকে তেমনি তার সঙ্গে এসে যোগ দিল গাছচালা, নলচালা, বশীকরণ, ইত্যাদি তন্ত্রাচার। এ দুয়ের সমবায়ে একটা সাহিত্য-শাখা গড়ে ওঠা কিছুই আশ্চর্য্য নয়, যেহেতু একটা

ধর্ম্ম-সম্প্রদায় ত সত্যি সত্যিই গড়ে উঠেছিল। নাথ যোগী সম্প্রদায় বা কাণফাটা যোগী সম্প্রদায় বাংলায় খুব প্রাচীন—তাদের এই সব মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গী-নাথ প্রমুখ গুরুরা বা হাড়িপা প্রমুখ সিদ্ধেরা যতদূর সম্ভব ঐতিহাসিক চরিত্র। এরা আসক্তির দোহাই দিয়ে যুবকদের সন্ন্যাসে উৎসাহিত করতো বৌদ্ধ আদর্শে—আবার তান্ত্রিক আদর্শে ঝাড়ফুঁক ইত্যাদির সহায়তায় গৃহস্থদের সর্ব্বনাশও করতো হয়ত।

এই পর্য্যায়ের বইগুলিতে যে সামাজিক বিপর্য্যয়ের চিত্র দেখা যায়, তাতে আদর্শ-সঙ্ঘাতে সমাজের গ্রন্থিমূল যথেষ্ট শিথিল হয়ে গিয়েছিল মনে হয়। এই সব গ্রন্থে যে বৌদ্ধবাদের সাক্ষাৎ পাই, তা বৌদ্ধ সহজিয়াবাদ। মহাযানের মিশ্রশাখা থেকেই এর উদ্ভব এবং মনে হয় ধীরে ধীরে এই সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের ভেতরই হারিয়ে গেছে। এখন সাহিত্য ছাড়া বাহ্যতঃ এদের আর কোন অস্তিত্ব নেই। সে হিসাবে বাংলার সামাজিক ইতিহাসের দিক থেকে এই বইগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য—কারণ এই মতবাদের প্রভাব বাঙালীর চিৎ-প্রকর্ষ থেকে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি, পরকীয়াবাদী বৈষ্ণবে, বামাচারী শ্যামা-সাধকে এবং দেহতত্ত্ববাদী বাউলে প্রচ্ছন্নভাবে এই সহজিয়া প্রভাব এসে মিশেছে—এরই অয়নকে চক্র করে দেশের কয়েকটি বড় বড় সাহিত্যশাখাও গড়ে উঠেছে। সেই জন্যেই মনে করি, এরা জাল নয়—হয়ত পরবর্ত্তীকালের সংযোজনা এদের কোথাও কোথাও প্রবেশ করে থাকবে। অবশ্য এদের সাহিত্য আখ্যা দিতে পারি না—কারণ সাহিত্যের একমাত্র বাহন যে ভাষা, তাই তখনো পূর্ণভাবে গড়ে ওঠে নি, আর সমাজ এবং সংস্কৃতিও এমন একটা সমগ্রতা লাভ করে নি, যাতে কোন সুপরিণত চিন্তা আত্মপ্রকাশ করতে পারে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কৃত্তিবাস ও কাশীরাম

[বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত সাহিত্য শাখাটির সন্ধান পাওয়া গেছে হাল আমলে। রাজনারায়ণ বসু, রামগতি ন্যায়রত্ন বা রমেশচন্দ্র দত্ত যখন প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করেন, তখন কৃত্তিবাসই ছিলেন বাংলা ভাষার আদি কবি। তাঁর পর ছিলেন কবিকঙ্কণ এবং কাশীদাস। দীনেশচন্দ্র সেন যখন প্রাচীন সাহিত্যের অপেক্ষাকৃত সম্পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করলেন, তখন বৌদ্ধ পর্য্যায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে, কিন্তু সংগ্রহ শেষ হয় নি। তাই তিনিও চর্য্যাপদের উল্লেখ না করে, তাদের অনুপূরক অপরাপর রচনাগুলিতেই তাঁর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখেন। আধুনিক ইতিহাসে এই অসম্পূর্ণতা দূর হয়েছে—কৃত্তিবাসের পূর্ব্ববর্ত্তী একটি সুবিস্তৃত সাহিত্যশাখাই আজ আমাদের হস্তগত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যিক সম্পূর্ণতা এবং প্রসার ও প্রভাবের দিক থেকে দেখতে গেলে, এখন পর্য্যন্ত কৃত্তিবাসই বাংলার প্রকৃত আদি কবি—তার পরই কাশীদাস, কবিকঙ্কণ, বিজয়গুপ্ত, আলাওল, চণ্ডীদাস। এঁদের মধ্যে কবিকঙ্কণ ও বিজয়গুপ্ত মঙ্গলকাব্যের এবং চণ্ডীদাস বৈষ্ণব কাব্যের অন্তর্ভুক্ত বলে, তাঁদের সম্বন্ধে আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করবো। এখানে আমরা কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের এবং এদের সমধর্ম্মী মালাধর বসু ও আলাওলের প্রসঙ্গ উল্লেখ করবো। কৃত্তিবাস ও কাশীদাস যথাক্রমে রামায়ণ ও মহাভারতের এবং মালাধর ভাগবতের ভাবানুবাদ করে প্রসিদ্ধ। আলাওলের পদ্মাবৎ কাব্যও অনুবাদ, তবে তা পৌরাণিক নয়, ঐতিহাসিক এবং বাংলার বাইরে আরাকানে আরবী হরফে লেখা বাংলা বই। এর মধ্যে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস বাংলার ঘরে ঘরে পঠিত ও সমাদৃত—এঁদের সমসাময়িক এবং পরবর্ত্তী আর যে সমস্ত লেখক রামায়ণ ও মহাভারত লিখেছেন, তাঁদের কেউ এঁদের আসন টলাতে পারেন নি। মালাধরের শ্রীকৃষ্ণ বিজয় শ্রীচৈতন্যের দ্বারা স্বীকৃত বলে গুজব থাকলেও, বাংলায় তার প্রচার হয় নি। আর আলাওল এখনো অজ্ঞাতপ্রায়। এঁরা সকলেই অনুবাদক নামে পরিচিত—কিন্তু আসলে সকলেই মূলের আখ্যান ভাগ নিয়ে মৌলিক রচনা করে গেছেন।]

[১]

যদি জনপ্রিয়তাই সাহিত্য-বিচারের সব চেয়ে বড় মানদণ্ড হয়, তাহলে কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের তুল্য বড় কবি বাংলা দেশেই আর হননি বলতে হবে। এঁদের তুলনায় কবিকঙ্কণ বা বৈষ্ণব মহাজনেরা অনেক পিছনে এসে পড়েন, স্বয়ং ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত পাশে স্থান পান কিনা সন্দেহ। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্ব্বিশেষে বাংলার চিত্তে এঁদের একাধিপত্য চলেছে—আজো একেবারে চলছে না এমন কথা বলা যায় না। শোনা যায়, মাইকেল এঁদের প্রভাব সম্বন্ধে বলেছিলেন, তে-তলায়ও পড়ছে, বটতলায়ও পড়ছে। এর চেয়ে খাঁটি কথা এঁদের সম্বন্ধে বোধ করি আর কিছুই হতে পারে না।

এই দুই দরিদ্র বাংলার কবি এ দেশকে বহুকাল ধরে শিখিয়েছেন সতীত্ব, সৌভ্রাত্র, নিষ্ঠা, সংযম, মনুষ্যত্ব। ফল কি হয়েছে বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে যাকে বলে জাতীয় সংস্কৃতি, তাতে এঁদের উভয়ের দান যে অসাধারণ তা বলাই বাহুল্য। এঁদের সাল-তারিখ নিয়ে পণ্ডিত সমাজে বকাবকির অন্ত নেই। অনেকে এঁরা সংস্কৃত জানতেন কি না তাই প্রতিপন্ন করতে গলদঘর্ম্ম হয়েছেন, কেউ কেউ আবার এঁদের অসামান্য কবি প্রতিভা প্রমাণিত করবার জন্যেও অনেক রকম যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। বস্তুতঃ এ সমস্তই নিরর্থক প্রয়াস। সমস্ত বাদানুবাদকে ছাপিয়েই এঁরা উজ্জ্বল মহিমায় স্বপ্রতিষ্ঠ এবং কেন, সে বিষয়েও দেখা যায় কারুর মনে কোন প্রশ্ন নেই। এঁদের সমকালবর্ত্তী বা অল্প পরবর্ত্তী অন্যান্য কবিও রামায়ণ-মহাভারত লিখেছেন এবং রচনা-পারিপাট্যে তাঁদের কারুর কারুর কৃত্তিবাস কাশীদাসের মতোই উৎকর্ষ দেখা গিয়ে থাকে—অনন্তরামের রামায়ণে বা সঞ্জয়ের মহাভারতে স্থানে স্থানে বলিষ্ঠতর ও স্বচ্ছন্দতর রচনার

পরিচয়ও মেলে—কিন্তু তাঁরা লুপ্ত হয়ে ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়ীভূত হয়েছেন, পক্ষান্তরে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস প্রায় অবতার শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন। এর মূল কোথায় ঠিক করা অবশ্য কঠিন। বলা যেতে পারে, এ খ্যাতির খামখেয়াল! তবে সৌভাগ্য এই যে, জনপ্রিয়তাই প্রতিভার একমাত্র সুনিশ্চিত কুল-লক্ষণ নয়।

সমাজ-জীবনে জ্ঞানে-কর্ম্মে এক এক জাতির এক এক রকম ধারা—সেই ধারা যে সব লেখকের মধ্যে দিয়ে সবচেয়ে ব্যাপকভাবে মূর্ত্ত হয়, তাঁদের প্রসিদ্ধি অনিবার্য্য। তার সঙ্গে রচনায় অবাধ সারল্য এবং প্রচুর কারুণ্য থাকলে ত আর কথাই নেই! সে সাহিত্য কোন মতেই মারা যায় না। তা যাওয়াও অবশ্য শুভ নয়, গেলে জাতীয় কৃষ্টিই মারা যায়। রামায়ণ-মহাভারত হিন্দু-জগতের অপরিহার্য্য অবলম্বন, কিন্তু সংস্কৃত ভাষাটা দুর্ভেদ্য—কাজেই বাঙালী নিজস্ব মাতৃ-ভাষায় এই দুই কাব্য-গ্রন্থের অনুবাদ চিরদিনই চেয়েছে, সেই সার্ব্বজনীন দাবী মিটিয়েছেন এঁরা—যেমন হিন্দী জগতে করেছেন তুলসীদাস। (তবে ও অঞ্চলে মহাভারতটা আদর পায় নি, যা আমাদের দেশে কৃষ্ণ-ভক্তির আশ্রয়ে সহজেই হতে পেরেছে।) এইখানেই কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের সত্যিকার জোর। এ ছাড়া এঁদের উভয়েরই রচনা এত বেশী অনাড়ম্বর এবং সরল যে অর্থ-গ্রহণে কোথাও কোন বাধা ঘটে না—এও তাঁদের সমাদরের আর একটি কারণ।

তবে একথা গোড়াতেই বলে রাখা দরকার যে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের গ্রন্থ আজ আমরা যেভাবে পাই, মূলে এরা কখনই তা ছিল না। হস্তলিখিত পুঁথি হাতে হাতে শতাব্দীর পর শতাব্দী পাড়ি দিতে দিতে, যেমন এদের ভেতর নানা দিকদেশের উপাখ্যান এসে ঢুকেছে, তেমনি এদের রচনা-পদ্ধতিরও যথেষ্ট পরিবর্ত্তন সাধিত

হয়েছে। এই দুই বই মনোযোগ দিয়ে পড়লেই এদের ভেতর নানা হাতের ছাপ দেখতে পাওয়া যায়, যার একের সঙ্গে অন্যের সামঞ্জস্য বড় একটা মেলে না। মূলের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। কাশীদাস কৃত্তিবাস, বাল্মীকি বা ব্যাসের রচনার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচিত ছিলেন বলেই মনে হয় না—কথকের মুখে শুনে মহাভারত লেখার গুজব কাশীদাস সম্বন্ধে প্রচলিত আছে, কিন্তু আমরা মনে করি, কৃত্তিবাস সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। কবিরা মূল উপাখ্যান অবলম্বনে আপন খুসীমতো লিখে গেছেন, কাজেই মূল কাহিনীর সঙ্গে বহুতর বঙ্গীয় শাখাপ্রশাখা স্বভাবতঃই সংযুক্ত হয়ে পড়েছে, তার কতটা এঁদের, কতটা আবার পরবর্ত্তীদের তা নির্দ্ধারণ করা আজ কঠিন।

[২]

অঙ্গদ রায়বার, কি ভস্মলোচন বৃত্তান্ত, কি তরণীসেনবধ কার লেখা? বাল্মীকির ত নয়ই, কৃত্তিবাসের নিজেরও কিনা সন্দেহ। ঠিক তেমনি প্রশ্ন ওঠে মহাভারত নিয়ে। অশ্বত্থামা-হত-ইতি-গজ বা জল-পিণ্ড-স্থলের কাহিনী প্রথমতঃ বাংলার, দ্বিতীয়তঃ কাশীদাসের পরবর্ত্তী কোন অজ্ঞাতনামা কবির হাত এর পেছনে থেকে কাজ করছে, এও নিঃসন্দেহ! এইভাবে নানা জনের নানা গল্প এই দুই বৃহৎ গ্রন্থের জঠরে এসে স্থান পেয়েছে, কিন্তু আশ্চর্য্য এদের গ্রহণী-শক্তি! সব কিছুকেই এরা স্বকীয় গতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়ে একটা সর্ব্বাঙ্গীনতা লাভ করেছে। কিন্তু এদের কতটা আসলে কৃত্তিবাস-কাশীদাসের নিজের রচনা, আর কতটা পরবর্ত্তী পুঁথি লেখকদের সংযোজনা, তা বিবেচনা করে দেখার দরকার আছে—তা সাধারণ পাঠকদের প্রয়োজনাতীত হলেও, সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের পক্ষে এ সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা ভালো দেখাবে না। ইতিমধ্যে

রামায়ণের যে প্রাচীন পুঁথিগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে, তার সঙ্গে প্রচলিত রামায়ণ মিলিয়ে দেখলেই এ বিষয়ে আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টা অনেকখানি পরিষ্কার হয়ে যাবে। কাশীদাস সম্বন্ধেও এই চেষ্টা চলেছে—আশা করা যায়, এদিকেও উদ্যোগী লেখকের অভাব হবে না।

ইংরাজী আমলে যখন প্রথম বাংলা বই ছাপানো সুরু হয়, তখন রামায়ণ-মহাভারত সম্পাদনার ভার গ্রহণ করেছিলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার। তিনি নিজেও ছিলেন কবি। পুঁথির পাঠোদ্ধারকালে যেখানে যেখানে তিনি কোন অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন, সেখানেই খানিকটা করে নিজের রচনা জুড়ে দিয়েছেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণে যেখানে সীতা হরণের পর রাম বিলাপ করছেন—

গোদাবরী-তীরে আছে কমল-কানন,
সেথা কি কমলমুখী করেন ভ্রমণ।
পদ্মালয়া পদ্মমুখী সীতারে পাইয়া,
রাখিলেন পদ্মবনে বুঝি লুকাইয়া!
রাজ্যচ্যুত আমাকে দেখিয়া চিন্তান্বিতা,
হরিলেন পৃথিবী কি আপন দুহিতা?

সেখানে স্পষ্টতঃই কোন আধুনিকের হাত দেখতে পাওয়া যায়। মহাভারতেও তেমি অর্জ্জুনের লক্ষ্যভেদ অংশটাকে আমার রীতিমতো আধুনিক মনে হয়। হয়ত তাও তর্কালঙ্কারের বা তাঁর সমধর্ম্মী আর কারুর সংযোজনা। তর্কালঙ্কার যে এ কাজ অন্য ক্ষেত্রেও করেছেন, গোবিন্দদাসের কড়চাই তার বিশিষ্ট প্রমাণ। কিন্তু কথাটা এ থেকে এই দাঁড়ায় যে, ইংরাজ আমলে মুদ্রাযন্ত্রের সাম্নেই যখন এমন ব্যাপার ঘটতে পেরেছে, তখন হাতে-লেখার যুগে সাহিত্য যখন ছিল পারিবারিক তৈজসপত্রের সামিল, তখন আরো কি-না

হয়েছে ! কিন্তু যাঁরই লেখা হক, আর যত ভেজালই এসে ঢুকুক, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের দুটি প্রধান স্তম্ভ। এই দুই গ্রন্থকে কেন্দ্র করে পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য অনেক প্রেরণা, অনেক প্রবর্ত্তনা লাভ করেছে। এই দুই বই পড়ে সংস্কৃত গ্রন্থদ্বয় সম্বন্ধে লোকের মনে হয়ত ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়েছে—হয়ত লোকে এদের দোহাই দিয়ে প্রাচীনদের গ্রন্থের সম্বন্ধে বিচার করেছে—কিন্তু একটা জাতের প্রাণ-শক্তিকে বড় করে দেয়ায় এদের যে দান, তার তুলনায় ওটুকু নিতান্তই উপেক্ষণীয় ত্রুটি।

[৩]

এখানে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা যেতে পারে যে, মালাধর বসুর ভাগবত বা শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়, কৃত্তিবাস-কাশীদাসের রামায়ণ-মহাভারত এবং আলাওলের পদ্মাবৎ (মালিক মুহম্মদ রচিত হিন্দী কাব্যের বাংলা রূপান্তর) অনুবাদ নামে চললেও, আসলে অনুবাদ নয়—মূল অবলম্বনে লেখা স্বাধীন বাংলা রচনা। চাপম্যানের হোমার বা ফ্রেয়ারফাক্সের ট্যাসোর মতো বা ড্রাইডেনের ভার্জ্জিলের মতো এই সব অনুবাদে মূলের অতি সামান্যই রক্ষিত হয়েছে। অনুবাদক নাম নিয়ে লেখকেরা যা লিখে গেছেন, তা তাঁদেরই সৃষ্টি—পিতৃ-ঋণ হিসেবে বিষয়-বস্তুর জন্যে বা বিশেষত্বপূর্ণ কতকগুলি স্থানের জন্যে তাঁরা মূলের কাছে দায়ী। তাই কৃত্তিবাস-কাশীদাসের হাতে পৌরাণিক চরিত্রেরা বাঙালী হয়ে গেছেন, তাঁদের বিশেষ বিশেষ অবস্থা, বিশেষ বিশেষ কার্য্য-কলাপ, কথাবার্ত্তা হয়েছে একান্তভাবে বাংলার, এঁদের জনপ্রিয়তার মূল কতকটা এখানেও।

অনেকে অনুমান করেন, কথকদের ব্যবহারের জন্যে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণাদির আখ্যান ভাগ অবলম্বনে বাংলায় ব্যাস সংহিতা বলে যে গ্রন্থগুলি প্রচলিত ছিল, তা থেকে কৃত্তিবাস ও কাশীদাস তাঁদের রচনার উপকরণ আহরণ করেছিলেন—ব্যাস-সংহিতা দেখিনি, এ সম্বন্ধে কোন মতও প্রকাশ করতে পারি না সেইজন্যে। ব্যক্তিগতভাবে আমি এটাকে মনে করি, বাঙালী সংস্কৃতির প্রভাব—সেই দিক থেকেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

এখানে বলে রাখি যে কাব্য হিসেবে এই দুই গ্রন্থ নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কিছু নেই। এদের মূল্য অন্যদিক থেকে, যাতে নীতি আছে, ইতিহাস আছে, ধর্ম্মতত্ত্ব আছে, কৌতুক আছে, কতকটা কাব্যও আছে। পৌরাণিক সাহিত্যের বিচারে সর্ব্বত্রই যে মাপকাঠি, এখানেও তাই এবং তা ছাড়া কিছু নয়—যদিও কবিদ্বয় নিজে তাঁদের কবিত্বের সমর্থনে জোর গলায় সাফাই গেয়ে গেছেন। কৃত্তিবাস বলেছেন—

সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হইতে স্ফুরে॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে॥

আর কাশীদাস বলেছেন,—

মহাভারতের কথা অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান॥

আধুনিক যুগের পাঠক আমরা প্রাচীনেদের এই অতিমাত্রিক আত্মবিশ্বাসকে সন্দেহের চোখে দেখলেও, অশ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারি না। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে হয়ত একটু হাসতে পারি।

তৃতীয় অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য

[প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বৃহত্তম শাখা হল মঙ্গলকাব্য। এগুলিতে পৌরাণিক দেব-দেবীর সঙ্গে বিবিধ লৌকিক দেব-দেবীর মিশ্রণ ঘটেছে—বর্ণ-হিন্দুদের সঙ্গে অনুন্নতের, এমন কি হিন্দুর সঙ্গে মুসলমানের পর্য্যন্ত আপোষ-রফার একটা চেষ্টা দেখা যায় এই মিশ্রণের ভেতর। দুর্ভাগ্যবশতঃ মুসলমান শাসক ও হিন্দু প্রজার মধ্যে কোন সত্যিকার মিলন হয় নি, বর্ণ-হিন্দুও থেকেছে অনুন্নত হিন্দু থেকে সম্পূর্ণ তফাতে। কাজেই সাহিত্যের আসরে পরস্পরের ভেতর যখন যোগাযোগ ঘটেছে, তখন সেটা মোটেই মৈত্রীমূলক হয়নি —হয়েছে বিদ্বেষমূলক। বাইরে চলেছে বৈদেশিক শাসনের উপদ্রব, ভেতরেও বর্ণাশ্রম জুলুম জবরদস্তি কম করেনি। এই বিপর্য্যয়ের ভেতর, দেশের জনমন নিজের নিজের সম্প্রদায়গত মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যেই আপন আপন উপাস্য দেবতাকে মহিমান্বিত করে অঙ্কিত করতে এবং অন্যান্য দেবতার ওপর তাঁদের প্রাধান্য স্থাপন করতে অগ্রণী হয়েছে। এর ফলে পৌরাণিক ও লৌকিক দেব-দেবীর যেমন অধোগতি হয়েছে তাদের হাতে, তেমনি পরস্পরের ভেতর অসুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রবলাকার ধরেছে। মঙ্গলকাব্যের ভেতর তাই আমরা যে সমাজ পাই, সে কোন সুশাসিত, সুনিয়ন্ত্রিত, সুশিক্ষিত সমাজ নয়। তার নরনারীরা আধি-ব্যাধি ও দুঃখ-দুর্দ্দশায় বিব্রত, কুসংস্কার ও অশিক্ষায় জর্জ্জরিত—তাদের পৌরুষ নেই, চরিত্র নেই, পরস্পরের সম্বন্ধে উদার সহনশীলতা নেই, ভাগ্য ও দেবতার হাতে তারা অসহায় ক্রীড়নক স্বরূপ। কৃত্তিবাস, কাশীদাস, মালাধর প্রমুখ কবিরা ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্যে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতির ভাবানুবাদ করেছিলেন—দেশের জনসাধারণ সেই ক্ল্যাসিকাল প্রভাবকে আপনার লৌকিক সংস্কৃতির রঙে অনুরঞ্জিত করে নিলে—মঙ্গলকাব্যই তার পরিচয়।]

[১]

প্রাচীন বাঙালীর মনোজগতে প্রেম ও ভক্তির চেয়ে ভয়ের আসন বেশী কায়েমি ছিল, এ কথা মনে করা অসঙ্গত নয়। এই ভয়কে কেন্দ্র

করেই তার বৃহত্তম সাহিত্য-শাখার উদ্ভব হয়েছে—এই শাখার নাম হল মঙ্গলকাব্য শাখা।

এই ভয়টা যেমন এক দিকে ছিল সামাজিক, অন্যদিকে তেমনি ছিল আধিদৈবিক। এই দ্বিবিধ উপপ্লবের ভেতর জীবন যাপন করতে হওয়ায়, বাঙালীকে নানা দেব-দেবী আবিষ্কার করতে হয়েছিল, যাঁদের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে বহির্সজ্যাত থেকে আত্মরক্ষা করার ছেলেমি গোটা জাতকেই পেয়ে বসেছিল। এই সব দেব-দেবীর জন্মস্থান প্রায়ই পুরাণ, কিন্তু কর্ম্মস্থান বঙ্গদেশ—কাজেই বাংলার পলি মৃত্তিকার স্নিগ্ধ প্রলেপে অতি অনায়াসেই তাঁদের ষড়ৈশ্বর্য্যের ছটা উড়ে গিয়ে, তার স্থলে যাবতীয় মানুষী দৌর্ব্বল্য এসে মাথা গলিয়েছিল। তথাপি তাঁদের দৈবী মহিমা নতশিরে মেনে নিতে কারো আপত্তি হয় নি, তার কারণ একটা দুরপনেয় ভীতি গোটা জাতকেই হাড়ে হাড়ে বিবশ করে রেখেছিল।

এই ভীতির কারণ খুঁজতে আমাদেরকে বেশী দূরে যেতে হবে না। সময়টা ছিল মুসলমান শাসনের আমল—কিন্তু হিন্দু ও মুসলমানের ভেতর একটা সুস্থ আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত হয়ে যায় নি—তাই রাজকীয় প্রভুত্বের খাতিরে বহির্জগতে হিন্দু মুসলমানগণের বশ্যতা স্বীকার করেছিল, কিন্তু গৃহ-জীবনে সে নিজের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধেই সবিশেষ অবহিত হয়ে উঠেছিল। এই স্বাতন্ত্র্য যে পদে পদে পীড়িত হত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। এই পীড়ন থেকে আত্মরক্ষার উপায় স্বরূপ হিন্দুকে ধর্ম্মের দিক থেকে দোহাই পাড়তে হয়েছে, তার পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। হিন্দুর নারায়ণ ও মুসলমানের পীর দুয়ের মিশ্রণে সত্যপীর নামক একটি সঙ্কর দেবতা বানিয়ে, তাঁর মঙ্গলময়ত্বের মহিমা কীর্ত্তন করে সাহিত্য গড়তে হয়েছিল। এর মূলে হিন্দু-মুসলমান

মৈত্রীর একটা হালকা রকম নীতি হয়ত ছিল, কিন্তু জিনিষটা জন্মেছিল রাজকীয় ভীতি থেকে। এই দুর্ব্বল মৈত্রী-সাধনের প্রয়াস কতটা কার্য্যকরী হয়েছিল বলা কঠিন, তবে এ যে তৎকালীন সমাজের কিয়দংশ অনাবৃত করে দেখায় তা সকলেই স্বীকার করবেন। অনুন্নত শ্রেণীর হিন্দুরা যে সময় দলে দলে পীড়নের ফলেই হক, আর প্রলোভনের বশেই হক, মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষা নিয়েছিল, সে সময় দুই একটি হিন্দু দেবতাও যে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মুসলমানী রূপ গ্রহণ করেছিলেন, এ আর বিচিত্র কি ?

কিন্তু বাইরে পরকীয় রাষ্ট্রশক্তির ভীতি যতটা প্রবলই থাক, ভেতরে তার চেয়ে বড় ভীতি ছিল, ব্যাধি, মহামারী ও হিংস্র জন্তুর প্রকোপ। কথাটা যেন মানব-সভ্যতার আদিম যুগের ব্যাপার বলে মনে হয়, কিন্তু যেখানে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অভাব বিদ্যমান পুরোমাত্রায়, সেখানে সময়ের দিক থেকে আধুনিক হলেও, স্বভাবের দিক থেকে মানুষের গতিবিধি আদিম না হয়ে পারে না। কলেরা ও বসন্তের মতো দুরারোগ্য ব্যাধিতে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যেতো—তার হাত থেকে উদ্ধার বা অব্যাহতি পাওয়া ছিল অচিন্ত্য-পূর্ব্ব! কাজেই মনে করা হয়েছিল, এই দুই ব্যাধির অধিষ্ঠাত্রী দুই দেবী আছেন, এক ওলাবিবি, আর শীতলা। প্রথমটি সত্যপীরের সমগোত্রীয়া কোন সঙ্করী দেবী, হিন্দু মাতৃত্বের স্তন্যরসে পুষ্টা কোন দেবীর মুসলমানী সংস্করণ—আর দ্বিতীয়টি ত সুপরিচিতা। এই সব ব্যাধির প্রকোপ মানেই এই সব দেবীর অকৃপা এবং এঁদের হাত থেকে উদ্ধার পাওয়ার উপায় মানেই বিধিমতে এঁদের মেনে নেওয়া। এই দেবীদের মহিমা প্রচারের কাজটা ব্যাপকভাবে চালাবার জন্যেই এঁদের নিয়ে সাহিত্য গড়ে তোলা আবশ্যক হয়। নবাবী

আমলের কোন চতুর ভট্টাচার্য্য মহাশয় সত্যনারায়ণকে পদ্মপুরাণের রেবাখণ্ডে প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন বটে, কিন্তু বেশীর ভাগ দেবদেবীই পৌরাণিক সনন্দ ব্যতিরেকেই স্বয়ংসিদ্ধ—কারণ জাতির কুসংস্কারান্ধ ভীতির পুঁজি ভাঙিয়ে তাঁদের কারবার। ওলাউঠা বা বসন্তের দেবীর মতোই বাঘের দেবতা দক্ষিণা রায় এবং সাপের দেবীর মনসারও আবির্ভাব ঘটেছে। যদিও মনসাকে পুরাণেও মাঝে মাঝে দেখা গিয়ে থাকে, তবু তাঁর এই অসামান্য প্রতিপত্তির আসন একান্তভাবে বাংলার মাটিতে। ঠিক এই ভাবেই মেলেনি, ভাদু, টুসু, বড়াম, জ্বরাসুর, ঘণ্টাকর্ণ, আরও কত যে গ্রাম্য দেব-দেবীর জন্ম হয়েছে, তার আর সীমা সংখ্যা নেই। এঁদের অধিকাংশেরই মহিমাত্মক কাব্য (মঙ্গল) দেখতে পাওয়া যায়—এক-আধ জনের যা পাওয়া যায় না, তা অবলুপ্তির লক্ষণ, অস্বীকৃতির নয় নিশ্চয়ই।

অনুমান করা যেতে পারে, এই সব উপধর্ম্মকে কেন্দ্র করে দেশে এক একটা সম্প্রদায় গড়ে ওঠে—যারা এই সব দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচারের স্বপ্নাদেশ পেয়েছে বলে রটায় এবং সেই রটনার উপায়-হিসেবে আশ্রয় নেয় সাহিত্যের। এ রকম স্থলে স্বভাবতঃই নিজ ধর্ম্মমতের সঙ্গে অন্য ধর্ম্মের বিবাদ বাধা স্বাভাবিক—কার্য্যতঃ বেধেছেও তাই। তাই মঙ্গল কাব্যে স্বধর্ম্ম মহিমা কীর্ত্তনের পাশাপাশি পর ধর্ম্মের অপকীর্ত্তি ঘোষণাও সগর্ব্বে স্থান লাভ করেছে। পর ধর্ম্ম অনুসরণের দুর্নিবার সাজা এবং স্বধর্ম্ম স্বীকারের শুভঙ্কর পরিণাম ফল বর্ণনাই হল মঙ্গল কাব্যের অনন্য অবলম্বন। নিঃসন্দেহ, এই সমস্ত সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল অল্প শিক্ষিত বা অশিক্ষিতদের মধ্যে—তার ভগ্নাবশেষ আজও দেশের ইতস্তুতঃ সুলভ। কাজেই তাদের হাতে দেব-চরিত্রের দুষ্কৃতি যা হয়েছে, তাও যেমন চূড়ান্ত, মাহাত্ম্য যা প্রকাশ পেয়েছে, তাও তেমনি

১৮৪৭

মারাত্মক। কিন্তু অন্য সব বিষয়ে কৌলীন্যের আঁটুনি যত প্রবলই থাক, ধর্ম্মের ব্যাপারে অন্ত্যজের এই অভ্যুদয়কে দেশের বিচারবিমূঢ় মন কিন্তু অস্বীকার করেনি। কাজেই ব্রাহ্মণ-শূদ্র নির্ব্বিশেষে সবাই এই সব ধর্ম্মকে মাথা পেতে নিয়েছে এবং তার মাহাত্ম্য নিয়ে হৈ হৈ করেছে। যে সব ভয়, ভীতি ও উপদ্রব থেকে এই জাতীয় উপধর্ম্মের জন্ম, তা যখন নিঃশেষে তিরোহিত হয়ে গেছে, তখনো পর্য্যন্ত তা জাতির মনকে ছাড়েনি। এমন কি আজো এরা মুমূর্ষু অবস্থায় টিঁকে আছে। ডোম পুরোহিতের দ্বারা চণ্ডীশীতলার বা সাপুড়িয়া পুরোহিতের দ্বারা সাজুয়া (মনসা সেজ) বাসিনী বিষহরি মনসার পূজা এবং তার সঙ্গে খোল, ঢোল ও মন্দিরাযোগে শীতলা এবং মনসামঙ্গল গান বাংলার অলিতে গলিতে বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকে ব্যঙ্গ করেই টিঁকে আছে। সত্যপীরের পূজা ও মহিমা গান ত ঘরে ঘরে—ওলাবিবির দরগায় সিন্নি ত গ্রামে গ্রামে। কাজেই মঙ্গলকাব্য আজও দেশের চিত্তে পূর্ণ তেজেই জীবিত রয়েছে, এ কথা অতি বড় আধুনিককেও স্বীকার করতেই হবে।

[২]

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনা আবশ্যক হতে পারে। গোড়াতেই বলে রাখা দরকার যে মঙ্গলকাব্যে দেবের চেয়ে দেবীর সংখ্যাই বেশী—দেবীদের আধিপত্যও বেশী। দেবের মধ্যে শিবের অস্তিত্ব কিছু অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়, তা গল্পাংশে কতকটা হাস্যরস জোগাবার জন্যে এবং সঙ্কট উৎরাবার সহজ উপায় আবিষ্কারের জন্যে। এ ছাড়া আছেন ধর্ম্ম, দক্ষিণ রায়, সত্যপীর প্রভৃতি—মাঝে মাঝে যাঁদের হাত-পা নাড়া দেখতে পাওয়া যায়।

বলা বাহুল্য যে তান্ত্রিকতা এ দেশের খুব পুরানো জিনিস—কাজেই মাতৃ-পূজা এদেশের সনাতন ঐতিহ্য। সেই ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করেই মাতৃত্বের নানা রূপ দেশের সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে—খোদ কালী রামপ্রসাদের পূর্ব্বে ব্যাপকভাবে দেখা দেননি, কিন্তু চণ্ডী, অন্নদা, ষষ্ঠী, শীতলা, মনসা, নানা আকারে, নানা ব্যাপারের প্রতিনিধি রূপেই জননীর আবির্ভাব ঘটেছে। মাতৃ-বৎসল পূজক সম্প্রদায়ের হাতে এঁদের প্রত্যেকেই অনন্যসুলভ মহিমার অধিকারিণী হয়েছেন—এবং শুধু বাবা পঞ্চানন নন, যে কোন পুং দেবতাই এঁদের অমোঘ মহিমার কাছে পরাজিত ও হতমান হয়েছেন। কিন্তু এই মাতৃ-পূজা ভক্তি ও প্রেমের ওপর প্রতিষ্ঠিত হলে আমরা সুখী হতাম। এর পেছনে ছিল অতি স্থূল রকমের প্রচারক বুদ্ধি। তাই চাঁদসদাগরকে পরম শৈবরূপে চিত্রিত করেও, মনসাকে না মানায় তাঁকে চরম দুর্গতি ভোগ করিয়ে, মাতৃ-মহিমা প্রচার করা কবিদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। এতে শিবের মর্য্যাদা ত ক্ষুণ্ণ হয়েছেই, মনসার মর্য্যাদাও কিছুমাত্র বাড়েনি—তাঁকে প্রতিহিংসাপরায়ণ, ক্রূর, স্বার্থপর একটি পিশাচিনী বলে মনে হতে থাকে। অশোভন জুলুম ও অসঙ্গত আত্ম-প্রতিষ্ঠার স্পৃহা ছাড়া তাঁর আর অন্য কোন বৃত্তিই আছে মনে হয় না। আমরা আগেই বলেছি যে ভয় থেকে এই সব দেবতার উদ্ভব। তার চেয়ে কোন শুদ্ধতর মনোভাব থেকে নয় বলেই এই সব দেব-চরিত্রের ভেতর এমন বিকট বৈসাদৃশ্য দেখা যায়।

শুধু মনসা নন, মঙ্গলকাব্যের যে কোন দেবতাই একই রকম বিচার বিবেচনাহীন জুলুমবাজ। তাঁদের মধ্যে দেবোচিত ক্ষান্তি, প্রীতি, দাক্ষিণ্য কিছুই নেই, আছে গ্রাম্য জমিদারোচিত দুর্দ্ধষ মূঢ়তা ও দুর্ণিবার পরপীড়ন বুদ্ধি। উৎকোচ গ্রহণেও তাঁদের জুড়ী মেলা ভার।

তাঁদের প্রসাদ খেতে খেতে মনের ভুলে উঠে স্বামী-সন্দর্শনে গেলে মকরাঙ্গী ডিঙা ডুববে, আবার অনুতপ্ত হৃদয়ে ফিরে এসে প্রসাদ ভক্ষণ করলেই তা ভেসে উঠবে—তাঁদের অকৃপা হলে বিনা অপরাধেই স্বামী মারা যাবে, আবার নতি স্বীকার করলেই গলিত শবদেহ পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠবে। এমন কি তাঁদের দুর্লভ কৃপালাভ হলে, পশ্চিম দিকে সূর্য্য পর্য্যন্ত উঠবে। অন্ধ ভক্ত যখনই বিপদে পড়ে, তখনি তাঁরা কোমর বেঁধে তার উদ্ধারে লাগেন—সেজন্যে যে কোন হীনতা, দীনতা ও অমানুষিকতা করতে তাঁদের বাধে না—কিন্তু আত্মসচেতন পুরুষকার যখন স্বকীয় শক্তির বলে দৈবী করুণা অগ্রাহ্য করে প্রতিষ্ঠার দিকে অগ্রসর হয়, তখনি তাঁদের সমুদয় পাশবশক্তি একত্র করে, তাকে ডুবিয়ে চুবিয়ে নাকে খৎ দিইয়ে তবে তাঁরা শান্ত হন। এ রূপ দেবতার নয়—রক্তপিপাসু রাক্ষসের। কিন্তু দেবতাকে অজ্ঞতা, অন্ধতা এবং দৌর্ব্বল্য চিরদিনই অসুররূপে দেখে এসেছে—কারণ নিজের সীমাবদ্ধ শক্তির বাইরে অশিব শক্তির অনতিক্রমনীয়তাকে সে ভীতির চক্ষে না দেখে পারে না। তবে সুখের কথা এই, মঙ্গলকাব্যে চাঁদসদাগর ছাড়া কতকটা পৌরুষও আর কোন চরিত্রে দেখা যায় না। সবাই পূর্ব্বাহ্ণেই নতশির—কিন্তু তবু তাদের দুর্গতির হাত থেকে নিস্তার হয়নি, যতই দুঃখ বেড়েছে, ভক্তি এবং নতিও তাদের ততই বেড়েছে। মনুষ্যত্বের এমন অবমাননা কোন সাহিত্যেই সুলভ নয়।

এই সব চরিত্রের পরিকল্পনায় নিজ নিজ গ্রামের জুলুমবাজ জমিদার, ঘুষখোর রাজকর্ম্মচারী, হীন-চরিত্রা গ্রাম্য ডাইনী প্রভৃতির আদর্শ লুকানো আছে কিনা সে কথাও অনুমান করা যেতে পারে। লৌকিক দেব-দেবীর উদ্ভব সম্বন্ধে স্পেন্সারের মত এক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমাদের এতক্ষণের আলোচনা থেকে এটুকু নিশ্চয় বোঝাতে পেরেছি যে, মঙ্গলকাব্যে মানুষের ইচ্ছা-শক্তি খেয়ালী দেবতাদের করতলগত, তাদের জীবনের ধারা একান্তভাবে যন্ত্রবদ্ধ। তারা যখন দুঃখ পায়, তখন কেন পায়, তা নিয়ে মাথা ঘামায় না এবং সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায়স্বরূপ যত্ন এবং উদ্যমও করে না। যূপবদ্ধ পশুর মতো অবলীলাক্রমে নিয়তির হাতে আত্মসমর্পণ করে। মুক্তি যখন আসে, সেও স্বকীয় অর্জ্জন থেকে নয়, আসে দেবতার মর্জ্জি গুণে—কাজেই সে প্রাপ্তিকেও তারা পূর্ণভাবে মেনে নিতে পারে না।

বহু বিবাহের দেশে সপত্নী পীড়নহেতু বনে বনে ছাগল চরায়, গর্ত্তে আমানি খায়, অপরিসীম দুঃখে অশ্রুপাত করে—অব্যাহতি যদি হয় ত চণ্ডিকার অনুগ্রহে। মানুষের সেখানে করণীয় কিছুই নেই। বাল্যবৈধব্য যখন হয়, তখন মৃতস্বামী বুকে নিয়ে ভেলায় ভাসতে ভাসতে, অবশেষে দৈব-কৃপাতেই আবার স্বামীর জীবন ফিরে পায়। দারিদ্র্য যখন গ্রাস করে, তখন নির্ব্বিচার প্রসাদ ভক্ষণ থেকেই ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ ঘটে—তার জন্যে কোন আয়াস বা প্রয়াস প্রয়োজন হয় না। এমন কি, অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের ক্ষেত্রেও মা-কালীর মধ্যস্থতা ব্যতিরেকে সমস্যার সমাধান হয় না। অর্থাৎ এক কথায় মানুষের ব্যক্তিত্ব বা তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব বলে কোন জিনিষকেই এই সব কাব্যে স্বীকার করা হয় নি। জেনে না-জেনে করা কোন অপরাধে কখন কোন দেবতার কোপদৃষ্টি কার ওপর পড়বে, তার ফলে ঘর-বাড়ী, ছেলেপুলে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ছিন্নভিন্ন উৎসন্ন হয়ে যাবে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই! শত সহস্র ভয় বুকে আঁকড়ে পদে পদে নতশির ও হতবিশ্বাস হয়ে কোন রকমে জীবনের বোঝা বয়ে চলাই এই সব কাব্যে মানুষের আদর্শ বলে বিবেচিত হয়েছে। ভাগ্য-বিপর্যয়কে চরমতম পরিণতি

বলে বুঝে এবং সেই পরিণতিকে অনিবার্য জেনে, তার হাতে বিনা দ্বিধায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার এই মর্ম্মান্তিক দৈন্য বিশ্ব-সাহিত্যেই আর আছে কিনা সন্দেহ! এমনধারা চোরাবালির উপর যাদের অবস্থিতি, তাদের আকস্মিক ভাগ্যোদয়ও আশঙ্কা-বিরহিত নয়—তাই তার জন্যেও কারুর উল্লাস নেই। মঙ্গলকাব্য তাই জাতীয় চিন্তা এবং চিৎ-প্রকর্ষের অত্যন্ত ধূমাচ্ছন্ন একটি দিককে প্রকাশিত করে। সেদিকে শৌর্য্য নেই, মনুষ্যত্ব নেই, সঙ্ঘাত নেই, জয় নেই—আছে অবিচ্ছিন্ন পরাজয়, অবিচ্ছিন্ন গ্লানি এবং আত্মোৎসর্জ্জন। দেবতার অনুগ্রহ ব্যতিরেকে মানুষের এক পা চলা ভার, আর সেই দেবতাও মূঢ়, অবিবেচক এবং অকারণ রুষ্টিতুষ্টির অধীন।

[৩

মঙ্গলকাব্যের দেব-চরিত্রে দেবত্ব অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর মানবত্বই অধিক পরিমাণে আরোপিত হয়েছে, একথা আগেই বলেছি। অবশ্য এই সব দেবাকার মানুষের চরিত্রে এবং কার্যকলাপে মজা নেই এমন কথা বলতে পারি না। অধিকাংশ মঙ্গলেই শিব এবং দুর্গা আছেন—কোথাও আছেন প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও বা পশ্চাৎপটে। কিন্তু সর্ব্বত্রেই তাঁদের একরূপ—সেরূপ তৎকালীন সমাজের প্রতিরূপ। পার্ব্বতী সুন্দরী, তরুণী, ধনীকন্যা—বৃদ্ধ কুলীন নেশাখোর শিবের হাতে পড়ে তাঁর লাঞ্ছনার শেষ নেই—সংসারে নিত্য অভাব, স্বামী-স্ত্রীতে নিত্য অবনিবনাও, পুত্র-কন্যাদের মধ্যে অসন্তোষ—প্রতিবেশীদের গঞ্জনা, অসহ্য লজ্জা ও বেদনাময় দাম্পত্য জীবন, আবার তারি ভেতর প্রীতি আছে, সেবা আছে, দয়া ক্ষমা আছে—মাঝে মাঝে টুকরো-টাকরা হাসিঠাট্টা আছে—এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্ব্বতীর কৈলাস-জীবন

নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য্য এবং তস্য ভার্য্যা পার্ব্বতী ঠাকুরাণীর জীবন-কাহিনী। এ আমাদের বেশ লাগে! বিজয় গুপ্তের পদ্মপুরাণ থেকে সুরু করে, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পর্য্যন্ত এরি ধারা অব্যাহতভাবে চলে এসেছে—রামেশ্বরের শিবায়ণে এই শিব-জীবনী চরমে পৌঁছেছে।

আমরা কতকগুলো নিদর্শন দিতে চেষ্টা করবো। বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে শ্মশানচারী উচ্ছৃঙ্খল অবৈষয়িকচরিত্র শিবের অদর্শনে অভিমান করে পার্ব্বতী বলছেন—

ভাল ভাঁড়াইয়া শিব পলাইয়া গেল দূর,
এবার তোমার লাগ পাইলে দর্প করিতাম চূর।
আঁচলে আঁচলে গিঁঠ বাঁধি এক ঠাই,
রাখিতে নারিনু তবু পাগল শিবাই।
কপট চরিত্র তোমার খলের সঙ্গে তঙ্গ,
যাবার আগে লাগ পাইলে দেখাইতাম রঙ্গ।
পাপ কপাল ফলে স্বামী পাইলাম ভাল,
ভাঙ্গ ধুতুরা খায় পরিধান বাঘছাল।
প্রেতের সনে শ্মশানে থাকে মাথায় রাখে নারী,
সবে বলে পাগল পাগল কত সইতে পারি।
নিন্দে ভাবিতে প্রাণে বড় লাজ লাগে,
চড়ে বেড়ায় দুষ্ট বলদে তাহারে খাউক বাঘে।
লাগুক আগুন কান্ধের ঝুলি ত্রিশূল লউক চোরে,
গলার সাপ গরুড়ে খাউক যেমন ভাণ্ডাইল মোরে।
ছিঁড়িয়া পড়ুক হাড়ের মালা, পড়ে ভাঙুক লাউ,
কপালে তিলকচন্দ্র তারে গিলুক রাউ।

এই দাম্পত্য অসন্তোষ ও দ্বন্দ্ব চরমে উপনীত হয়েছে রামেশ্বরের শিবায়ণে। সেখানে স্বামীর সঙ্গে কলহ করে পার্ব্বতী পুত্র-কন্যা নিয়ে বাপের বাড়ী চলেছেন।

দণ্ডবৎ হইয়া দেবের দুটি পায়,
কান্ত সনে ক্রোধ করি কাত্যায়নী যায়।
কোলে করি কার্ত্তিকেরে হস্তে গজানন,
চঞ্চল চরণে হইল চণ্ডীর গমন।
গোড়াইল গিরীশ গৌরীর পিছু পিছু,
শিব ডাকে শশীমুখী নাহি শুনে কিছু।
নিদান দারুণ দিব্য দিল দেবরায়,
আর গেলে অম্বিকা আমার মাথা খায়।
করে কর্ণ চাপিয়া চলিল চণ্ডবতী,
ভাষিল ভাই এর কিরা ভবানীর প্রতি।
ধাইয়া ধূর্জ্জটি গিয়া ধরে দুটি হাতে,
আড় হইয়া পশুপতি পড়িলেন পথে—
যাও যাও যত ভাব জানা গেল বলি,
ঠাকুরে ঠেলিয়া ঠাকুরাণী গেল চলি।

এই সমস্ত বিবাদ-বিসম্বাদ ও মান-অভিমানের আশেপাশেই আবার স্নেহ-প্রীতির এবং কৌতুকপূর্ণ পারিবারিক প্রশান্তিরও মনোরম চিত্র পাওয়া যায়। রামেশ্বর পার্ব্বতীর গৃহস্থালীর একটি চিত্র দিয়েছেন—

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী,
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি।
তিনজনে একুনে বদন হল বারো,

গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার।
তিনজনে বারো মুখে পাঁচ হাতে খায়,
এই দিতে এই নাই হাঁড়ি পানে চায়।
শুক্তা খেয়ে ভোক্তা চায় হস্ত দিয়া নাকে,
অন্নপূর্ণা অন্ন আনো রুদ্রমূর্ত্তি ডাকে।
গুহ গণপতি ডাকে অন্ন আনো মা,
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য্য ধরে খা।
মূষিকী মায়ের বাক্যে মৌন হয়ে রয়,
শঙ্কর শিখায়ে দেন শিখিধ্বজ কয়—
রাক্ষস ঔরসে জন্ম রাক্ষসীর পেটে,
যত পাবো তত খাবো ধৈর্য্য হব বটে।

পদ্মার (মনসা) বিবাহকালে জামাতা নির্ব্বাচন নিয়ে শিব-দুর্গার রহস্যালাপের যে চিত্র বিজয় গুপ্ত দিয়েছেন, রুচির প্রশ্ন না তুলে পড়তে পারলে, তাও কারুর মন্দ লাগবার কথা নয়।

জামাই এনেছি পুণ্যবান
কন্যা করিব দান
বিবাহের সজ্জা কর ঘরে—
এনেছি মুনির সুত
রূপে গুণে অদ্ভুত
কন্যা সমর্পিব তারে।

হাসি বলে চণ্ডি আই
তোমার মুখে লজ্জা নাই
কিবা সজ্জা আছে তোমার ঘরে ?

এয়ো এসে মঙ্গল গাইতে
চাইবে তারা পান খাইতে
আর চাইবে তৈলে সিন্দূরে।
হাসি বলে শূলপাণি
এয়ো ভাণ্ডাইতে জানি
মধ্যে দাঁড়াবো নেংটা হয়ে।
দেখিয়া আমার ঠান
এয়োর উড়িবে প্রাণ
লাজে ভয়ে যাবে পলাইয়ে।

এ সমস্ত চিত্রে তৎকালীন দরিদ্র হিন্দু পরিবারের প্রাত্যহিক জীবনের ছায়া সুস্পষ্ট। সে জীবন চলে গেছে, কিন্তু সাহিত্যে তার রূপ আজো স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে রয়েছে। এই সমস্ত চিত্র এত জীবন্ত এবং এমন নিখুঁত বলেই এগুলো উপেক্ষিত হবার নয়। সত্যকে অবলম্বন করে এদের জন্ম বলেই, রচনার সহস্র ত্রুটি সত্ত্বেও এগুলি সুখপাঠ্য, কিন্তু এর ভেতর থেকে কোন আধ্যাত্মিকতা আবিষ্কার করতে গেলেই বিপদ ঘটবে—কারণ তা এতে নেই। শিবের এই বাহ্যজ্ঞানহীন ভাঙ্গড়রূপ ভারতচন্দ্রের হাতে খানিকটা ঐশ্বর্য্যমণ্ডিত হয়েছে—কিন্তু তাও সমসাময়িক সমাজকে সর্ব্বত্র ছাপিয়ে উঠতে পেরেছে কিনা সন্দেহ! দক্ষ যজ্ঞ নাশের বর্ণনা কালে শিবের যে রূপ তিনি অঙ্কিত করেছেন, শব্দ-চাতুর্য্যে, দৃষ্টি-গাম্ভীর্য্যে তা সত্যিই সুন্দর—

মহারুদ্ররূপে মহাদেব সাজে,
ভভম্ভম ভভম্ভম শিঙ্গা ঘোর বাজে।
লটাপট জটাজুট সংঘট্টে গঙ্গা,
ছলচ্ছল টলটল কলকল তরঙ্গা।

ফণাফণ ফণাফণ ফণী ফন্ন গাজে,
দিনেশ প্রতাপে নিশানাথ সাজে।
ধ্বক ধ্বক ধ্বক ধ্বক জ্বলে বহ্নি ভালে,
ভভম্ভম ভভম্ভম মহাশব্দ গালে !

এ সত্যিই রুদ্রের মূর্ত্তি—এ মূর্ত্তি ভারতচন্দ্রের সৃষ্টি, কিন্তু তিনিও প্রায়শঃই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেছেন, কাজেই এই রূপটি কদাচিৎ বজায় রাখতে পেরেছেন।

[৪]

মঙ্গল কাব্যের বিষয়-বস্তু এবং রচনা-রীতি সম্বন্ধেও যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা দরকার। সব কাব্যের বিষয়ই প্রায় একরূপ, পদ্ধতিও প্রায় অভিন্ন। সব কবিই স্বপ্নে আদিষ্ট হন, তাঁর প্রিয় দেবতার মহিমা মর্ত্ত্যে প্রচার করবার জন্যে এবং সব কাব্যই সুরু হয় দেবতার জুলুমবাজী দিয়ে। সব নায়ক-নায়িকাই দুর্গতি ভোগ করেন একই রকম ভাবে এবং সকলেরই দুঃখ-মুক্তি ঘটে দেবতার অসম্ভাবিত অনুগ্রহ বর্ষণে। মাঝখানে বিরহিনীর বারমাস্যা, কুলকামিনীর পতিনিন্দা, দুর্গতদের দেব-মহিমা-সূচক আক্ষরিক স্তব এবং নায়ক-নায়িকার অলঙ্কার শাস্ত্রানুমোদিত ছক-বাঁধা রূপ-বর্ণনা…সব কাব্যেই একরূপ। এর ইতর-বিশেষ কোথাও নেই। এমন কি এক দেবতাকে নিয়েই রাশি রাশি মঙ্গল লেখা হয়েছে—তৎকালীন কবিদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং মৌলিকতার অভাবের এ একটি জলন্ত উদাহরণ।

তবু এরই ভেতর কবিকঙ্কণের চণ্ডীতে এবং ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে ও অন্নদামঙ্গলে কবিদ্বয়ের কিছু কিছু নিজস্বতার আভাসও পাওয়া যায়। প্রথমের উৎকর্ষ চিত্রাঙ্কনে, দ্বিতীয়ের শব্দ-ঝঙ্কারে।

কবিকঙ্কণ একটি দুটি কথায় এক একটি সমগ্র চরিত্র পরিস্ফুট করে তুলতে পারেন। তাঁর মুরারি শীল, ভাঁড়ু দত্ত, কালকেতু ব্যাধ, ফুল্লরা, প্রত্যেক চরিত্রই চিত্রণের দিক থেকে প্রায় নিখুঁত। অন্নাভাবপীড়িতা ফুল্লরা, ধূর্ত্ত বেণে মুরারি বা স্বভাব দুর্জ্জন ভাঁড়ুর চিত্র কবিকঙ্কণের হাতে রীতিমতো জীবন্ত হয়েছে। মনে হয়, এরা যেন আমাদের দেখা লোক, এদের সকলের উপরই কবি এমন একটি সহজ বাস্তবতা আরোপ করেছেন। অবশ্য চসারের চরিত্রাঙ্কনের সঙ্গে যাঁরা তাঁর তুলনা করেন, তাঁরা কেন করেন তা আমার বুদ্ধির অগোচর। কারণ চসারের সঙ্গে এ বিষয়ে পাল্লা দিতে পারেন ইংরাজী সাহিত্যেও এমন লেখক খুব বেশী নেই। পক্ষান্তরে মঙ্গলকাব্যের চরিত্রগুলো অনেকটা প্রসিদ্ধিগত—মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতেও ঠিক এই চরিত্রগুলিই আছে এবং সেখানেও তাদের ঠিক একই রকম উৎকর্ষ দেখা গিয়ে থাকে। তুলনায় সমালোচনার স্থানাভাব বশতঃ আমরা শুধু কবিকঙ্কণের চরিত্রাঙ্কনেরই সামান্য একটু নিদর্শন দিচ্ছি। বালককালকেতুর বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

দুই চক্ষু জিনি নাটা
ঘুরে যেন কড়ি-ভাঁটা
কাণে শোভে স্ফটিক কুণ্ডল।

পরিধান বীর ধড়ি
মাথায় জালের দড়ি
শিশু মাঝে যেমন মণ্ডল।

এর চেয়ে সুন্দর চরিত্র-চিত্র এত অল্প কথায় আর কি হতে পারে? ভারতচন্দ্রও হীরামালিনীর চিত্রাঙ্কনে এম্নিতর নৈপুণ্যের

পরিচয় দিয়েছেন। হীরার আকৃতি-প্রকৃতি ও স্বভাবের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে, তিনি শেষে মন্তব্য করেছেন—

আছিল বিস্তর ঠাট প্রথম বয়সে,
এবে বুড়া তবু গুঁড়া কিছু আছে শেষে।

যে হীরার মধ্যস্থতায় বিদ্যাসুন্দরের বীভৎস ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, এই ক্ষুদ্র একটি মন্তব্য তার সমগ্র চরিত্রটিকে পাঠকের মনশ্চক্ষে উদ্ঘাটিত করে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয় কি? বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার গর্ভ-সংবাদে রাণীর রোষ-বর্ণনাতে ভারতচন্দ্রের চরিত্রাঙ্কন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে চিত্রাঙ্কণে কবিকঙ্কণ ভারতচন্দ্রের চেয়ে শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন। ভারতচন্দ্রের চাতুর্য্য মাধুর্য্য সবই শব্দলালিত্যগত। চরিত্র-চিত্রণের দিক থেকে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর উৎকৃষ্টতর—ভারতচন্দ্র শব্দ-লীলার ওস্তাদ, প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে এদিকে তাঁর জুড়িই নেই। কিন্তু এতেই তাঁর কাব্যের মানবীয় আবেদন পদে পদে খর্ব্ব হয়েছে। এ ছাড়া ঘনরামকৃত ধর্ম্মমঙ্গলে কালুডোমের বা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা মঙ্গলে সনকার চরিত্রেও জায়গায় জায়গায় বেশ লিপিকুশলতা দেখা যায়। বাসরে বিধবা বিভ্রান্ত বেহুলাকে দেখে ক্রোধে অধীর সনকা গাল পাড়ছেন—

সিঁথির সিঁদূরে তোর না ধরিল মলি,
অঙ্গের বসনে তোর না পড়িল কালি,
খণ্ড কপালী বেহুলা চিরুণদাঁতী,
বিয়ার রাত্রে খাইলি পতি না পোহাতে রাতি।

বিবাহের পর সন্তানের যে-কোন অকল্যাণের জন্য শাশুড়ীর তরফ থেকে বউকে দায়ী করার সনাতন রীতি সনকাকে এখানে

জীবন্ত করে তুলেছে। কিন্তু সেই বেহুলা যখন আবার মৃত স্বামীকে পুনরুজ্জীবিত করার দুশ্চর ব্রত নিয়ে দুর্গমে ঝাঁপ দিলে, তখন—

সনকা কাঁদিয়া বলে আলো অভাগিনী
এ তিন ভুবন মাঝে কভু নাহি শুনি,
বালিকা যুবতী বৃদ্ধা যার পতি মরে,
বিধবা হইয়া সেই থাকে নিজ ঘরে।
কিসের কারণে তুমি জলেতে ভাসিবে,
প্রতীতি কাহার বলে কান্তে জীয়াইবে ?

পুত্রশোকাতুরা জননীর মাতৃ-হৃদয়ের এই স্নেহাবেগটুকু আমাদের অচেনা মনে হয় না। অকাল বৈধব্যের সমাজে এই মাদের আমরা নিত্য নিয়তই দেখছি।

কিন্তু মঙ্গলকাব্যে এই রকম মানবীয় আবেদনের পরিমাণ বড়ই কম। উচ্চাঙ্গের কবিত্বের কথা ছেড়েই দিই, সহজভাবে ভালো লাগবার উপাদানই ওতে দুর্লভ। ওদের বিষয়বস্তু যেমন মামুলি, রচনারীতি তেমনি আড়ষ্ট। সর্ব্বোপরি ওদের সমস্ত ঘটনা, সমস্ত আন্দোলন-আলোড়নকে আড়াল করে যে দেবদেবীরা ভীড় করে আছেন, তাঁরা অসম্ভব রকম অসহ্য।

চতুর্থ অধ্যায়

ময়মনসিংহ গীতিকা

[প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের আগাগোড়াই উপ-ধর্ম্ম প্রভাবান্বিত। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, বাউল, নানা ধর্ম্ম সম্প্রদায় বাংলার সমাজ জীবনকে অধিকার করে থেকেছে—দেশের সাহিত্যও তাই আবর্ত্তিত হয়েছে এই সমস্ত ধর্ম্মচক্রকে কেন্দ্র করে। এ হিসেবে চর্য্যাপদ থেকে শ্যামা সঙ্গীত পর্য্যন্ত, প্রায় এক হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যেই একটি অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্য দেখা যায়। উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা নিষ্কলুষ ব্রাহ্মণ্য সংস্কারকে আঁকড়ে রয়েছেন, অন্ত্যজেরা তাঁদের হাতে উৎপীড়িত হয়ে বিদ্রোহ করছে না, বরং নিজেদের লৌকিক ক্রিয়াকলাপ ও পূজা-পদ্ধতিকে ব্রাহ্মণ্য সনন্দ দিয়ে জলাচরণীয় করবারই চেষ্টা করছে। বৈষ্ণব সাহিত্যে সামান্য একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু সেখানেও ধর্ম্মের আশ্রয় ছেড়ে নির্ম্মুক্ত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব দেখা দেয় নি। ময়মনসিংহ গীতিকা যদি প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে বলতে হবে, বাংলার এই একমাত্র প্রাচীন সাহিত্য পর্য্যায়, যাতে উপ-ধর্ম্মের বেড়াজাল মুক্ত প্রত্যক্ষ মানুষ দেখা দিয়েছে, যাতে তার সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার সহজ অধিকার সসম্মানে স্বীকৃত হয়েছে। বর্ণাশ্রম ব্যবস্থিত উচ্চ-নীচের সংস্কার, সতীত্বের সংস্কার, তথাকথিত ধর্ম্মের সংস্কার, সব কিছুর বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ ঘোষণা করে, এতে বাস্তবের নর-নারীরা সাহিত্যের রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু এর বর্ণাশ্রম বিরোধিতা, গল্পাংশের মানুষী আবেদন ও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, সর্ব্বোপরি নিপুণ শব্দ-যোজনা ও যুগ্মমিল ব্যবহার থেকেই ময়মনসিংহ গীতিকার প্রাচীনতা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। অনেকের বিশ্বাস, এগুলি এ যুগের লেখা—এবং ইচ্ছে করে প্রাদেশিক ও পুরাতন archaic শব্দ ব্যবহার না করা হলে, তা অনেক আগেই ধরা পড়তো !]

ময়মনসিংহ গীতিকা সম্পর্কে কোন আলোচনার প্রথমেই যে প্রশ্ন ওঠে, তা এদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে। এদের আবিষ্কর্ত্তারা

এদের যতটা প্রাচীন বলে প্রচার করেছেন, ততটা প্রাচীন এরা সত্যিই কি না সে বিষয়ে সন্দেহ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে, আর কাব্যাংশে এদের সর্ব্বত্রই যে উৎকর্ষ দেখা যায়, তার সবটুকুই তৎকালীন, না আধুনিক সংগ্রাহকদের রিপুকর্ম্মসঞ্জাত, সে কথাও ভেবে দেখা অনাবশ্যক নয়। অবশ্য এই দুই সন্দেহই মূলতঃ এক এবং এর সমাধানের আবশ্য-কতাও কম নয়। তাই যে যুক্তিপরম্পরার ওপর এই মতের স্থিতি, তা নিয়ে আগে আলোচনা প্রয়োজন।

বাংলা সাহিত্যে উপাখ্যান কাব্যের একমাত্র বৃহত্তম শাখা হচ্ছে মঙ্গলকাব্য শাখা। তাতে আমরা যে নর-নারীর জীবন ও কার্য্যকলাপ দেখতে পাই, তা একান্ত যন্ত্রবদ্ধ। তারা সত্য বা কল্পিত নানা ছোট বড় দেবদেবীর অনুগ্রহ-নিগ্রহের অধীন, তাদের স্বকীয় ইচ্ছাশক্তি নেই—তার সমর্থনও নেই। তারা চলে দৈবীমহিমা পরিস্ফুটনের বাহনরূপে। তাই তাদের সামাজিক মনের স্বাকৃতি নেই, তাদের হাসি, অশ্রু, প্রেম, বিরহ তাই উপ-ধর্ম্মের জারক রসে শোধিত। দেবতার অনুগ্রহে তাদের অনুকূলে সূর্য্য পশ্চিমে ওঠে (ধর্ম্মমঙ্গল), মৃত স্বামী নবজীবন লাভ করে (মনসামঙ্গল), আর অকৃপায় ছেলে মরে, নৌকা ডোবে, ঘরে আগুন লাগে। সুতরাং তারা তেত্রিশ কোটি দেবতার হাতের খেলার পুতুল—ভয়ে অনুতাপে লজ্জায় কোন রকমে তারা জীবনের ভার বয়ে চলেছে।

এই সব মঙ্গলকাব্যই ছিল বাংলার প্রিয় কাব্য। এ ছাড়া ছিল বৈষ্ণব কাব্য। তাতে প্রত্যক্ষ জীবনের মিলন-বিরহের ও তার আনুষঙ্গিক দুঃখ-বেদনার ভাষা আছে, কিন্তু মানুষ তাকে সোজাভাবে স্বীকার করে নেয় নি। তার ওপর রূপক চাপিয়ে, রাধা-কৃষ্ণের আড়াল দিয়ে তাকে তবে গ্রহণ করেছে। যেখানে ভাষা বিরুদ্ধতা করেছে,

সেখানে ভাবের ওপর আধ্যাত্মিক আবরণ চাপাতে হয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এই দুটি বৃহৎ শাখাই এইভাবে ধর্ম্ম-মাহাত্ম্যের কবলে পড়ে প্রত্যক্ষ জীবনের সঙ্গে সম্বন্ধভ্রষ্ট হয়েছে—অথচ এই হচ্ছে প্রাচীন বাংলার বিদগ্ধ জনের সাহিত্য।

এর অন্তরালে কি করে ময়মনসিংহ গীতিকার মতো একটি বৃহৎ সাহিত্যশাখা সর্ব্ববিধ ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করেও আপন প্রাণ-শক্তিতে মূর্ত্তিমন্ত হয়ে উঠলো, যাতে নেই বিন্দুমাত্র দেব-মহিমার গন্ধ, মানুষের হৃদয়বৃত্তির অকুণ্ঠ অনুগমনে ও প্রকৃতির হাতে অবাধ আত্ম-সমর্পণে যা সহজ ও সার্থক? হতে পারে, শিক্ষিত অপেক্ষা নিরক্ষরের দৃষ্টি ও অনুভূতি অনেক বেশী সজীব থাকে, মতের আবর্ত্তে পড়ে না বলেই তার মতিও হয়ত বিভ্রান্ত হয় কম, কিন্তু দেশীয় সংস্কৃতির প্রভাব, দেশীয় চিন্তাধারার প্রবর্ত্তনা কি সমাজ-চক্রের নিম্নতম স্তরকেও আবিল করে না? ময়মনসিংহ গীতিকার একান্ত মানুষী ভাব এবং সেই ভাবের পূর্ণতা, বলিষ্ঠতা ও স্বাভাবিকতাই এর প্রাচীনতার বিরুদ্ধে সন্দেহকে উদ্রিক্ত করে। দেশের প্রত্যাশিত সাহিত্যধারার সঙ্গে সম্বন্ধ রহিত বলেই এ সন্দেহ।

তারপর এদের রচনা-পদ্ধতি। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে কবিকঙ্কণ এবং বৈষ্ণবকাব্যের মধ্যে চণ্ডীদাস ছাড়া আর সমস্ত কবিই জেনে হক, না জেনে হক, ক্লাসিক্যাল অলঙ্কারশাস্ত্রের অনুসরণ করেছেন—তাঁদের বর্ণনা, উপমা, ঘটনাসমাবেশ সবই যেন ছক-বাঁধা—কবিকঙ্কণে এবং চণ্ডীদাসে এই ছকের আভাস একেবারে পাই না এমন নয়, তবু তাঁদের স্বাধীন পথে হাঁটার পরিচয় মেলে, আর কুত্রাপি যা সুলভ নয়। কিন্তু ময়মনসিংহ গীতিকায় কি ঘটনায়, কি বর্ণনায়, কি উপমা-প্রয়োগে, কবিরা পারতপক্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই মৌলিক। সে মৌলিকতা যদি অশিক্ষিত

পটুত্ব হয় ত বলতে হবে, তাই সত্যিকার সাহিত্য-প্রতিভা। কোথাও খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, রাজহংসীনিন্দিত গতি বা তজ্জাতীয় আবর্জ্জনার সাক্ষাৎ পাইনে। সর্ব্বত্র সহজ স্বচ্ছ বক্তব্য—যে কথাটি প্রথম আবেগেই মনে আসে, ঠিক সেই কথাটির প্রয়োগ—এও দেশীয় সাহিত্য-ধারা থেকে একবিন্দু কিছু ধার করে নি। আর মিলের এবং শব্দ-বিন্যাসের পারিপাট্যও দেখা যায় প্রায় সর্ব্বত্রই। মঙ্গলকাব্যের কবিরা পয়ার আর ত্রিপদীর চড়াই উৎরাতে গিয়ে মুহুর্মুহু চিৎ হয়ে পড়েছেন—ময়মনসিংহ গীতিকার কবিরা কিন্তু অবাধ অবলীত বেগে চমৎকার দুনো মিল দিয়ে চলে গেছেন, কোথাও হোঁচট খাবার বা হেঁচড়ে চলার চিহ্ন মাত্র নেই। বরং স্থানে স্থানে এমন অনেক অংশ আছে, প্রকাশ ভঙ্গীতে, শব্দযোজন কৌশলে, যা আধুনিক কাব্য-ধারার অনুরূপ এবং সে রকম স্থান বড় কম নেই।

এই দুই কারণে যে সন্দেহ মনে জাগে তাকে অপ্রাসঙ্গিক ভাবা চলে না। একখানি মাত্র কাব্য হলে, সেটাকে আকস্মিক বলা যেতো। কিন্তু একটি সুদীর্ঘ শাখা ত একটা ধারা প্রচলিত না থাকলে জন্মায় না। কাজেই যদি বলি গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু অংশও পুরাতন—কিন্তু তাকে ঘষে-মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে, আগাগোড়া এ কালেই লেখা হয়েছে, একালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে তার জন্মান্তর সাধন করা হয়েছে, তাহলে কিছু অন্যায় বলি কিনা জানি না। তবে যিনি বা যাঁরা এই কাজ করেছেন, তাঁর বা তাঁদের দক্ষতার ওপর আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা হবারই কথা।

ময়মনসিংহ গীতিকার সর্ব্বপ্রধান যে বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে, তাহচ্ছে এর সত্যকার জীবনকে সহজভাবে স্বীকার করে নেয়া। গীতিকা মূলতঃ প্রেমেরই কাব্য—কিন্তু এ প্রেম পারমার্থিকতার পুটপাকে শোধিত নয়,

এ প্রেমে ঈর্ষা আছে, অসন্তোষ আছে, বিদ্রোহ আছে, লালসা আছে—এর জন্যে বেদনা আছে, ত্যাগ, তিতিক্ষা, এমন কি মৃত্যু পর্য্যন্ত আছে, তবু তা নিয়ে কোন মতবাদের বড়াই নেই। কোন দৈবী বা নৈতিক উপদ্রবে তার সহজ গতি কোথাও অবরুদ্ধও হয় নি। হিন্দুর মেয়ে মুসলমানকে ভালোবেসেছে, বামুণের ছেলে বেদের মেয়েকে ভালো-বেসেছে, এই ভালোবাসার জন্যে ঘরে-বাইরে বহু নির্য্যাতন বহু লাঞ্ছনা পেতে হয়েছে, তার জন্যে কেউ কোন মহিমার দাবী করেনি, জীবন ধারণের অনতিক্রমণীয় তাগিদ থেকেই এসেছে এই প্রেম—এবং তাকে উপলক্ষ্য করে নানা সুখ-দুঃখের আবর্ত্তনেই জীবন বয়ে চলেছে।

কোড়া পাখী শিকার করতে এসে শিকারী জলাশয়ের ধারে ঘুমিয়ে পড়েছে, জল নিতে এসে তন্বী কিশোরী তার রূপে মুগ্ধ হয়েছে—সেই মোহ তার শালীনতার পর্দ্দাকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। বেদের মেয়ে বাঁশবাজী দেখাতে এসেছে, তার যৌবনপুষ্ট নিটোল দেহভঙ্গী ও বিপজ্জনক ক্রীড়া-কৌশল যুবক ব্রাহ্মণকুমারকে প্রেম ও সহানুভূতিতে অধীর করেছে, সেই অধৈর্য্য তাকে বনে বনে মাঠে মাঠে ঘুরিয়েছে তার বাঞ্ছিতার আশায়। প্রেমের এই সহজলীলা ও তার স্বীকৃতি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও নেই। এমন নিখুঁত ভাবে মানব-মনের ধারাকে উপলব্ধি করার পরিচয় মঙ্গলকাব্যে ত দূরের কথা, বৈষ্ণব কাব্যেও নেই। সেখানে মানুষের সামাজিক মনই নেই—তার পরিবেশই অপ্রাকৃত—তাই তার আবেদনও মর্ম্মাভিমুখী নয়।

কঙ্ক-লীলা, কি মলুয়া, কি চন্দ্রাবতীর কাহিনী পড়লে, আমাদের আশে পাশের স্ত্রী-পুরুষদের কথাই আমরা ভাবি। যে কান্না-হাসির দোলা খাই, তা নিরুদ্দিষ্ট ভাবময় স্ত্রী-পুরুষের জন্যে নয়, রক্তমাংসের মানুষের জন্যে।

শিশু কালের সঙ্গী তুমি যৌবন কালের মালা।
তোমারে দেখিতে কন্যা মন হইল উতলা॥
ভালো নাহি বাস কন্যা এই পাপিষ্ঠ জনে।
জন্মের মতো বিদায় হইলাম ধরিয়া চরণে॥
দেবপূজার ফুল তুমি, তুমি গঙ্গার পানি।
আমি যদি ছুঁই কন্যা হইবা পাতকিনী॥

প্রথম যৌবনের প্রণয়ী পথভ্রষ্ট প্রেমিকের এই অনুতাপের মধ্যে অস্বাভাবিকতা বা আড়ষ্টতা কোথাও নেই। এ যেমন প্রত্যাশিত, তেমনি প্রাণবন্ত। কিন্তু এর চেয়ে ভালো কাব্য আর কি হতে পারে?

চান্দ সুরজ ডুবুক আমার সংসারে কাজ নাই,
জ্ঞাতি বন্ধু জনে আমি আর ত নাহি চাই।
তুমি যদি ডুব কন্যা আমায় সঙ্গে নাও,
একটি বার মুখে চাইয়া প্রাণের বেদন কও।
ঘরে তুইল্যা লইব আমার সংসারে কাজ নাই,
জলে না ডুবিও কন্যা ধর্ম্মের দোহাই।

দুর্বৃত্তের হাতে ধর্ষিতা সতী স্ত্রীর আত্মবিঘাতনের মুখে অক্ষম প্রেমমুগ্ধ স্বামীর এই আকুল রোদনের মতো সহজ কাব্য বাংলা সাহিত্যেই দুর্লভ। বেহুলা কলার মন্দাসে ভাসার সময়, সনকা এবং বেহুলার ভাইয়েরা তাকে নিরস্ত করতে এসে যা বলেছিল, তার তুলনায় এটুকু হীরার টুকরার মতো উজ্জ্বল নয় কি?

কামলুব্ধ দুর্বৃত্তের কবলে পড়ে কুলবতী নারী বলছে—

গাঙের পারের হিজল গাছ ফুট্যা রইছু ডালে,
দুঃখের কথা কইও মোর বন্ধুর নাগাল পাইলে

সাক্ষী হইয়ো নদী নালা আর পশু পাখী,
অভাগী সুনাইয়ে দিল কাল বিধাতা ফাঁকি
সত্য যুগের বায়ু সাক্ষী আর ত সাক্ষী নাই,
বন্ধুরে কইয়ো তোমার মরেছে সুনাই।

রাবণের রথে আবদ্ধ সীতার আর্ত্তনাদ এর কাছে কত কৃত্রিম মনে হয়! বলা বাহুল্য আমি কৃত্তিবাসের সীতার কথাই বলছি।

সর্ব্বত্র এই সহজ স্বচ্ছতার গুণেই গীতিকা এত বড় সাহিত্য হতে পেরেছে। এর মূলে আছে জীবনকে সাদা চোখে দেখা এবং সেই দেখাকে সোজা করে প্রকাশ করার প্রেরণা। তাই অপ্রয়াস সৌন্দর্য্যে এরা ঋজু হয়ে উঠেছে, তাই নিখুঁত মনস্তত্ত্বে প্রত্যেকটি রচনাই সুষমান্বিত হয়েছে। যাঁরা এই সব রচনাকে সেক্সপীয়রের লেখনীর যোগ্য বলেছেন, তাঁরা কি মনে করে বলেছেন জানি না। তবে আমার মনে হয়, স্বাভাবিক জীবনকে অস্বাভাবিক করে দেখানো সেক্সপীয়ারের মতো কোন কবিতেই পাওয়া যায় না—এ বিষয়ে টলষ্টয়ের সঙ্গে আমরা একমত। গীতিকা ও-ধারার জিনিষই নয়। এর তুলনা ইংরাজী এবং স্কচ ব্যালাডে আছে—কোন কাব্যে-নাটকে নেই। যে সমস্ত দ্বন্দ্ব এতে রূপ পেয়েছে, যেমন প্রেমাস্পদকে পাবার পর তার ব্যর্থতা উপলব্ধি করা—তাও সহজ পথেই চলেছে, তাতে কোন প্যাঁচের আশ্রয় নিতে হয়নি, যেমন নিতে হয়নি ভালোবাসার সূচনা করতে কোন আড়ম্বরের আশ্রয়।

এখন প্রশ্ন আসে, এ জীবন কাদের? এ জীবন কোন দেশ বিশেষের বা সম্প্রদায় বিশেষের যে নয় তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ দেশের পারিবারিক পরিবেশে ভালোবাসা কোন দিনই প্রশ্রয় পায়নি—তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম্ম বলে চালাতে হয়েছে—

তাই বিদ্যাসুন্দরকেও শেষ পর্য্যন্ত কালীমাহাত্ম্য দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। সেই দেশে এই বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম, এই সমাজ-দ্রোহ, এই সমর্থনহীন অবাধ প্রেম ও তার পরিণাম সম্বন্ধে এই ধারণা এলো কি করে? এই প্রশ্ন থেকেই সন্দেহ জাগে গীতিকার প্রামাণিকতা নিয়ে।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈষ্ণব কবিতা

[মধ্যযুগীয় বাংলার যে সমাজ চিত্র মঙ্গলকাব্যে পাওয়া যায়, তাতে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও ধর্ম্মদ্বেষের একাধিপত্য চলছে। এদের উপদ্রবে সমাজ-জীবনের সজ্ঘশক্তি অন্তর্হিত হয়েছিল, উঁচে-নীচে ভেদাভেদের গণ্ডীটা হয়েছিল সুস্পষ্ট এবং পরস্পরের ভেতর গড়ে উঠেছিল অবিমিশ্র শত্রুতার সম্বন্ধ। এই সমাজ-বিপর্য্যয় সংস্কার করবার ব্রত নিয়েই বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হল এবং মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বাংলায় সাম্য সংস্থাপক প্রেমধর্ম্ম প্রচার করলেন। উন্নত-অবনত, হিন্দু-মুসলমান নির্ব্বিশেষে বাঙালী এই ধর্ম্মকে স্বীকার করে নিলে, যদিও প্রথমটা তার ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের এবং মুসলীম রাজশক্তির সঙ্গে প্রবল সজ্ঘর্ষ হয়েছিল। কিন্তু চৈতন্যের আন্দোলন শেষ পর্য্যন্ত সমাজ-জীবনে সাম্য সংস্থাপনে সমর্থ হল না— জাতিহারা কতকগুলি সম্প্রদায় বৈষ্ণবতাকে জাতি হিসাবে গ্রহণ করলো এবং বর্ণ-হিন্দুদের মধ্যে ওটা রয়ে গেল বিশিষ্ট একটা পূজা-পদ্ধতি হিসাবে। চৈতন্যের পূর্ব্ব থেকেই বাংলায় রাধা-কৃষ্ণ লীলা সম্বন্ধীয় প্রেম-সঙ্গীত চলিত ছিল—জয়দেবের গীত-গোবিন্দে, বিদ্যাপতির মৈথিল পদাবলীতে, চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ কীর্ত্তনে তা প্রমাণ হয়। মহাপ্রভু যখন বৈষ্ণব ধর্ম্মকে দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করালেন এবং তাঁর রাগাত্মিক সাধন-প্রক্রিয়া দেশে প্রচার করলেন, তখন থেকে বৈষ্ণব কবিতা আধ্যাত্মিক সংজ্ঞা ধারণ করলো। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের জন্মের পূর্ব্বেই বৈষ্ণব

কাব্য জন্মেছিল, তাই এর আধ্যাত্মিক দাবী ষোল-আনা স্বীকার করা যায় না। এখন প্রশ্ন উঠবে, এই প্রেমধর্ম্ম বাংলায় এলো কোথা থেকে? অনেকে বলেন, মোগল দরবার দিয়ে সুফী কবিতার প্রভাবে, নয়ত নবদ্বীপের টোলে দাক্ষিণাত্য থেকে আগত ছাত্রদের হাত দিয়ে তামিল কবিতার প্রভাবে এর উদ্ভব। ব্রজেন্দ্রনাথ শীল বলেছেন, সেণ্ট টমাসের মিশন থেকে খৃষ্টীয় প্রভাবে এর জন্ম। সে মত আজ আর অবশ্য স্বীকৃত নয়।]

[১]

বাংলা দেশে চৈতন্য মহাপ্রভু কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার ও প্রবর্ত্তন হবার ফলে বৈষ্ণব কবিতার একটা আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি ঘটেছে। বৈষ্ণব কাব্যের সাহিত্যের দিকটা প্রায় সমগ্র ভাবেই দেশের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে এবং এর রূপকের দিকটাই করেছে প্রাধান্য লাভ। এখনো একে নিছক সাহিত্য হিসেবে দেখতে যাওয়া রীতিমতো বিপজ্জনক। তবু পাশ কাটিয়ে গিয়ে লাভ নেই।

আমি বৈষ্ণব কবিতার আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা একেবারেই স্বীকার করি না। বাংলা দেশে মহাপ্রভুর আবির্ভাবের অনেক আগেই রাধা-কৃষ্ণ লীলা অবলম্বনে গীতি-কবিতা রচিত হয়েছে। পদাবলী-লেখক চণ্ডীদাস সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতভেদ যাই থাকুক, কৃষ্ণকীর্ত্তন-লেখক চণ্ডীদাস যে মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী লেখক তা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে। এ ছাড়া বিদ্যাপতির মৈথিলী পদও এদেশের ঘরে ঘরে সবিশেষ প্রচার লাভ করেছিল—এবং দেশের বহু কবিই নিজের মাতৃভাষা ছেড়ে বিদ্যাপতির ভাষায় কবিতা লিখেছিলেন। আর মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়ও প্রাক-চৈতন্যযুগের রচনা।

জয়দেবের উল্লেখ করতে পারতাম, কিন্তু তিনি সংস্কৃতে লিখেছেন, যদিও তাঁর সংস্কৃত রীতিমতো বাংলা-ঘেঁষা। এই সমস্ত কবি আধ্যাত্মিক স্বীকৃতি পেয়েছেন পরে, কিন্তু এঁদের সমকালে এদেশে বৈষ্ণব ধর্ম্মের

নামগন্ধও ছিল না। এ থেকে এই প্রমাণ হয় যে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারের ফলেই বৈষ্ণব কাব্য রচিত হয় নি, বরং বৈষ্ণব কাব্যই মহাপ্রভুকে রাগাত্মিকাভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল—আর তার ফলেই তিনি একে একটা ধর্ম্মের ব্যঞ্জনা দিয়েছিলেন। সুতরাং দেশের প্রচলিত সাহিত্য-ধারাকে অবলম্বন করে কবিরা যা লিখে গেছেন, তাকে ধর্ম্মাত্মক বলা নিরর্থক।

অনুমান করা যেতে পারে, মুসলমান বাদশাহদের শাসনকালে দেশে পারস্য ভাষার চর্চ্চা ছিল—তা থেকে হাফিজ, রুমী, জামীর কবিতার সঙ্গে বাঙালীর পরিচয় ঘটেছিল। সেকালের টোলে দাক্ষিণাত্যের ছাত্ররা পড়তে আসতেন—তাঁদের মারফৎ তামিল বৈষ্ণব তিরুবল্লুবর, আপ্পর, পট্টিনত্তর প্রভৃতির কবিতাও দেশে আসা অসম্ভব নয়। তামিল সাহিত্য বা সুফী সাহিত্য থেকে রাগাত্মিকা ভাব আহরণ করে, ভাগবতের রাধা-কৃষ্ণ লীলায় তাকে রূপান্তরিত করার প্রেরণা বাঙালী পেয়ে থাকতে পারেন। উত্তর ভারতের সাধক কবিরা সুফী প্রভাব পেয়েছিলেন—বাঙালী তা পান নি, এমন কথা মনে করবার কোনই সঙ্গত কারণ দেখা যায় না। বরং মহাপ্রভুর গোপী-ভাবে-আরাধনার মূলে ঐ দুই সাহিত্যের যে কোনটার বা দুটোরই প্রভাব ছিল মনে করা যেতে পারে। তাকেই তিনি দেশীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিয়েছিলেন এবং দেশীয় সাহিত্যেই পেয়েছিলেন তার পরিপূর্ণ স্বীকৃতি। সুতরাং বৈষ্ণব কবিতা বৈষ্ণব-মতবাদের জনয়িতা হতে পারে, কিন্তু বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাষ্য তা নয়। মহাপ্রভুর মতো শক্তিশালী অন্য কেউ এ থেকে অন্যতর ব্যঞ্জনাও পেতে পারতেন।

প্রাক্-চৈতন্য বৈষ্ণব কবিতা থেকে কতকগুলি নিদর্শন তুলে আমরা দেখাতে চেষ্টা করবো যে চৈতন্যোত্তর কাব্যের সঙ্গে তার দৃষ্টি ও ঐতিহ্যে

আশ্চর্য্য রকম মিল রয়েছে। এটা কি করে সম্ভব হয়? রাম জন্মাবার আগে রামায়ণ জন্মাবার মতো, ধর্ম্ম জন্মলাভ করার আগে তার বিধি-বিধান জন্মগ্রহণ করে কেমন করে?

শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের রাধা বংশীধ্বনি শুনে বলছেন,

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে,
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে!
আকুশ শরীর মোর বেয়াকুল মন,
বাঁশীর শবদে মো আউলাইলো রন্ধন।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা,
দাসী হঁয়া তার পায়ে মিশিবোঁ আপনা।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরষে,
তার পায়ে বড়ায় মো কইলোঁ কোন দোষে।
অঝোরে ঝরয়ে মোর নয়নের পানি,
বাঁশীর শবদে বড়ায়ি হারাইলো পরাণী।

শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা প্রতারিত হয়ে অনুতপ্ত রাধা বলছেন,

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ
না মানিলোঁ লঘু গুরুজনে।
হেন মনে পড়িহাসে আহ্মা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো কত দুখে কহিব কাহিনী
দহ বুলী ঝাঁপ দিলো সো মোর সুখাইলো
মোঞ নারী বড় অভাগিনী।

পরবর্ত্তী কালের বৈষ্ণব-কাব্যে পূর্ব্বরাগ ও বিরহের ভাষা হয়ত আর একটু মার্জ্জিত হয়ে এসেছে, ভঙ্গী হয়ত আর একটু কবিত্বময় হয়ে

উঠেছে, কিন্তু দৃষ্টি আর বেশী অগ্রসর হয় নি—চিন্তার ধারাও একই থেকে গেছে। বরং মনে হতে পারে, কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বহুল প্রচার থাকলে কীর্ত্তনীয়াদের মুখে মুখে এই সকল পদেরও যথেষ্ট সংস্কার সাধিত হত।

বিদ্যাপতির কাব্য সুপরিচিত হলেও, এখানে দু'টা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করে রাধা বলছেন,

জনম অবধি হাম রূপ নেহারলুঁ নয়ন না তিরপিত ভেল,
সোহি মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলো শ্রুতিপথ পরশ না গেল।
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়াইলুঁ না বুঝলো কৈছন কেলি—
লাখো লাখো যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ তবু হিয়া জুড়ন না গেলি।

বর্ষারাত্রে বিরহিনী রাধা বলছেন,

এ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোর।
ঝাম্পি গরজন্তি সন্ততি পবন বরখন্তিয়া,
কান্ত পাহুন কাম দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া।
তিমির দিক ভরি ঘোর যামিনী অথির বিজুরিক পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে কৈসে গোঁয়ায়বি হরি বিনা দিনরাতিয়া!

পরবর্ত্তী কালের ভাব-সম্মিলন বা বাদর-অভিসারে এ ছাড়া আর নূতন কথা কি আছে? ঠিক এই দৃষ্টিই কবিরা অসঙ্কোচে অনুসরণ করে গেছেন। সুতরাং বৈষ্ণব কাব্য বলতে আমরা যা বুঝি, তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে চৈতন্যের বহু পূর্ব্বেই। চৈতন্যোত্তর যুগের চরিতগ্রন্থ বা সন্দর্ভগ্রন্থ অবশ্যই আধ্যাত্মিক—কিন্তু তা সাহিত্যের এলাকায় পড়ে না, সুতরাং তাদেরকে রসাত্মক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করে, মুড়ি-মিছরী এক দামে বিকানোর কোন সমর্থন আমি পাইনা। অতএব পদাবলী সাহিত্যের বিচারে, আমরা তাকে রোমান্টিক কবিতা

বলেই গ্রহণ করবো, আধ্যাত্মিক বা মিষ্টিক লেখা বলে গ্রহণ করবো না। তাতে সাহিত্য হিসাবে তাদের মর্য্যাদা কিছু মাত্র ক্ষুণ্ণ হবে না।

[২]

ঐতিহাসিক দিক থেকে যেমন দেখানো হয়েছে, বৈষ্ণব কবিতার বিশ্লেষণ থেকেও ঠিক তেমনি দেখানো যায় যে কবিরা রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী শুধু অন্তরাল হিসাবেই অবলম্বন করেছেন, আসলে তাঁরা লিখেছেন মানবীয় প্রেমেরই কবিতা। এ প্রেমকে ময়মনসিংহ গীতিকার মতো অবাধ অসঙ্কোচ সহজরূপে তাঁরা চিত্রিত করতে পারেন নি, তার কারণ দেশের ঐতিহ্যে তার স্বীকৃতি ছিল না। বাল্য বিবাহের দেশে বিবাহিতা পত্নী নিয়ে প্রেম-বিহ্বলতা প্রকাশ স্বাভাবিক নয়। আবার সমাজ-বিরুদ্ধ প্রেমকে স্বীকার করাও কঠিন। এ অবস্থায় ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে পরকীয়া প্রেমকে কাব্যে রূপান্তরিত করা ছাড়া উপায়ই ছিল না—তাই রাধার বা কৃষ্ণের জবানীতে কবিরা নিজেদের ও তাঁদের বাঞ্ছিতাদেরই হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেছেন। ধর্ম্মের আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকায় সমাজ তাঁদের গলা টিপে ধরেনি, বরং ভক্তি গদগদ কণ্ঠে আবৃত্তিই করেছে, অশ্রু বিসর্জ্জনই করেছে। কিন্তু কৃষ্ণ-লীলার আবরণটি সরালেই বৈষ্ণব কবিতার ভেতর থেকে মানুষী রক্ত-মাংসের ভাষা প্রকাশ পায় এবং সেখানেই এদের সত্যকার উৎকর্ষ।

যখন আমরা জ্ঞানদাসের কবিতায় পড়ি,

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
দেহের পরশ লাগি দেহ মোর কান্দে,
পরাণ পুতলী লাগি স্থির নাহি বান্ধে।

অথবা স্বপ্ন-সম্ভোগ বর্ণনায় যখন পড়ি,

মনের মরম কথা তোমারে কহিব হেথা
শুন শুন পরাণের সই।
পরাণ বঁধুয়াকে স্বপনে দেখিলুঁ যে
তাহা বিনু আর কারু নই।
রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন
রিমি ঝিমি শবদে বরিষে,
পালঙ্কে শুতিল রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে
নিদ যাই মনের আলিসে।
শিয়রে শিখণ্ড রোল মত্ত দাদুরী বোল
কোকিল কুহরে কুহু তালে—
ঝিঁঝি ঝিনিকি বাজে ডাহুকি সে গরজে
স্বপন দেখিলুঁ হেন কালে!

তখন আমরা সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব থেকে অনেক দূরে এসে পড়ি। নিত্যসত্ত নিরঞ্জন শ্রীকৃষ্ণ ও হ্লাদিনী শক্তিরূপিণী রাধিকার ভাবময় মিলনের বাষ্পও আমরা পাই না। আমাদের আশে-পাশের পৃথিবীই আমাদের চোখে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আমাদের নিত্যকার পারিবারিক পরিবেশের ভেতরই যে তীব্র মর্ম্মদাহ অহরহ ধিকি ধিকি জ্বলছে, এসব কবিতায় তারই ভাষা পাই। সেই ভাষা আবেগের আতিশয্যে সময় সময় শ্লীলতার সীমা পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। প্রত্যক্ষ জীবনে যে সম্ভোগ সমাজ-পীড়নের ভয়ে সম্ভব হয়ে ওঠে নি, সাহিত্যে তাকেই রূপক দিয়ে পরোক্ষভাবে চরিতার্থ করার সার্থকতা আমরা বুঝি, কিন্তু তাকে তত্ত্ব দিয়ে আড়াল করতে যাওয়া আমার কাছে হাস্যকর ঠেকে।

চণ্ডীদাসের কবিতায় যখন পড়ি—

কি মোহিনী জানো বন্ধু কি মোহিনী জানো,
অবলার প্রাণ নিতে নাহি তোমা হেন।
রাতি করিলাম দিন, দিন করিলাম রাতি
বুঝিতে নারিলাম বন্ধু তোমার পীরিতি!

অথবা যখন পড়ি—

আমি সাগরে ডুবিয়া সাধনা করিব সাধিব প্রাণের সাধা,
মরিয়া হইব শ্রীনন্দের নন্দন তোমারে করিব রাধা।
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী বাজাবো দাঁড়ায়ে কদম্ব তলে,
মুচকি হাসিয়া পরাণ হরিব যখন যাইবি জলে।
পীরিতি করিয়া ছাড়িয়া যাইব মোহিয়া গোপের বালা—
কহে চণ্ডীদাসে বুঝিবি তখন পীরিতে কেমন জ্বালা।

তখন এই অনুযোগের পেছন থেকে যাঁকে দেখতে পাই, তিনি বৃন্দাবন-বিলাসিনী বৃকভানুসুতা নন, তিনি আমাদেরই দীন পল্লীর কোন অভাগিনী কুলনারী। শতাব্দীর ধূসর মলাট ভেদ করে তাঁর ভাষা আমাদের কানে এসে পৌঁছায়। অন্তঃপুরের কঠোর অবরোধের ভেতর প্রেমদীর্ণহৃদয়ের এই যে আকুল আবেদন, এই আমাদের পক্ষে বড় সান্ত্বনার কথা।

লোচনদাসের শ্রীরাধা বলছেন,

এসো এসো বঁধু এসো আধো আঁচরে বসো
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।
অনেক দিবসে মনের মানসে তোমা ধনে মিলাইল বিধি।...
তোমার বিহনে বঁধু নয়নে না নিদ বাসি,
এলাইয়া কেশ নাহি বাঁধি।

রন্ধন-শালায় যাই, তুয়া বঁধু গুণ গাই,

ধোঁয়ার ছলনা করে কাঁদি !

এই যিনি ধোঁয়ার ছলনা করে কাঁদেন, আঙিনার মাঝে বঁধুয়া ভিজলে যাঁর পরাণ ফাটে, তাঁকে রূপক দিয়ে আবৃত করা নিষ্ফল, তাঁকে আমরা বিলক্ষণ চিনি। তাই বলছিলাম, বৈষ্ণব কাব্যকে আমরা লৌকিক প্রেম-কাব্য বলেই মনে করি।

উত্তর ভারতীয় সন্ত কবিদের বা দক্ষিণ ভারতীয় তামিল কবিদের কবিতা সম্বন্ধেও অনুরূপ আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনার দাবী করা হয়ে থাকে। এর এক মাত্র কারণ এই যে এই কবিদের অনেকেই সাধক ছিলেন এবং সেই জন্যেই তাঁদের সাহিত্যিক জীবনকে তাঁদের সাধক জীবন থেকে পৃথক করে দেখতে কেউ অভ্যস্ত নন। কিন্তু সন্ত কবিদের, তামিল কবিদের এবং সুফী কবিদের কবিতা যা অনুবাদের সাহায্যে পড়েছি, তাতে আমার ধারণা হয়েছে যে এদের কতক কতক অংশ পরমার্থ তত্ত্বমূলক হলেও, আসলে এরা লৌকিক রসেরই কবিতা। গালের কালো তিলটির জন্যে সমরকন্দ ওবোখারা পর্য্যন্ত দিয়ে দেবার আকুলতায় হাফিজ যা বলেছেন, তাকে নৈর্ব্যক্তিক ব্রাহ্মী অনুভূতি ভাবতে পারি না। এ রক্তমাংসের মানুষের সাদা চোখের অনুভূতি ও সহজ বুদ্ধির দাবী। মীরার ভজনেও এই ব্যক্তিগত সুরই প্রবল, কবীরেও এর ছোঁয়া আছে। এই পর্য্যন্তই এরা কবিতা। এর বাইরে রুমি, জামী, দাদু বা রাজ্জবের তত্ত্বমূলক পদকে খাঁটি জাতের কবিতা বলেই স্বীকার করা কঠিন। তা তত্ত্ব-সাহিত্যের অন্তর্গত, রস-রাজ্যে তারা অপাংক্তেয়।

এখানে বলা আবশ্যক যে মিষ্টিসিজমকে কাব্যের অঙ্গীভূত করতে আমাদের ঘোরতর আপত্তি আছে। যে কোন ভাবেই হক, মিষ্টিক

অনুভূতি মানুষের সহজ অবস্থার ব্যাপার নয়—ও একটা আকস্মিক আবিষ্ট অবস্থা, একটা অতি-প্রাকৃত মনোধর্ম্মের অবস্থা। এর স্থিতিকালে মানুষের জৈব চেতনা তার প্রত্যক্ষ সত্তা থেকে বিশ্লিষ্ট হয় বলেই, পরে এই অনুভূতির ভাব-স্মৃতি থাকে না। উইলিয়ম জেমস্ সেই জন্যেই এই অবস্থার বিশ্লেষণে বিমুখ হয়েছেন। কিন্তু বিমুখ হওয়া মানেই এড়িয়ে যাওয়া, তার চেয়ে মনস্তত্ত্ব অনুসারে দেখলে, ওটাকে মানুষের একটা বৈকল্যের অবস্থা বলেই মনে হয়। সে হিসেবে এর প্রসার মনোবৃত্তির সক্রিয় অবস্থার বাইরে এসে পড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই তা কাব্য-সৃষ্টির জগৎ থেকেও দূরবর্ত্তী হয়ে পড়ে। কাব্য জন্মায় প্রচ্ছন্ন বাসনা থেকে, মিষ্টিক অনুভূতি বাসনা-লোকের বাইরে—কারণ সেখানে মননশক্তিই নিরস্ত। ঠিক এই কারণেই বৈষ্ণব কবিতার পেছনে অবদমিত লৌকিক বাসনা আছে স্বীকার করি, আধ্যাত্মিক অনুভূতি স্বীকার করি না—কোন কবিতার ক্ষেত্রেই তা স্বীকার্য্য নয়।

বৈষ্ণব কাব্যের অপরাপর পর্য্যায় নিয়ে আমরা উপস্থিত কোন আলোচনা করতে পারছি না। প্রেমকাব্যের পরই বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য কাব্যের স্থান—বাঙালী মায়ের হৃদয়-মাধুর্য্যে অভিষিক্ত সেই সরস কমনীয় কবিতার বিষয় আমরা উমা-সঙ্গীতের প্রসঙ্গে উল্লেখ করবো। তবে এইটুকু বলে রাখা দরকার যে সেখানেও কৃষ্ণ-যশোদার সম্বন্ধ লৌকিক মা ও ছেলের সম্বন্ধের উর্দ্ধে ওঠেনি, যদিও তার ফলেই সেই সব রচনা সাহিত্য হিসেবে উপাদেয় হয়েছে।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য রাধা-কৃষ্ণ প্রসঙ্গকে একটা দার্শনিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে, তাঁর ধর্ম্ম-মত প্রচার করেছিলেন। কাজেই তা স্বভাবতঃই রূপকের আড়ালে পড়েছিল, মূলে কবিদের উদ্দেশ্য তা ছিল কি না সন্দেহ! এই রূপকের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে সমস্ত সন্দর্ভ,

কথিকা, চরিত ইত্যাদি রচিত হয়েছিল, তাদের প্রজ্ঞাত্মক মূল্য যাই হক, সাহিত্যাংশে তারা অপকৃষ্ট। মহাপ্রভুকে রাধা ও কৃষ্ণের মূর্ত্ত প্রতীক রূপে দাঁড় করিয়ে, তাঁর বন্দনা ও লীলামূলক যে সব পদ রচিত হয়েছিল (গৌর চন্দ্রিকা), রচনা হিসেবে তাও এমন কিছু নয়। কাজেই এই পর্য্যায়ের রচনা নিয়েও আমরা কোন আলোচনা করলাম না।

মোটের ওপর আমরা যে বৈষ্ণব কবিতাকে রোমান্টিক প্রেমকাব্য রূপে দেখি, এ কথা আগেই বলেছি এবং এই দৃষ্টিতে দেখলেই কাব্য হিসেবে তাদের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। অবশ্য বৈষ্ণব কাব্যে প্রচুর অনুকৃতি আছে, একই বিষয়, একই ভঙ্গী, একই দৃষ্টি, এমন কি একই শব্দ-পর্য্যায় নানা কবির রচনায় পাওয়া যায় —সময় সময় বেশীর ভাগ কবির বৈশিষ্ট্যই তাই প্রচলিত কবি-প্রসিদ্ধির অনুসরণ বলে মনে হয়। তবু বৈষ্ণব প্রেমকাব্যে বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস এই চার জন কবির নিজস্বতা আমরা স্বীকার করি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গ্রাম্য ছড়া

[ময়মনসিংহ গীতিকাগুলি বাঙালী বিদগ্ধ-সমাজের বাইরে নিরক্ষর গ্রামবাসীদের হাত দিয়ে সৃষ্ট হয়েছিল বলে দাবী করা হয়েছে। বাংলা ছড়ার যে সুবিস্তৃত পর্য্যায়টি আজো অলিখিত এবং অসংগৃহীত অবস্থায় পল্লী-মহিলাদের মুখে মুখে বেঁচে আছে, তারও জন্ম নিরক্ষর সমাজেই। এদের প্রাচীনতা ও প্রামাণিকতা নিয়ে অবশ্য কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এদের ভাষার ঔজ্জ্বল্য, দৃষ্টির তীক্ষ্ণতা এবং রসের পারিপাট্য এমনই সত্যি জাতের যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এদের স্থান খুব উঁচুতেই নির্দেশ করতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কোন সাহিত্যিকেরই মনোযোগ এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ছেলে ভুলানো ছড়াগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্লেষণ করে যে প্রবন্ধ লেখেন, তার জোরেই এরা অল্প শিক্ষিতসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। কিন্তু এ ছাড়াও অন্য জাতের ছড়া আছে প্রচুর—মেয়েলি বার-ব্রতের ছড়া, কৃষিকার্য্য, পারিবারিক কর্ত্তব্য, খাদ্য, পরিধেয়, মানব-প্রকৃতির বিচিত্রতা, নানা বিষয় নিয়ে তৈরী রাশি রাশি ছড়াই বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে আছে! সেগুলির ভেতর দিয়ে যেমন সমাজ জীবনের বহু অনাবিষ্কৃত দিকের সঙ্গে পরিচয় হয়, তেমনি বহু সুসম্বদ্ধ ও নিত্য ব্যবহার্য্য phrase, idiom ও epigram-এর সঙ্গেও মুখোমুখি হওয়া যায়। আর প্রয়াসহীন পাণ্ডিত্যহীন সহজ কবিত্বের সাক্ষাৎও পাওয়া যায় প্রচুর। বাংলা শব্দতত্ত্ব ও ছন্দ-বিজ্ঞানের ইতিহাসেরও অনেকগুলো দিকের ওপর ছড়া সাহিত্য নূতন আলোকপাত করে। কিন্তু এগুলো সংগৃহীত ও সম্পাদিত কবে হবে এবং কে করবেন, সেই হল সমস্যা।]

বাংলার Orthodox সাহিত্য-শাখার পাশাপাশি আর একটা অলিখিত শাখা দিনে দিনে গড়ে উঠেছিল—তা হচ্ছে বাংলার শুদ্ধান্তঃপুরে জাত ছড়া ও রূপকথার শাখা। তখনকার শিশুদের মনোরঞ্জনের ফরমায়েসে তার জন্ম। এখনকার শিশুদের কারা কি দিয়ে মনোরঞ্জন করেন জানি না, সেদিনকার এই ক্ষুদ্র জীবদের মনস্তুষ্টির

জন্যে মহিলা জাতির কিন্তু বিশেষ কোন পুঁজিই ছিল না। সেই স্বল্প পুঁজির সংসারে তাই তাঁদের কাহিনী, রূপকথা, হেঁয়ালী ও ছড়ার ফাঁদ পাততে হত। দক্ষিণা বাবুর 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে এই সব রূপকথা ও ছড়া কিছু কিছু স্থান পেয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগই স্থান পেয়েছে মহাকালের বিরাট ঝুলিতে। টুকরো টাকরা যা আজো আছে, অনতিকাল পরে তারও হদিশ পাওয়া যাবে না। কারণ এখনকার হাইহিল ও ভ্যানিটি ব্যাগ শাসিত অন্তঃপুরে এই প্রগাঢ় গ্রাম্যতার স্থান হওয়া কঠিন! এ ছাড়া, যে সমস্ত বার-ব্রত, বিধি-বিধান, পূজা-পার্ব্বণ, প্রাকৃতিক দুর্য্যোগ ইত্যাদির ছড়া আপনা থেকে মুখে মুখে জন্মেছিল, মেয়েদের আশ্রয়চ্যুত হয়ে, তাও আজ লোপ পেতে বসেছে।

এই সব ছড়া কবে কাদের দ্বারা লেখা, তার নির্দ্দেশ কস্মিনকালেও হবে না—মুখে মুখে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে, হাত-ফিরি হতে হতে এগুলি জাতির সাধারণ সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। এদের অর্থ নিয়ে বিবাদ করে লাভ নেই, কারণ এদের সামর্থ্য কোন প্রমাণেরই অপেক্ষা রাখেনি। অথচ শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ায় এবং প্রবহমান সাহিত্য ধারায় এদের স্বীকৃতি না হওয়ায়, এমন একটি সত্যি জাতের সাহিত্য বাংলা থেকে আজ অপ্রত্যাশিতভাবেই মারা যেতে বসেছে। ইংরেজী Nursery Rhymeএর সাহিত্যে কদর আছে। আধুনিক কবি অডেন তাঁর Poet's Tongue নামক কাব্য-সঙ্কলনে পর্য্যন্ত অনেকগুলি Nursery Rhyme উদ্ধৃত করেছেন। বাংলায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ভিন্ন অন্য কোন সাহিত্যসেবীই এদিকে দৃষ্টি-নিক্ষেপের অবকাশ পাননি। সাহিত্য সংসারে এরা রয়ে গেছে উপেক্ষিত অন্ত্যজের মতো।

এই সমস্ত ছেলে-ভুলানো ছড়া, বার-ব্রতের ছড়া, রূপকথা, সারী,

জারী, ভাটিয়াল ও মুর্শিদা গান প্রভৃতি একত্র পুস্তকাকারে সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। তা থেকে একটি সহজ স্বচ্ছন্দ কল্পনাকুশল লোক-সাহিত্য ধারার সঙ্গে যেমন পরিচয় হবে, তেমনি তাদের এলোমেলো ইঙ্গিত ও ভাঙা-চোরা ভাষার ভেতর দিয়ে তৎকালীন সমাজের বিচিত্র চিত্রও পাওয়া যাবে, ইতিহাস হিসাবে যার মূল্য কম নয়।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এই সাহিত্য-শাখাও বাংলার সনাতন সাহিত্য ধারা থেকে সর্ব্বৈব মুক্ত। এতে এমন একটি সুস্থ কল্পনার লীলা ও স্বচ্ছ হৃদয়াবেগের প্রকাশ দেখা যায়, যা অন্যত্র সুলভ নয়। ভাষার দিক থেকেই হক, আর ভঙ্গীর দিক থেকেই হক, এই সাহিত্যে ধার করা জিনিষের বালাই নেই বললেই চলে। 'রাঙা মুখে রোদ লেগেছে, ডালিম ফেটে পড়ে,' 'কুঁচ বরণ রাজকন্যার মেঘের বরণ চুল,' 'তারা গাই-বলদে চষে, তারা হীরেয় দাঁত ঘষে'—এই রকম রাশি রাশি উজ্জ্বল পংক্তি এই ছড়াগুলোর মধ্যে অতি অনায়াসেই মণিমুক্তার মতো ছড়াছড়ি হয়ে রয়েছে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে এ জিনিষের সাক্ষাৎ একমাত্র ময়মনসিংহ গীতিকায় মেলে। শোনা যায়, ময়ময়নসিংহ গীতিকাও orthodox সাহিত্য সমাজের বাইরে অশিক্ষিত জন-সাধারণের হাতেই জন্মেছে। এ থেকে কি এই মনে করা চলবে যে, উপ-ধর্ম্ম ও লোকাচারের বেড়াজালে আটক পড়েই বাংলার বিদ্বৎজনের সাহিত্য এমন আড়ষ্ট ও অস্বচ্ছ আকার ধরেছে? যেখানেই এই আঁটুনি একটু শিথিল হয়েছে, সেখানেই সহজ উল্লাসে রস-সাহিত্য উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে! হয়ত তাই বাংলার সীমান্তবর্ত্তী স্থানসমূহের উপজাতীয় লোকদের যে সাহিত্য-নিদর্শন পাওয়া গেছে, যেমন সাঁওতালী ছড়া বা কোচ গ্রাম্য ছড়া, তাও এই কথারই সমর্থন করে। সেদিক থেকে এই সমস্ত ছড়া-সাহিত্যের একটা তুলনামূলক আলোচনা

হওয়া দরকার। বাউল-সঙ্গীত সম্বন্ধে ইদানীং শিক্ষিত সমাজে আগ্রহ দেখা দিয়েছে—মধ্যযুগীয় মিষ্টিক সাধকদের রচনার সঙ্গে সংযুক্ত করে, তাকে একটা বিশিষ্ট ভাবধারার পরিণতি বলে ব্যাখ্যা করাও হচ্ছে। ডক্টরেট লাভেচ্ছু কোন তরুণ রসগ্রাহী হয়ত একদিন এই ছড়া-সাহিত্যেরও একটা হিল্লে করে দেবেন।

এই ছড়াগুলির ভেতর তৎকালীন সমাজ-জীবনের বহু আশা-আনন্দ, কামনা-কল্পনা, খেয়াল-খুসী প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আবার বহু দুঃখ-দুর্দ্দশা, গ্লানি-অপমান, ব্যাধি-বিশৃঙ্খলতাও ছড়াকারদের দৃষ্টি এড়ায়নি। সেদিন চলে গেছে, তাদের ছাপও মুছে গেছে জাতির স্মৃতি থেকে—এই ছড়ার অরণ্য পরিভ্রমণ করলে, আমরা সেই হারাণো দিনের মধ্যে আবার গিয়ে দাঁড়াতে পারি। আজকের এই আধুনিকতা-পীড়িত সাহিত্য-বিপ্লবের দিনে সেটা অবশ্যই কম আশ্বাসের বিষয় নয়।

এই ছড়াগুলির ভাষায় বাংলা Idiomএর ব্যবহার যেমন প্রচুর এবং প্রকৃষ্ট, তেমন আর কোথাও নয়। খাস বাংলা ভাষার প্রাণ-শক্তি অনেকটুকুই নির্ভর করে এই Idiom-এর ওপর, যা বহু আধুনিক লেখকের আয়ত্তের বাইরে বলে, এখনকার অধিকাংশ বাংলা বইয়ের ভাষার সঙ্গেই বাঙালী পাঠকের নাড়ীর যোগ ছিন্ন হয়েছে। পয়ার-ত্রিপদী-প্লাবিত বাংলা ছন্দের ইতিহাসে ছড়ার চটুল ছন্দও কম নূতনত্ব আনেনি—পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এই সুরটা ধরেই বাংলা ছন্দকে তার আদিম আড়ষ্টতা থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এদিক থেকেও ছড়াগুলো নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। তাই আধুনিক সাহিত্য সমালোচকদের আমি ডাকছি এই ছড়ার রাজ্যে। কিছু প্রলোভনওআছে—

আম কাঁঠালের বাগান দোব ছায়ায় ছায়ায় যেতে,
উড়কি ধানের মুড়কি দোব পথে জলপান খেতে!

সপ্তম অধ্যায়

লৌকিক গীত-সাহিত্য

[মঙ্গলকাব্য ও বৈষ্ণব কাব্যের যুগ শেষ হতে, বাংলায় নূতন করে আর একটি যুগ সুরু হয়। একে বলা যাবে গানের যুগ। এক হিসাবে বাংলার সমস্ত প্রাচীন সাহিত্যটাই গানে সীমাবদ্ধ—বৈষ্ণব পদাবলী ত বটেই, রামায়ণ, মহাভারত এবং মঙ্গলকাব্যগুলিও আসরে গাওয়া হত। সেদিক থেকে এই আন্দোলনে নূতনত্ব কিছু নেই, কিন্তু এই আন্দোলনে নূতনত্ব আছে অন্য দিক থেকে। এখান থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিষয়বৈচিত্র্যের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। শ্যামা সঙ্গীত, উমা সঙ্গীত, বাউল সঙ্গীত, লৌকিক প্রেমসঙ্গীত, নানা নূতন নূতন পথে পরীক্ষা সুরু হল, যা কৃষ্ণচন্দ্র যুগ থেকে একেবারে ঈশ্বর গুপ্তের আমল পর্য্যন্ত অব্যাহত ধারায় বয়ে এসেছে। মঙ্গলকাব্যগুলির ভেতর চণ্ডী, মনসা, শীতলা, মাতৃত্বের অপরাপর পর্ব্বগুলি রূপ পেয়েছে, কিন্তু কালিকার আংশিক সাক্ষাৎ এক বিদ্যাসুন্দর ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। রামপ্রসাদেই প্রথম কালীর আবির্ভাব এবং সে একেবারে দৈব-মহিমা-বর্জ্জিত বাঙ্গালী মায়ের রূপে। দাশরথি ও কমলাকান্ত এ বিষয়ে করেছেন তাঁর অনুগমন। বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য সঙ্গীত আগেই রচিত হয়েছিল, শাক্ত বাৎসল্য সঙ্গীত রচিত হল এই সময়। এরও সূচনা রামপ্রসাদে, কিন্তু দাশুরায় ও ব্রজরায় ইত্যাদির হাতেই এই শাখার পূর্ণতা হল। শাক্ত অভ্যুদয়ে বৈষ্ণব গীতি সাময়িকভাবে চাপা পড়লেও, কৃষ্ণ কমল, হরু ঠাকুর, বদন অধিকারী, নীলকণ্ঠ ইত্যাদির হাত দিয়ে তাও আবার নূতন করে মাথা তুললো। এছাড়া এলো লৌকিক প্রেম সঙ্গীত—উর্দ্দু টপ্পা থেকে নিধু বাবু তা বাংলায় আমদানী করলেন, শ্রীধর কথক, কালী মির্জ্জা, রাম বসু এ বিষয়ে হলেন তাঁর সহকারী। বাউল গানের জন্মও ঠিক এই সময়ই কিনা বলা কঠিন। কারণ বৌদ্ধ প্রভাবের যুগ থেকেই একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল, যা বাউল নামে খ্যাত। সুতরাং তাদের সাহিত্যিক ঐতিহ্য পুরাণো হবারই কথা। কিন্তু ছাপার অক্ষরে যে বাউল গান আমরা পাই, তা খুব অর্ব্বাচীন—এমন কি যে সময়ের কথা বলছি, তারও পরবর্ত্তী হওয়া সম্ভব।]

[১]

শ্যামা-সঙ্গীত

প্রায় তিনশ বৎসর বৈষ্ণবীয় প্রেম-সঙ্গীতের একাধিপত্য চলার পর বাংলা সাহিত্যে শ্যামা-সঙ্গীত দেখা দিল। বৈষ্ণব-সাহিত্যের শেষাশেষি রাধা-কৃষ্ণ লীলার চেয়ে গৌরাঙ্গ-লীলাই সমধিক প্রাধান্য নিয়েছিল—মহাপ্রভুকে শ্রীরাধার অবতার রূপে কল্পনা করে, তাঁর প্রেম, বিরহ ও সাত্ত্বিক ভাবাদির বর্ণনাই ক্রমে কবিদের অবলম্বন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। রাধামোহন ঠাকুর, বাসুদেব ঘোষ, উদ্ধব দাস, জগদানন্দ প্রমুখ কবিরা এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। এঁদের রচিত পদাবলীকে মোটা কথায় গৌরচন্দ্রিকা আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে। ক্রমে গৌরাঙ্গ-লীলাও পুরাণো হয়ে এলো। তখন মাতৃ-সঙ্গীতের প্রাদুর্ভাব ঘটলো।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি এদেশের প্রাচীনতম ধর্ম্মবিধি হলেও, সাহিত্যে তার স্বীকৃতি কৃষ্ণচন্দ্র যুগের আগে হয় নি। ঘরে ঘরে কালীপূজার ধূম ছিল—শ্মশান কালী, রক্ষা কালী, ডাকাতে কালী পর্য্যন্ত বাঙালীর কাছে পূজা পেয়েছেন। ধূপধুনো, ঢাকের বাদ্য ও পাঁঠার রক্তে নিত্য তাঁর অসামান্য মহিমা ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু দেশের সাহিত্যে তাঁর স্থান হয় নি। সব দেবতার নামে মঙ্গল আছে, (মুসলমান দেবতাও বাদ পড়েন নি), কিন্তু কালীর ভাগ্যে কোন মঙ্গল লাভ হয় নি। মাতৃমূর্ত্তির মধ্যে চণ্ডী নানাস্থানে নানারূপে আবির্ভূতা হয়েছেন—কিন্তু কালী রূপে তাঁর অবতরণ বিদ্যাসুন্দরের আগে দেখা যায় নি। এর একটা কারণ হয়ত বৈষ্ণব মতের অতিপ্রচার—কিন্তু আসল কারণটা অজ্ঞাত।

খাঁটি শ্যামা সাহিত্যের প্রবর্ত্তন করলেন রামপ্রসাদ এবং তাঁর হাতেই এর সর্ব্বাঙ্গীন পূর্ণতা সাধিত হল। লিরিক কাব্য হিসেবে

বিচার করতে বসলে, রামপ্রসাদকে আজ সহ্য করা কঠিন—তাঁর ভাষা যেমন সৌষ্ঠববিহীন, বক্তব্য তেমনি অলঙ্করণ বর্জ্জিত—ন্যাড়া এবং অনেক স্থলে নিছক গদ্য। তবু যে কারণে রামপ্রসাদের দাবী অনস্বীকার্য্য, তা হচ্ছে তাঁর ঐকান্তিকতা। তাঁর রচনা একান্তভাবেই তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতি সঞ্জাত—বানিয়ে বানিয়ে ছেঁদো কথায় দেবতার মহিমা বর্ণনা তিনি করেন নি, অকারণ কুণ্ঠায় নিজকে কোণঠাসা করে রূপকের আশ্রয় নেন নি, নিজের বক্তব্য অন্যের জবানীতে বসিয়ে ধোঁকা দেবার চেষ্টা তাঁতে কোথাও দেখা যায় না। এই একান্ত ব্যক্তিগত সুরের আবেদন কদাচিৎ নরোত্তম বা এমনি কয়েকজন বৈষ্ণব মহাজনের লেখায় পাওয়া যায়, কিন্তু এ বিষয়ে রামপ্রসাদই শ্রেষ্ঠ। তাঁর লেখা পড়ে আমরা আর যাই ভাবি, তাঁর আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে কোন প্রশ্নই ওঠে না—তিনি যে সত্যিকার দরদী ছিলেন, এটা বেশ বুঝি।

মা মা বলে আর ডাকবো না,
ওমা দিয়াছ দিতেছ কতই যন্ত্রণা।
ছিলাম গৃহবাসী, করিলি সন্ন্যাসী,
আর কি ক্ষমতা রাখিস এলোকেশী,
ঘরে ঘরে যাবো ভিক্ষা মেগে খাবো
মা বলে আর কোলে যাবো না।

এ কথার ভেতর কোথাও উচ্চাঙ্গের কবিত্ব নেই, কিন্তু কত সহজেই কথা ক'টি মনকে অধিকার করে বসে! এ অভিমানের ভেতর কোথাও মেকি কিছু নেই। তেমনি আত্মনির্ভরতাও দেখা যায়—

আমি কি দুখেরে ডরাই,
তবে দাও দুখ মা আর কত চাই।

বিষের কৃমি বিষে থাকি মা—
বিষ খেয়ে প্রাণ রাখি সদাই,
আমি এমন বিষের কৃমি মাগো
বিষের বোঝা বয়ে বেড়াই।

প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী
বোঝা নামাও ক্ষণেক জিরাই,
দেখো সুখ পেয়ে লোক গর্ব্ব করে,
আমি করি দুখের বড়াই।

এই কখনো অভিমান, কখনো হতাশা, কখনো উল্লাস, কখনো অনুনয়···এ উপাস্য ও উপাসকের কৃত্রিম সম্বন্ধ-বিনিময় নয়, এ অন্তরঙ্গের সঙ্গে আন্তরিক বোঝা-পড়া। ভাবতেই ভরসা হয় না এই আকুলতা শূন্যাশ্রয়ী! সত্যকে মুঠোর ভেতর নিত্যকালের জন্যে না পেলে, মানুষ কখনো এত সহজে নিজেকে তার মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে না। তা না হলে মানুষ ভেবে চিন্তে আক্ষরিক স্তব, বা অষ্টক, বা বন্দনা লেখে! বাংলা সাহিত্যে তার পরিমাণ বড় কম নয়।

রামপ্রসাদের এই ধারা কমলাকান্তে এবং দাশরথিতেও কতক পরিমাণে বয়ে এসেছে। কমলাকান্তের রচনায় ঐকান্তিকতার অভাব এবং তত্ত্বের আধিপত্য, সেই জন্যে আমি তাঁর বিরোধী। মাঝে মাঝে যখন তাঁর পাণ্ডিত্যের নকল আবরণটি খসে পড়ে, তখন তাঁর লেখনী রামপ্রসাদের সহজ বেগ অর্জ্জন করে—

মজলো আমার মন-ভ্রমরা কালী-পদ-নীল কমলে।
বিষয়-মধু তুচ্ছ হল, কামাদি রিপু সকলে।

অনুপ্রাস ব্যাধিগ্রস্ত দাশুরায়ও কদাচিৎ এই স্তরে পৌঁছেছেন—

দোষ কারো গো নয় মা,
আমি স্ব-খাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

শ্যামা-সঙ্গীতের এই সকরুণ সুরটি কিন্তু এইখানেই শেষ হয়ে গেল—পরবর্ত্তী কালে আর তা শোনা যায় নি।

[২]

উমা-সঙ্গীত

শ্যামা-সঙ্গীতের পাশাপাশি আর একটি শাখা সাহিত্যকে আস্তে আস্তে অধিকার করেছিল, তা হচ্ছে উমা-সঙ্গীত। উমা-সঙ্গীত ও বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য সঙ্গীত প্রাচীন বাঙালীর একান্ত আদরের সামগ্রী—দেশের ঘরে ঘরে এদের প্রচার, লোকের মুখে মুখে এদের প্রতিষ্ঠা। এত করুণ, মধুর ও মর্ম্মান্তিক রচনা বাংলা সাহিত্যে সত্যিই দুর্লভ। জাতির প্রাণের গভীরতম স্তর থেকে এরা উৎসারিত এবং সকলের সম্মিলিত অশ্রুধারায় এরা অভিষিক্ত। এদের তুলনায় বৈষ্ণবদের প্রেম-সঙ্গীত এবং রামপ্রসাদের ভক্তি-সঙ্গীতকেও রীতিমতো নিষ্প্রভ মনে হয়। প্রেম-সঙ্গীতে কান্তা ভাব এবং ভক্তি-সঙ্গীতে মাতৃ ভাব—উভয় ভাবই নিবিড় এবং নৈকট্য দুয়েই খুব ব্যাপক—কিন্তু বাৎসল্য সঙ্গীতের সন্তান ভাবে এই নৈকট্য আরো গভীর। সহজ অধিকারেই হৃদয় সেখানে বাহু বিস্তার করে দিয়েছে। এই অধিকার যেখানে আহত হয়েছে, সেখানে অভিমান জাগে নি, অভিশাপ স্ফূর্ত্ত হয় নি, ফুটেছে বুকফাটা আকূতি। বৈষ্ণবীয় বাৎসল্য কবিতার চেয়ে উমা-সঙ্গীতকে যেন আমার এ হিসেবে নিবিড়তরই মনে হয়।

বৈষ্ণব কবিতায় যশোদার আদরের ধন গোপাল বনে যেতো গরু চরাতে—বনে নানা বিপদের ভয়, কচি ছেলে গোপাল—তার ওপর দুরন্ত—কাজেই মায়ের প্রাণ নানা আশঙ্কায় ব্যাকুল। সারা

দিনের অদর্শনে ব্যাকুলা হয়ে তাই তিনি ঘর-বার করেন, যতক্ষণ না গোপাল বাড়ী ফেরে। এই ক্ষণিক অদর্শন ও আশঙ্কার পটভূমিতে এই কবিতাগুলির জন্ম—কাজেই এই বেদনার গতি বহুদূর বিস্তৃত হতে পারেনি—যদিও যতদূর গেছে, তাও কম কারুণ্য-ব্যঞ্জক হয়নি।

গো-চারণে যাবার আগে যশোদা গোপালকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন—

মায়ের শপতি লাগে না ধাইও ধেনুর আগে
পরাণের প্রাণ নীলমণি
নিকটে রাখিও ধেনু বাজাইও মোহন বেণু
ঘরে বসে আমি যেন শুনি।

তৃষা হলে চেও বারি বলাই ধরিবে ঝারি
নামিও না যেন যমুনায়।

স্নেহান্ধ মাতৃ-হৃদয়ের সকরুণ আশঙ্কা এর চেয়ে সুন্দরভাবে আর প্রকাশ করা যেতো কিনা সন্দেহ!

কদাচিৎ গোপালের দৌরাত্ম্যে বিব্রত জননীর স্নেহমিশ্রিত অনুযোগ প্রকাশ পেয়েছে—তাও কম উপভোগ্য নয়!

মরি বাছা ছাড়ো রে বসন,
কলসী উলাইয়া তোমায় লইব এখন।
আমি রইলাম তোমায় লইয়া,
যায় যে ঘরে উনান বইয়া,
মোর হইবে কিসের উপায়,
কলসী লইয়া কাঁখে, ছাড়ো রে অভাগী মাকে,
হেরো দেখো ধবলী পিয়ায়।

এখানে জননীর যে রূপ, তা কৃষ্ণ-জননী যশোদার রূপ নয়। সন্তানের যে রূপ, তাও গোলক-বিহারী হরির নয়। এ রূপ বাংলা মায়ের, বাঙালী ছেলের। যে হতভাগিনী পল্লীজননী দূর গ্রামে কোলের ছেলেটিকে পড়তে পাঠিয়ে, সারাদিন তার পথ চেয়ে বসে থাকেন, আর নানা অমূলক সমূলক চিন্তায় আকুল হয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন—এ তাঁরই অন্তরের রূপ। যে পল্লীগৃহিণী বিপুল কর্ম্মভার-বিক্ষিপ্ত সংসারে কোলে দামাল ছেলে নিয়ে বিব্রত হন, এ তাঁরই রূপ। জীবন-সম্বন্ধে এতটা নিবিড় এবং সহজ বলেই এগুলো এত জনপ্রিয় হতে পেরেছে। উমা-সঙ্গীতের আবেদনটা আরো গূঢ়, কারণ তার অন্তর্লগ্ন বেদনাটা আরো প্রত্যক্ষ। ধনী পিতামাতার সযত্ন লালিতা একমাত্র কন্যা গৌরী বৃদ্ধ বর শিবের হাতে পড়েছেন—দরিদ্র, তাতে অসংযত স্বভাব—অভাবের সংসারে অনেকগুলি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে গৌরীর তাই দুঃখের শেষ নেই—মা মেনকা মেয়ের এই শোচনীয় দশান্তরে ব্যথিতা—দিবারাত্রি কাঁদেন, কখনো পাষাণ স্বামীকে এহেন পাত্রে কন্যা সমর্পণ করার জন্যে দোষারোপ করেন, কখনো মেয়ের ওপর অভিমান করেন—কখনো বা স্বপ্নে তাঁর যোগিনী রূপ দেখে চমকে ওঠেন—স্বামীকে অনুরোধ করেন, কয়েকদিনের জন্যে মেয়েকে এনে দেবার জন্যে। মায়ের এই আশঙ্কা, বেদনা ও আকুলতার কান্না এদেশে আগমনী গান নামে দীর্ঘকাল থেকে আদৃত হয়ে আসছে—পার্ব্বতী আসেন, তিন দিন মাত্র থেকে আবার চলে যান, আবার সুরু হয় মায়ের কান্না—তার নাম এদেশে বিজয়া সঙ্গীত।

এই আগমনী ও বিজয়া সঙ্গীত যথাক্রমে দুর্গোৎসবের আগে ও পরে এখনো ভিক্ষুকদের মুখে শোনা যায়। ভদ্রসমাজে ওদের চলন প্রায় বন্ধ। কিন্তু সত্যিকার এমন একটা কারুণ্য পাওয়া যায় এই গানগুলির

মধ্যে, যে এরা উপেক্ষিত ভাবতেও কষ্ট হয়। কৌলীন্য প্রথায় দেশের কত পার্ব্বতীই এমনি ধারা অপাত্রে ন্যস্ত হয়ে অভাগিনী মায়ের কান্নার কারণ হয়েছে—কত অলক্ষ্য অন্তঃপুরের অশ্রুধারা-পুঞ্জিত এই হাহাকার সঙ্গীত—এর দৈবী রূপকটা সরিয়ে ফেললে, এক নিমিষেই তা চোখে পড়ে যায়। অল্প আঘাতেই যে বাঙালী যশোদার মূর্ত্তিতে আনাচে-কানাচে কেঁদে বেড়িয়েছে, এত বড় ব্যথায় বুক তার কতটাই না ভেঙেছে! সে ভাঙার ভাষা আছে এই গানগুলিতে। উমা-সঙ্গীত রামপ্রসাদ দিয়ে সুরু হলেও, এ বিষয়ে দাশু রায়েরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধারণতঃ লোকের মুখে মুখে যে গানগুলি ফেরে তা সবই দাশুর রচনা। দাশুর অন্য কোন লেখাই ভদ্রলোকের পাতে দেবার মতো নয়—কিন্তু আগমনী বিজয়ার গানে দাশু রাজা।

রামপ্রসাদই অবশ্য প্রথম ধুয়াটা ধরিয়ে দিয়েছিলেন—

এবার আমার উমা এলে আর তারে পাঠাবো না,
বলে মন্দ বলবে লোকে কারুর কথা শুনবো না।
কতই লোকে প্রচার করে, জামাই নাকি ভিক্ষে করে,
এবার মায়ে ঝিয়ে করবো ঝগড়া জামাই বলে মানবো না।

দাশু এরই ওপর সুরের পর সুর চড়িয়েছেন—মা মেনকার বিরহ-ব্যথার বিভিন্ন স্তরই তাঁর গানে অনবদ্য রূপ পেয়েছে। ছেলেবেলায় শুনেছি, আজো তার কতক কতক অংশ কানে জেগে রয়েছে।

গিরিরাজ কি করো গৃহে বসিয়ে,
সম্বৎসর গত হল উমারে আনো গিয়ে।

কিংবা—

গিরি গৌরী আমার এসেছিল,
স্বপ্নে দেখা দিয়ে চৈতন্য রূপিনী
অচৈতন্য করে কোথায় লুকালো।

কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল হলাম হে অচল,
চঞ্চলার মতো জীবন চঞ্চল
অঞ্চলের নিধি পেয়ে হারালো।
দেখা দিয়ে কেন হেন মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া নেই মহামায়ার,
আবার ভাবি গিরি কি দোষ অভয়ার,
পিতৃ-দোষে মেয়ে পাষাণী হ'ল!

হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে মেয়েদের জন্যে মায়েদের এই কান্না জীবনে অনেক শুনেছি—যখনই শুনেছি, তখই এই সব গান মনে এসেছে—জেনে হক না জেনে হক, কবিরা জাতির মর্ম্মের সেই নিবিড় জায়গাতেই ঘা দিয়েছেন এই গানগুলিতে। মনে করা কিছুই কঠিন নয় যে তাঁদের ব্যক্তিগত জীবনেও এই ঘায়ের অভাব ছিল না, তা থেকেই এই শোক-সঙ্গীতগুলি উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

কমলাকান্ত, রসিক রায়, ব্রজ রায় ইত্যাদিরও অনেক উল্লেখযোগ্য গান আছে এই পর্য্যায়ে। কৌতূহলী পাঠক 'বাঙালীর গানে' তাদের সাক্ষাৎ পাবেন। তবে একটা কথা সত্যের অনুরোধে স্বীকার করতেই হবে যে মঙ্গল কাব্যেই হক, আর বৈষ্ণব কাব্যেই হক, আর শ্যামা-সঙ্গীত উমা-সঙ্গীতেই হক, বাংলা সাহিত্যের মৌলিক পুঁজি বেশী নয়—সেই স্বল্প মূলধন একজনের হাত থেকে পাঁচ জনের হাতে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়—তার বিস্তার, বৃদ্ধি বা উন্নতি নেই—শেষকালে তার লয়প্রাপ্তি ঘটে। সর্ব্বত্রই যেমন এক্ষেত্রেও তেমনি একই বিষয়, একই প্রতিপাদ্য, একই পদ্ধতি সকলের লেখায়···। এতে মূল কে, আর কে অনুকারক স্থির হওয়া কঠিন। তবুও যতটা দেখা গেছে, তাতে এই

পর্য্যন্ত বলা যেতে পারে যে, বাৎসল্য রসের কবিতায় বৈষ্ণব-পর্য্যায়ে বলরাম দাসের এবং উমা-সঙ্গীতে দাশরথি রায়ের কতকটা বিশিষ্টতা দেখা যায়।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে মঙ্গল কাব্যে শিব-দুর্গার যে রূপ আমরা দেখেছি, উমা-সঙ্গীতে তাঁদের রূপ তারই ওপর এক পোঁচ মাত্র—ঐতিহ্য অব্যাহত ভাবেই বয়ে এসেছে। বাংলার দুর্গোৎসবকে উপলক্ষ্য করে একটা রূপক গড়ে তোলা যেতে পারে—পার্ব্বতী হিমালয় কন্যা—হিমালয়-বাহিত পলি মৃত্তিকায় বাংলারও উৎপত্তি—সুতরাং বাংলাই পার্ব্বতী—পার্ব্বতী অন্নদাত্রী—বাংলাও অন্নশালিনী—মা মেনকা বর্ষা-ঋতু—তাঁর অশ্রু-ধারায় বিগলিত হয়ে শরতে ধনধান্যেপূর্ণ কল্যাণ-লক্ষ্মীরূপে তিনি পিতৃ-ভবনে আবির্ভূতা হন—আর শরতে বাংলার শস্য-সম্পদও হয় গৃহজাত। রূপক হিসাবে এটা মন্দ হয় না। গ্রীক পুরাণের প্রোসারপাইনের বাসন্তীরূপে আবির্ভাবের অনুরূপ করে বানিয়ে, এ নিয়ে বেশ গলাবাজীও চলতে পারে। বলা যেতে পারে, এই জাতীয় ঐতিহ্যের ওপরই বঙ্কিমের বন্দে মাতরমের ভিত্তি—তাতে দাশু রায়, কমলাকান্তও রাতারাতি শিক্ষিত সমাজে জলাচরণীয় হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু সে বৃথাশ্রমে কাজ নেই। দাশুরায় প্রমুখদের মাথা অত সূক্ষ্ম ছিল না—তাঁরা পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যের সঙ্গে বাস্তব সত্যকে খানিকটা মিশিয়ে যা লিখে গেছেন, তার ন্যায্য মূল্য যাঁরা দিতে অনিচ্ছুক, তাঁদের সঙ্গেই আমাদের বিবাদ। আবার যাঁরা তাঁদের নিয়ে বাড়াবাড়ি করেন এবং মনে করেন হিন্দুত্বের ধ্বজা উড়াবার পক্ষে তাঁদের পদাবলীকে পাথেয় স্বরূপ নেবেন, তাঁদেরও আমরা সমর্থন করতে পারি না। এঁরা যা, এঁরা তাই তার বেশীও না, কমও না।

[৩]

বাউল-সঙ্গীত

সচরাচর যে বাউলদের আমরা পথে ঘাটে দেখি, তাদের ভেতর থেকেই বাউল সঙ্গীতের জন্ম হয়েছে, এ ভাবতে প্রবৃত্তি হয় না। এরা কতকাংশে সুফী, কতক বৈষ্ণব, কিছুটা বা নিরীশ্বরবাদী—এদের পোষাকও যেমন বিচিত্র টুকরোর সমাবেশে তৈরী, এদের ধর্ম্মমতও তেমনি বিভিন্ন মতের ভগ্নাংশ নিয়ে গঠিত। এই সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব বাংলার বাইরে নেই এবং বাঙালীর সামাজিক জীবনের বাইরেই এদের স্থিতি। এরা হিন্দুও বটে, মুসলমানও বটে—আবার দুয়ের কোনটাই নয়। মনে করা যেতে পারে, দুই সম্প্রদায়ের মূল শাখা থেকে কোন-না-কোন কারণে যারা ছাঁট পড়ে গেছে, তারা উভয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতের কতক কতক স্থূল কথা নিয়ে, তার সঙ্গে কিছু পরিমাণ নূতন জিনিষ মিশেল দিয়ে, নিজেদের মতো করে একটা স্বতন্ত্র সম্প্রদায় গড়ে নিয়েছে—প্রচলিত সমাজবিধির সঙ্গে সামঞ্জস্য না হওয়ায় লোকে তাদের বলেছে বাউল বা বাতুল। সমাজতাড়িতদের সমন্বয় সাধন ও একীকরণের মন্ত্র হিসাবে এরা তাই প্রচলিত দেব-দেবীদের বাতিল করেছে—এদের উপাস্য হচ্ছেন সাঁই বা গুরু, কিন্তু এদের উপাসনা পদ্ধতিতে বৈষ্ণবোচিত নতি ও মাধুর্য্যের অভাব নেই, আবার সুফীদের ভোগ-বাদকেও এরা উপেক্ষা করেনি। এদের সাঁই বা গুরু বা কর্ত্তা কখনো পার্থিব গুরু, কখনো বা ঈশ্বর—তাঁর নির্দ্দেশ ছাড়া অন্য কোন অনুশাসনই এরা মানে না। এই জন্যে এদের এক সম্প্রদায়ের নাম কর্ত্তাভজা। এদিক থেকে এদেরকে এক শ্রেণীর সহজিয়াও বলা যেতে পারে। বোধ হয় তান্ত্রিক বৌদ্ধ আমল থেকেই

একটা অসংলগ্ন রকমের সম্প্রদায় ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, যার একটা শাখার পরিণতি বাউলে।

বাউল সঙ্গীত এদের রচনা না হক, এদের জন্যে রচিত তাতে আর সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ গানেরই রচনা এমন নিখুঁত, বক্তব্য এত গূঢ় এবং ব্যঞ্জনা এত মধুর যে এগুলো অশিক্ষিত বাউল সম্প্রদায়ের রচনা বলে ত মনে হয়ই না, উপরন্তু খুব বেশী প্রাচীন বলেও মনে হয় না। এ পর্য্যন্ত যে সমস্ত সঙ্কলন প্রকাশিত হয়েছে, তার কোনটাই নির্ভেজাল ভাবা যায় না—অমুক মাঝি, অমুক কৈবর্ত্ত, অমুক বাগ্দী, অমুক হরকরা, বিচিত্র নামের স্বাক্ষর দিয়ে সঙ্কলয়িতারা যতই প্রচার করুন না কেন, এদের ভেতর থেকে শিক্ষিত আধুনিক কবির হাত তাঁরা গোপন করতে পারেন না। এদের ভাষাই এ বিষয়ে আমাদের প্রধান সাক্ষ্য—

ধন্য আমি বাঁশীতে তোর আপন মুয়ের ফুঁক
এক বাজনে ফুরাই যদি নাইক কোন দুখ।
ত্রিলোক ধাম তোমার বাঁশী আমি, তোমার ফুঁক,
ভালো মন্দ রন্ধ্রে বাজি, বাজি দুখ আর সুখ।
সকাল বাজি সন্ধ্যা বাজি বাজি নিশুইত রাত,
ফাগুন বাজি শাঙন বাজি তোমার মনের সাথ!

কিংবা—

হৃদয় কমল চলছে ফুটে কত যুগ থেকে,
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি দিবে কে?
ফোটে ফোটে ফোটে কমল ফোটার না হয় শেষ,
সেই কমলের গন্ধ একই রূপ যে তাই বিশেষ।

তারে পারে না রে লোভী ভ্রমর যেতে ফেলে রেখে—
তাতে তুমিও বাঁধা আমিও বাঁধা মুক্তি দিবে কে ?

কিংবা—

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে—
তোমার ডাক শুনে সাঁই, চলতে যে চাই,
রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে।

কিংবা—

পরাণ আমার সে াতের দীয়া
মোরে ভাসাইলা কোন ঘাটে

আমি মনে করি এগুলো আধুনিক রচনা—শুধু আধুনিকই নয়, রবীন্দ্র যুগের রচনা—সম্ভবতঃ সংগ্রাহকবর্গের স্বরচিত এবং অজ্ঞাতনামা বাউলদের নামে প্রচারিত। এর ভেতর যেটুকু Archaic প্রয়োগ দেখা যায়, তা স্বেচ্ছাকৃত—একটু পাল্টে দিলেই আর কোথাও গলদ থাকে না। এসব রচনা আর যাই হক, ময়মনসিংহ গীতিকার চেয়ে ঢের বেশী জাল—যদিও নিজস্ব ভাবে সাহিত্য হিসেবে এদের উৎকর্ষ সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে গীতের অনেক শাখা, অনেক রূপ আছে—কোথাও ভালো জিনিষ নেই এমনও নয়, কিন্তু সর্ব্বত্রই তা বড় বেশী গতানুগতিক, স্থূল এবং পুরুষানুক্রমলব্ধ। এদের প্রত্যেকটি কিন্তু নূতন এবং রূপে-রসে প্রত্যেকটি সার্থক রচনা। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনাকে স্বীকার করে নেয়া কঠিন—বিশেষ করে বাউলদের মতো একটা অপকৃষ্ট সম্প্রদায়ের এতটা সৃজনী-শক্তিকে। ভণিতা দেখে ভয় পাবার কিছু নেই। একই পদে যথাক্রমে চণ্ডীদাস এবং লোচনদাসের ভণিতা দেখতে পেয়েছি—তেমনি একের রচনায় অন্যের ভণিতা এখানেও যুক্ত হয়ে থাকতে

পারে। মোটের ওপর যে ঐতিহাসিক নিষ্ঠার ওপর লোকের বিশ্বাস হতে পারতো, সম্পাদকরা তার অনুসরণ করেনি এক্ষেত্রে। এতে মনে হয়, আধুনিকদের যশ-হরণের জন্যে তাঁদের আদর্শে গান লিখে বেশীর ভাগ স্থলেই তা বাউলদের নামে চালানো হয়েছে। আভ্যন্তরিক সাক্ষ্যে তাই বলে অন্ততঃ।

যে সমস্ত গানকে প্রাচীন বলে স্বীকার করতে পারি, এমন গান পাইনি তা নয়—সেই সব ভাটিয়ালী গান, মুর্শিদা গান বা বাউল গান পাঠকের মনে অবিমিশ্র করুণারই উদ্রেক করে। তা পল্লী-সঙ্গীত ত নয়ই, রীতিমতো গেঁয়ো গান এবং তার কোথাও সাহিত্যের বাষ্প নেই। সেই মাটির ঢেলাগুলোর তুলনায় এগুলি এক একটি হীরার টুকরো—তাইতেই সন্দেহ হয়

[৪]

লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত

বৌদ্ধ চর্য্যাপদ থেকে সুরু করে, একেবারে বাউল সঙ্গীত পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যে একটানা উপ-ধর্ম্মের আধিপত্য চলে এসেছে—ময়মনসিংহ গীতিকা ভিন্ন সামাজিক মানুষের দাবী কুত্রাপি রক্ষিত হয় নি। মঙ্গলকাব্যে সামাজিক মানুষ আছে, সেও দেবদেবীদের বকলমায়—রামপ্রসাদে একবার ব্যক্তিগত আকূতির সুর শুনেছি, সেও ধর্ম্মসম্পর্কহীন নয়। কাজেই আমাদের সাহিত্যে প্রেম এসেছে রাধার জবানীতে, বাৎসল্য এসেছে যশোদা বা মেনকার মারফতে, শৌর্য্য এসেছে চণ্ডীকার দোহাই দিয়ে—আমার-আপনার মতো অভাজনদের স্বীকার করে নিয়ে, তাদেরই সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষাকে ভাষা দিতে বাঙালী লেখক ভয় পেয়েছেন—দেশীয় সাহিত্যেই তার ঐতিহ্য ছিল না।

তাই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এটা-ওটা নিয়ে আমরা ভেবেচিন্তে তারিফ করতে পারি, কিন্তু সমগ্রভাবে তার বিচিত্র প্রাণ-সম্পদ নিয়ে গর্ব্ব বা গরিমা প্রকাশের আমাদের এমন কোন সঞ্চয়ই নেই। কোন বৃহৎ পরিবেশের ভেতর থেকে সমগ্রভাবে জীবনকে দেখা এবং নানা অবস্থান্তরকে আশ্রয় করে নানা চিন্তার ভেতর দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা প্রাচীনকালে এ দেশের ধাতে ছিল না। তাই এদেশের সাহিত্য যেখানেই ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের অবলম্বন পেয়েছে, সেখানেই ব্যাঙের ছাতার মতো একে অন্যের গায়ের ওপর গা দিয়ে মাথা তুলেছে—অনুকরণ এবং অনুবৃত্তি তাও বাঁধা পথে—আর যেখানে এই আশ্রয় পায়নি, সাহিত্যও সেখানে জমেনি। তবে একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি এবং সেটা সাহিত্য ছাড়া অন্য কোন দিক থেকেই লক্ষিত হবার উপায় ছিল না।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আনুমানিক এক হাজার বছরের পুরাণো। এই সুদীর্ঘ সময়ে বাঙালীর জীবনের উপর দিয়ে কয়েকটি ভাব-বিবর্ত্তনের পর্ব্ব বয়ে গেছে—তার মধ্যে ইদানীন্তন শ' দেড়েক বৎসর বাদ দিলে, বাকী সমস্তটাই মোটা কথায় প্রাচীন সাহিত্যের তালিকাভুক্ত হয়ে পড়ে। এই প্রাচীন সাহিত্যকে বৌদ্ধ গাথা, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব গীতি, শ্যামা সঙ্গীত এবং লোক গীতি, এই পাঁচটি শাখায় ভাগ করে আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি। এর বাইরে প্রাচীন সাহিত্য বলতে আর বিশেষ কিছুই নেই। কিন্তু তাই বলে কেউ যেন না মনে করেন যে এই সাহিত্য শাখাগুলির প্রত্যেকটি আত্ম-স্বতন্ত্র বা একে অন্যের প্রাণ-ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট। বরং ঠিক তার উল্টো। (বাংলার ধর্ম্মনৈতিক আদর্শের মূলে যে যৌন-পরতন্ত্রতার আতিশয্য দেখা যায়, সে বৌদ্ধে, বৈষ্ণবে, তান্ত্রিকে, বাউলে সর্ব্বত্রই—তার অব্যাহত ধারার মধ্যে কোথাও ছেদ নেই। প্রচ্ছন্নতঃ

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বহিরঙ্গিক রূপভেদকে ছাপিয়ে গোড়ার কথাটা সর্ব্বত্রই এক। স্ত্রী ও পুরুষের জান্তব সম্বন্ধকে রূপকের সাহায্যে আধ্যাত্মিক মার্গে উন্নীত করে, সহজ-সাধন পদ্ধতির গুণগান সমগ্র বাংলা সাহিত্যের মর্ম্মকথা—এটার উৎপত্তি কোথা থেকে তা বিশেষ-ভাবে প্রণিধান করার প্রয়োজন আছে। এজন্যে বাংলার সামাজিক ইতিহাসকে নূতন করে খোঁজা আবশ্যক। সেই সঙ্গে সাহিত্যকেও কেবল মাত্র সাহিত্য হিসাবে না দেখে, নতুন আলোকে দেখতে চেষ্টা করা আবশ্যক।) কাজেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের ভাব-ধারার একটি অবিচ্ছিন্ন পারম্পর্য্য দেখা যায়—যার ফলে সাহিত্য-দৃষ্টি আবর্ত্তিত হয়েছে একটি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত গণ্ডীর মধ্যে।

ভাষা ও শব্দ-প্রয়োগের দিক থেকেও এ সিদ্ধান্তকে বাজিয়ে দেখা যেতে পারে। একটা কথা যেমন, মন-পবন—এটা দোঁহা, মঙ্গল, শূন্য পুরাণ, বাউল গান সর্ব্বত্রেই পাওয়া যায়, এমন কি ময়মনসিংহ গীতিকাতেও এর অভাব নেই। কথাটা তন্ত্র-ঘেঁষা—হয়ত ইন্দ্রজাল বিদ্যার এলাকাভুক্ত—কিন্তু বিভিন্ন পর্য্যায়ের মধ্যে দিয়ে এর গতি ঘটেছে—এমনি আরো অনেক কথাই আছে। এদিকটা এবং বাংলার সীমান্তবর্ত্তী স্থানসমূহের আদিম জাতিগুলির সাহিত্য বলতে যদি কিছু থাকে, তার মূলবস্তু কি পরিমাণে orthodox পর্য্যায়ের অনুপূরক, সেদিকটা মিলিয়ে দেখলেও হয়ত দেখা যাবে, তার মধ্যে দিয়েও এই ধারাবাহিকতারই স্রোত বয়ে চলেছে। কিন্তু এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞের হস্তক্ষেপ আবশ্যক।

শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, প্রাচীন বাংলা সাহিত্য এই কেন্দ্রীয় দুর্ব্বলতার ফলেই এত বেশী মামুলী ও মৌলিকতা বর্জ্জিত

হয়ে পড়েছে। সেই বারমাস্যা, সেই কুলকামিনীদের পতি নিন্দা, সেই তিলফুল জিনি নাসা জাতীয় ক্লান্তিকর উপমার আতিশয্য, নয়ত সেই বাঁদর অভিসার, বাসক সজ্জা, ভাব সম্মিলন, নয়ত সেই আগমনী আর বিজয়া—এক একটা পর্য্যায় ধরলেই দেখা যাবে, সকল কবিরই পদ্ধতি এক, বিষয় এক। নূতন উদ্ভাবন, নূতন প্রকাশ, নূতন দৃষ্টি ও অনুভূতি কুত্রাপি সুলভ নয়। এই ছক-বাঁধা পথে ঘুরতে হয়েছে বলেই প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে আসল মানুষ আসে নি—তাকে আসতে হয়েছে উপ-ধর্ম্মের কুয়াসা ঢাকা দিয়ে। সব শেষে ক্রমে এই অনুভূতিটা ভাঙা ভাঙা ভাবে আসতে সুরু করেছিল মাত্র। যেটাকে আমরা বলি কবিওয়ালাদের যুগ, সেই যুগের গীতি-সাহিত্য আশাতীত উপেক্ষা লাভ করেছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে গেলে বলা দরকার যে বৈষ্ণব কবিতার পর লিরিক কাব্যের ধারা-বিবর্ত্তনে তার একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। যদিও এই সব কবির প্রেম-সঙ্গীতের ধারা মূলতঃ বৈষ্ণব কবিতা থেকেই গৃহীত, তবু এখানে রাধা-কৃষ্ণ নেই, তার স্থান দখল করেছে সামাজিক স্ত্রী-পুরুষ। তাদেরই অনুরাগ, আবেদন, অভিমান, বিরহ, অপমান—প্রেমের বিভিন্ন অবস্থাকে অবলম্বন করেই এই সব গান লিখিত হয়েছে। নিছক কৃষ্ণ-সঙ্গীত এবং শ্যামা-সঙ্গীতের প্রভাব তখনো ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে কাজ করেছে—কৃষ্ণ কমলের রাই উন্মাদিনী, কিম্বা বদন অধিকারী বা নীলকণ্ঠের পদে, কিংবা রসিক রায় বা ব্রজ রায়ের শ্যামা-সঙ্গীতে তার ভগ্ন-দশার কিঞ্চিৎ পরিচয় পাই—কিন্তু নূতন সুরেরই প্রাবল্য ঘটেছে। সে সুর ক্ষীণ হতে পারে, তবু তা উপেক্ষণীয় নয়।

নিধু বাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু, কালী মির্জ্জা, হরু ঠাকুর—এই ক'জনকে এই নূতন দলের অন্তর্গত করে দেখতে পারি। নিধু বাবুই এই

দলের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিসম্পন্ন—শোরি মিঞার টপ্পাকে বাংলা ছাঁদে ঢেলে, তিনি একদা দেশের আবালবৃদ্ধবণিতাকে মাতিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর সেই সব গান আজো বাংলার পল্লী-ভবনে কণ্ঠে কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তার ভেতর বিরহের তীব্রতা বা মিলনের মদিরতা না থাকলেও, হৃদয়াবেগের প্রসন্নতা আছে, যা ভালোই লাগে। অন্ততঃ এটা ত বেশ ভালোই লাগে—

ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি না,
আমার এই রীতি তোমা বই জানি না।
বিধু মুখে মধুর হাসি,
দেখিলে সোহাগে ভাসি,
তাই তোমায় দেখিতে আসি—
দেখা দিতে আসি না।

কিংবা এটা—

তোমার তুলনা তুমি প্রাণ এ মহী-মণ্ডলে,
আকাশের পূর্ণ শশী সেও কাঁদে কলঙ্ক ছলে।
সৌরভে আর গৌরবে কে তব তুলনা হবে
আপনি আপন সম্ভবে,
যেন গঙ্গাপূজা গঙ্গার জলে।

এ দুটি গান শ্রীধর কথকের নামেও চলতে দেখা যায়, বেশীর ভাগ বইয়ে অবশ্য নিধুর নামই প্রচলিত আছে। শ্রীধর এবং নিধুর রচনাপদ্ধতি অনেকটা একই রকম—দুজনের বিষয়ও এক, শব্দ-প্রয়োগেও তফাৎ খুবই কম, কাজেই এ গোলমালের একটা সঙ্গত কারণ আছে, কিন্তু এর ওপরেও আর একটা কারণ—গীত আকারে

এদের লোকের মুখে মুখে ফেরা। এখন উপায় কি ওপরের গান দুটির সঙ্গে নীচের গানটির তফাৎ ধরা? নীচেরটি শ্রীধরের রচনা।

তবে প্রেমে কি সুখ হত—
আমি যারে ভালোবাসি সে যদি ভালোবাসিত।
প্রেম-সাগরের জল তবে হইত শীতল
বিচ্ছেদ বাড়বানল, যদি তাহে না থাকিত।

এই জাতীয় গান বহু কবিরই আছে। পৃথক পৃথক ভাবে এর জন্যে কোন কবিকে নির্ব্বাচন করা চলে না—সমগ্রভাবে এই পর্য্যায়ের সাহিত্যকে একটা শ্রেণীর অন্তর্গত করে দেখতে হয়। আর সেদিক থেকেও একে খুব একটা মোটা দাম দেয়া যায় কিনা সন্দেহ!

রাম বসু বা কালী মির্জ্জার বিরহ-সঙ্গীতের আবেদন আর একটু গভীর। অনেক স্থানে তা প্রায় খাঁটি লিরিকের কাছাকাছিই এসে পড়েছে—নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকে যা পারেনি। তাঁদের কদর প্রধানতঃ সঙ্গীতের দিক থেকে। রাম বসু বা কালী মির্জ্জার বিরহ-গানে বানানো কথা নেই তা নয়, গামুলি উপমার বাহুল্য নেই তাও নয়—তবে সে সবকে ছাপিয়ে ওঠে একটা আকুলতা, একটা অব্যক্ত বেদনা, যা মনকে টানে। যেমন রাম বসুর—

মনে রইল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে
তারে বলি বলি বলা হল না—
সরমে মরমের কথা কওয়া গেল না।
যদি নারী হয়ে সাধিতাম তাকে,
নির্লজ্জ রমণী বলি হাসিত লোকে,

সখি ধিক আমারে, ধিক সে বিধাতারে
নারী-জনম যেন করে না !

কিংবা কালী মির্জ্জার (যদিও এতে কিছু পরিমাণে কৃষ্ণ-রূপকের আভাস আছে)—

আর ত যাব না আমি যমুনারি কূলে ।
... ...'
গুরুজন ছিল সাথে, মরেছিলাম মরমেতে,
ভরিয়ে এনেছি কুম্ভ নয়নেরি জলে ।

এই ধরণের গানই যে আধুনিক প্রেম-সঙ্গীতের পিতা না হক পিতামহ স্থানীয়, তাতে নিশ্চয় কারুর সন্দেহ নেই। নিধু বাবু বা শ্রীধর কথক, কিংবা রাম বসু বা কালী মির্জ্জা এই ধারাটা কোথা থেকে পেলেন, তা নিয়ে গবেষণা করে দেখতে আমাদের বেশী দূর যেতে হবে না। অনুমান করতে পারা যায়, দেব-দেবী-সঙ্গীত যথেষ্ট হয়ে যাবার পর দেশের চিত্তবৃত্তি মানব-সঙ্গীত খুঁজেছিল, তারই ভাষা আধো আধো ভাবে প্রকাশ পেয়েছে এইসব প্রেমের গানে, বা নিধুর প্রসিদ্ধ বাংলা ভাষা সম্বন্ধীয় গানে—

নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

এই মানবীয় প্রেমসঙ্গীত আরো একটু হাল্কা, কিন্তু আরো অনেক বেশী সাবলীল ভাষায় রূপ পেয়েছে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর গানে। ভারতের বিদ্যাসুন্দর যে মানবীয় আবেদনটুকুর একান্ত অভাবে, আগাগোড়া অপূর্ব্ব শব্দ-লীলার নিষ্ফল খেলায় পর্য্যবসিত হয়েছে, গোপাল উড়ের যাত্রা-গানে তার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হয়েছে। কোন কোন বিষয়ে গোপাল উড়ে আধুনিককেও টেক্কা দেন—

কলঙ্কেতে ভয় করো না বিধুমুখী।

... ...

কমলেরি বনে গেলে কাঁটা ফোটে পায়,
তা বলে কি ফাঁকে ফাঁকে পা বাড়ানো যায় ?
ডুবেছি না ডুবতে আছি, পাতাল কত দূরে দেখি।

নয়তো—

রূপ দেখে কি কূল হারালাম বকুল তলায় এসে ?

নয়তো—

ছেঁড়া চুলে বকুল ফুলে মালা গেঁথেছো···

বলা বাহুল্য, রুচির প্রশ্ন নিয়ে আমরা মাথা ঘামাচ্ছি না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য নিয়ে যাঁকে কাজ করতে হবে, তাঁর ও বিষয়ে নাক সিঁট্‌কানো একেবারেই চলবে না—তার কারণ কি তা আমরা আগেই নির্দেশ করেছি। আমাদের মনে রাখতে হবে, একদা এই উড়িয়া মহাশয়ের গান প্রকাশ্য আসরে গাওয়া হত, আর মণ্ডলী করে বসে বালকবৃদ্ধ তাই শুনতেন—চিকের আড়ালে কুলনারীরাও শুনে দু'হাতে কান ঢাকতেন না।

দ্বিতীয় খণ্ড : আধুনিক কাল

প্রথম অধ্যায়

কাব্য ও কবিতা

[ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ এবং তাঁদের পরবর্ত্তী গীতকারদের রচনা দিয়েই প্রাচীন যুগ শেষ হল। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে সুরু হল নূতন যুগ। প্রাচীন যুগে সাহিত্যের এক মাত্র বাহন ছিল পদ্য—গল্প, কাহিনী, জীবন চরিত, তত্ত্ববিচার, সবই লেখা হত পদ্যে। প্রাচীন সাহিত্যের জাতি-গোত্রও ছিল অনেকটা এক ধরণের—তার সমস্ত শাখা প্রশাখারই জন্ম লৌকিক ধর্ম্মকে আশ্রয় করে। তাই কি দৃষ্টি-ভঙ্গীতে, আর কি রচনা-পদ্ধতিতে, কবিদের স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় তাতে বড় বেশী পাওয়া যায় না। আধুনিক কালে এসে সাহিত্যে শ্রম-বিভাগ দেখা দিলো। উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, নানা দিক দিয়ে সাহিত্য প্রকাশের পথ পেলো বলেই, পদ্য সাহিত্য অনেকটা ভারমুক্ত হয়ে চলবার সুবিধা পেলো। পদ্যের জাতি-গোত্রও আধুনিক কালে গেল আমূল বদলে। পাশ্চাত্য শিক্ষার ভেতর দিয়ে দেশে এলো পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির প্রভাব এবং সেই প্রভাব থেকে যেমন এ যুগে সাহিত্যের প্রাণ-শক্তি পেলো নূতন নূতন প্রবর্ত্তনা, তেমনি নূতন নূতন পথে সুরু হল সাহিত্যের প্রকাশভঙ্গী নিয়েও পরীক্ষা। কাব্যে এই পরীক্ষার প্রমাণ, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, লিরিক, সঁনেট, কত বিচিত্র ধারাই নূতন করে দেখা দিল। এই সময় থেকে। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে সৃষ্টির কাজ বেশী করতে পারলেন না, কিন্তু জমি তৈরি করে দিলেন তিনিই। সেই ভিত্তি ভূমির ওপর পরে মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র মহা-কাব্যের ইমারত খাড়া করলেন, আর বিহারীলাল, সুরেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি করলেন লিরিকের। তারপর এলেন রবীন্দ্রনাথ, যিনি বাংলা সাহিত্যের গদ্য ও পদ্য, নাটক ও কথা সাহিত্য, সমস্ত দিকই আপনার অসামান্য সৃজনী-প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল করে তুললেন। এখন থেকে বাংলা কবিতা তার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য লাভ করলো, যার ধারা আজও অব্যাহত বেগে চলেছে। রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল, অক্ষয়কুমার, গোবিন্দচন্দ্র, দেবেন্দ্রনাথ প্রমুখ কবির নিজস্বতা অনুপেক্ষনীয় হলেও, তাঁরা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার পাশে অনেকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেছেন। রবীন্দ্র-কাব্যে বাহ্য

প্রকৃতি, বস্তু-সংসার এবং পরমার্থ, এই তিনের ভেতর দিয়ে মানব-মনের যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে, তাই অবলম্বন করেই আধুনিক বাংলা লিরিকের বিকাশ হয়ে চলেছে। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের ভেতর কয়েকজনের লেখায় ইদানীং প্রতিক্রিয়া সুরু হয়েছে বটে, কিন্তু এখনো তা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেনি।]

[১]

ভারতচন্দ্রই খাঁটি বাংলা আদর্শের সর্ব্বশেষ কবি। ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে নূতন যুগের সূত্রপাত হল। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে যথেষ্ট ইংরেজী নবীশ ছিলেন কিনা সন্দেহ, কিন্তু ইংরেজী চিন্তা-ধারা ও সাহিত্যাদর্শ আমাদের সাহিত্যে এলো তাঁরই হাত দিয়ে। তারপর থেকে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের সঙ্গে প্রাচীন যুগের যোগসূত্র গেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে এবং প্রাচীন সাহিত্যের স্তন্য-রসকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, আধুনিক সাহিত্য তার স্বকীয় প্রাণ-প্রেরণাতেই বেড়ে উঠতে লাগলো। পরবর্ত্তী কালের বিশিষ্ট সাহিত্যিক যাঁরা— মাইকেল, দীনবন্ধু, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, বিহারীলাল, কারুর ওপরই আর প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বিন্দুমাত্র প্রভাব দেখা যায় না। তাঁদের সাহিত্যিক দৃষ্টি ও শিল্পাদর্শ তৈরী হয়েছে একান্ত-ভাবেই ইংরেজী প্রভাবে। রবীন্দ্রনাথের হাতে বাংলা কাব্য আবার বৈষ্ণব কবিতা, বাউল সঙ্গীত এবং ছেলে-ভুলানো ছড়ার দিকে একটু মোড় ফিরেছে, কিন্তু তার আগেই সাহিত্যের মোটামুটি কাঠামোটা তৈরী হয়ে গেছে ইংরেজী মালমসলা দিয়ে—তাই রবীন্দ্রনাথ যখন এদের আনলেন, তখন স্বভাবধর্ম্মেই এরা যেন একটা জন্মান্তরের ভেতর দিয়ে এলো। অর্থাৎ প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অব্যাহত ধারায় স্পষ্ট ছেদ পড়লো ঈশ্বর গুপ্তে এবং আর একটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধারা জন্ম নিলো।

. ঈশ্বর গুপ্ত স্বয়ং যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজো টি'কে থাকতে পারে নি—তার কারণ তাতে প্রাণ-শক্তিই ছিল কম। কিন্তু তাতে ঈশ্বর গুপ্তের গৌরব কিছুমাত্র কমে না। তিনিই সর্ব্বপ্রথম বাংলা ভাষায় অনেকগুলো নূতন জিনিষ আনেন, যার মধ্যে প্রধান দুটি হচ্ছে—হাস্যরস, আর দেশপ্রেম।

পুরাণো আমলে বিজয় গুপ্তের পদ্মাপুরাণে, রামেশ্বরের শিবায়নে এবং দাশু রায়ের পাঁচালিতে হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টা আছে—কিন্তু উদর এবং তন্নিম্নবর্ত্তী স্থানের সীমানা ছাড়িয়ে তা বিশুদ্ধির স্তরে উঠেছে কদাচিৎ। ঈশ্বর গুপ্তের হাসিতেও কুরুচি আছে ঠিকই, কিন্তু বাংলার এই বনিয়াদি ঐতিহ্য থেকে মুক্তিরও চেষ্টা আছে প্রচুর। তপসে মাছ, পাঁঠা, মেম সাহেব—এদের নিয়েও যে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ নির্দ্দোষ হাসি সম্ভব, এ ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম দেখালেন। আর দেশ-প্রেম? তাঁর আগে কোন দিন কোন বাঙালী সাহিত্যিক স্বদেশ ও স্বজাতির মুখ চেয়ে একটি লাইনও লেখেন নি—তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গেয়েছেন শুধু দেব-মাহাত্ম্য। ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম বললেন—

ভ্রাতৃ ভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে,
প্রেম পূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কত রূপ যত্ন করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুরে ফেলিয়া।

কাল-ধর্ম্মে দেশাত্মবোধের এই আদর্শকে আমরা ঘৃণা করতেই শিখেছি। যদিও একশ বছর পরেও আজ মনে হচ্ছে, ঈশ্বর গুপ্ত নেহাৎ মন্দ পরামর্শ দেন নি!

কিন্তু ঈশ্বর গুপ্ত সব চেয়ে বড় কাজ করেছেন সাহিত্যস্রষ্টা রূপে নয়, সাহিত্য সংস্কারক রূপে এবং এই দিক থেকেই ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে। তাঁর আমলে তাঁরই চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় মফঃস্বলবাহিনী ধারা কলকাতার এক মূল ধারায় এসে মিশলো—সে হল তাঁর 'প্রভাকর'। এখনকার দিনে পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সাহিত্য গোষ্ঠী তৈরী হয়—তার সূচনা প্রভাকরে এবং ঈশ্বর গুপ্তই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্ব্বের সর্ব্বপ্রথম ডিক্টেটর। ঈশ্বর গুপ্ত দুটো দিকে নজর রেখে প্রভাকর চালাতেন—এক, নূতন লেখক সৃষ্টি, আর পুরাতন লেখক প্রচার। নূতন লেখকদের মধ্যে তাঁর সাগরেদী করে এবং তাঁর কাগজে হাত পাকিয়ে পরে যাঁরা যশস্বী হন, তাঁদের কয়েকজন হলেন—দীনবন্ধু, রঙ্গলাল, বঙ্কিম। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্ত যে প্রতিভা চিনতেন এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন পাকা জহুরীর মতোই, তার আর প্রমাণ দরকার নেই। তাঁর এই জহুরীপণার আর একটু নিবিড় পরিচয় আছে—ছোকরা বঙ্কিমকে তিনি পদ্য ছেড়ে, গদ্য লেখার উপদেশ দিয়েছিলেন। ভাগ্যে দিয়েছিলেন, নইলে সাহিত্য-সম্রাটের পরিণাম কি হত? নিধুবাবু, হরু ঠাকুর, রাম বসু, শ্রীধর কথক, নিতাই বৈরাগী প্রভৃতি কবিওয়ালার রচনা সংগ্রহ ও সম্পাদন করা এবং টীকা-টিপ্পনী, জীবনী ও সমালোচনাসহ প্রকাশ করাও তাঁর আর একটি কীর্ত্তি। সেদিক থেকেও তিনিই বাংলা সমালোচনা সাহিত্যের প্রথম প্রবর্ত্তক। এতগুলো কাজ এক জীবনে যিনি করেছেন—সম্পাদনা, সমালোচনা, সাহিত্য সৃষ্টি ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা—তিনি নিশ্চয় অসাধারণ পুরুষ। তাঁর রচনার অশ্লীলতা বা অনুপ্রাসের বাড়াবাড়ি নিয়ে ঠাট্টা করার আগে একথা যেন আমরা একবার মনে করি।

[২]

ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীন সাহিত্যের সমাধি-শয্যার উপর নবীন সাহিত্যের বিগ্রহ স্থাপন করে গেলেন, কিন্তু তাতে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করার মতো সৃজনী-প্রতিভা তাঁর ছিল না। তাই তাঁর সমস্ত আয়োজনই পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। পরবর্ত্তী যুগে মাইকেল এবং বঙ্কিম এসে, একে কাব্যে এবং অন্যে গদ্যে, বাংলা সাহিত্যে জীবন সঞ্চার করলেন। এখান থেকেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আসল ইতিহাস আরম্ভ। ঈশ্বর গুপ্ত থেকে মাইকেলে আসতে, মাঝখানে অল্প যে সময়টুকু পড়ে, তার একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবি হচ্ছেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। দেব-দেবীর মহিমাত্মক মঙ্গল ছেড়ে, ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে উপাখ্যানকাব্য লেখার প্রবর্ত্তন করলেন তিনি। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' মেবারের এবং 'কাঞ্চি কাবেরী'তে উড়িষ্যার ইতিহাস তাঁকে কাব্য রচনার উদ্দীপনা দিয়েছে। বিষয়ের দিক দিয়েও যেমন, রচনারীতির দিক দিয়েও তেমনি, রঙ্গলাল মঙ্গলকাব্যের রাস্তা মাড়ান নি। তিনি সোজাসুজি অনুসরণ করেছেন স্কট, বাইরণ, মূরে প্রমুখ ইংরেজ কবিদের। তাঁর প্রসিদ্ধ 'স্বাধীনতা হীনতায়' অংশটা ত হুবহু ইংরেজীরই অনুবাদ। রঙ্গলালের রচনায় বৈশিষ্ট্য কিছু থাকলেও, বৈচিত্র্য কম। বাদলের কাহিনী বা কাঞ্চি কাবেরীর প্রারম্ভ বা এমনি দু'একটা জায়গায় তাঁর কলমে হঠাৎ এসেছে একটু বেগ, একটু উন্মাদনা, নইলে আগাগোড়াই তা পয়ারের ভ্যানভ্যানানি। তবে হ্যাঁ, ঈশ্বর গুপ্তের ম্রিয়মান দেশপ্রীতি রঙ্গলালে এসে বেশ একটা বলিষ্ঠ চেহারা ধরেছিল, তারই প্রেরণায় তিনি দেশের অতীত ইতিহাসকে পুনরুজ্জীবিত করতে চেয়েছিলেন, সাফল্যও লাভ করেন নি এমন নয়।

এই সময়ের আর একজন কবি হচ্ছেন মদনমোহন তর্কালঙ্কার, যাঁর 'বাসবদত্তা' কাব্য এক সময় দেশে আদৃত ছিল। এই বইটি আমার কোন দিনই ভালো লাগেনি। (ইংরেজী আমলের কবিদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি, যাঁর ওপর ইংরেজী সাহিত্যাদর্শ বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। খাঁটি দেশী আদর্শকে আশ্রয় করেই তিনি কাব্যখানি লিখেছিলেন, সেদিক থেকে যদিও কবিকে আমি সাধুবাদ দিতে প্রস্তুত)। অক্ষরে-অক্ষরে কবি ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করেছিলেন, কাহিনী, চরিত্র, আঙ্গিক-পদ্ধতি যাবতীয় ব্যাপারেই। সংস্কৃত ছন্দের ওপর দখল ছাড়া, আর কোন কিছুতেই তাঁর কোন রকম স্বকীয়তার পরিচয় নেই। স্বপ্নদৃষ্ট কুমারীর সন্ধানে তরুণ প্রেমিকের নিরুদ্দেশ যাত্রা, সেখানে রূপের ছটায় কুলকামিনীদের চিত্তে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা, তারপর দূতীর সহায়তা লাভ এবং সেই পথে কুমারী রাজকন্যার সঙ্গে মিতালী, মৈথুন, গর্ভ-সঞ্চার, শেষকালে কলঙ্ক, গ্রেপ্তার, এবং দৈব-মধ্যস্থতায় মুক্তি ও বিবাহ! এক কথায় বিদ্যাসুন্দরের আনুপূর্ব্বিক নকল এবং সে নকল গণেশ বন্দনা থেকে সুরু করে, পজ্ঝটিকা ছন্দে বিপরীত-বিহার বর্ণনা পর্য্যন্ত। অধুনালুপ্ত বলেই বইটি নিয়ে আলোচনা করলাম, নইলে এতে এমন কিছুই নেই, যার কোন বিশিষ্ট স্বীকৃতি আছে।

[৩]

এর পর মাইকেল, সৃজনী-প্রতিভায় যাঁর সমকক্ষ কবি তাঁর পূর্ব্বে বাংলা দেশ দেখে নি। দেশ-বিদেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য তিনি মন্থন করেছিলেন, তার ওপর আবিষ্কার করেছিলেন বাংলা যুক্তাক্ষরের অন্তর্নিহিত শক্তি। এই দুয়ের সমাবেশে তিনি যে নূতন কাব্য-রীতির প্রবর্ত্তন করলেন, তা এমনই দুর্দ্ধর্ষ রকম স্বতন্ত্র যে দেশ প্রথমটা

তা বরদাস্তই করতে পারে নি। প্রাদেশিকতার জারক রসে সঞ্জীবিত বাংলা কবিতার ক্ষীণধারা মাইকেলের বলিষ্ঠ বাহুর আলোড়নে ঘুলিয়ে উঠলো—গৃহাঙ্গনের সীমা ছাড়িয়ে তা ছুটলো মহাসাগরের অভিমুখে। বাংলা কবিতা এখন থেকে কেবলমাত্র বাংলার কবিতা না থেকে, বিশ্বের কবিতার সঙ্গে সমানজাতিত্বের দাবী করে বসলো। মাইকেল খৃষ্টান ছিলেন বলেই নয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তদানীন্তন ভারতবাসীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন বলেই নয়, মনে-প্রাণে অ-বাঙালীসুলভ বিদ্রোহ ও পুরুষকারের উপাসক ছিলেন বলেই, তিনি দেশীয় সংস্কৃতির মর্ম্মমূলে বিপুল নাড়া দিলেন। যুগসঞ্চিত জড়তা ও অন্ধ আচারনিষ্ঠার ব্যূহ ভেদ করে, জীবনকে তিনি দেখলেন দিগন্তপ্রসারী বিস্তৃতির পটভূমিতে—মাইকেল এঞ্জেলোর মূর্ত্তির মতো বিরাট, আর তেমনই জীবন্ত নরনারী তাঁর সবল তুলিকাস্পর্শে মূর্ত্ত হয়ে উঠলো, যা বাংলা সাহিত্যে আগে কখনো হয় নি। মাইকেলের এই পৌরুষের পাশে বঙ্কিমের প্রতিভাকেও আমার যথেষ্ট নিষ্প্রভ মনে হয়।

এই অসীম প্রাণ-শক্তিই তাঁকে যেমন দেশীয় সাহিত্যের চিরাচরিত টেকনিকের বিরোধী করেছিল, তেমনি করেছিল দেশীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত ঐতিহ্যের প্রতিকূল। অর্থাৎ পয়ার-ত্রিপদী-প্লাবিত বাংলা কাব্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্ত্তন এবং রাম-লক্ষ্মণকে ছেড়ে, রাবণ-মেঘনাদে অধিকতর মহত্ত্ব আরোপের মূল একই জায়গায় নিবদ্ধ এবং তা হল, মাইকেলের মনোধর্ম্মে। উপমা প্রয়োগে বা অলঙ্কার-বিন্যাসেও মাইকেল দেশীয় কাব্যের প্রচলিত প্রসিদ্ধি অনুসরণ করেন নি, আগাগোড়া ধার করেছেন পাশ্চাত্য থেকে। এক কথায়, ইউরোপীয় রসদৃষ্টি এবং চিন্তাধারার বলিষ্ঠ সংযোজনায় তিনিই প্রথম বাংলা ভাষায় ওজো-গুণসম্পন্ন উচ্চাঙ্গের কাব্য-ধারা আনলেন। এই উপধর্ম্ম-অধ্যুষিত দেশে

ইউরোপীয় আদর্শের মহাকাব্য, বিয়োগান্তক নাটক, প্রহসন, সনেট, নাটকীয় খণ্ডকাব্য সবই মাইকেলের সৃষ্টি, একথা আজ আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। কিন্তু সেটা ভুলে যাওয়া ঘোরতর অকৃতজ্ঞতা ছাড়া আর কিছুই নয়।

আধুনিক সমালোচনার নিরিখে বিচার করলে অবশ্য মাইকেলের কাব্যে আজ একটা বড় রকমের খুঁৎ পাওয়া যায়। তা হচ্ছে তাঁর আবেদনের স্থূলতা—কি চরিত্রসৃষ্টিতে, কি বিন্যাসে, আর কি অন্তর-রহস্যের উদ্‌ঘাটনে, সর্ব্বত্রই মাইকেলের হাত খুব মোটা। উপমার পর উপমা, শব্দের পর শব্দ বসিয়ে হৈ হৈ করে তিনি গেছে চলেন, কিন্তু তাঁর কাব্য আসলে চলে কম, চলার আয়োজন করে বেশী। রচনার এই ঐরাবতিক আতিশয্যের জন্যেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো যখন কাঁদে, তখন সে কান্নায় প্রাণ গলে না, যখন হৃদয়-দ্বন্দ্বের আবর্ত্তনে ওলট-পালট খায়, তাতে আভ্যন্তরিক ঐশ্বর্য্যের চেয়ে ব্যবহারিক চাতুর্য্যই প্রকাশ পায় বেশী। এই দেহগত স্ফীতির ফলেই তাঁর ভাষাও হয়েছে এত বেশী অস্বচ্ছ—ধ্বনিমুখর ঠিকই, কিন্তু ব্যঞ্জনাগভীর নয় তাঁর শব্দ-যোজনা। মেঘনাদে ত নয়ই, তাঁর বীরাঙ্গনাতেও কদাচিৎ শব্দের সেই অন্তর্মুখিতা দেখা যায়। এর একটা কারণ অবশ্য এই যে, মাইকেল ক্ল্যাসিকাল সাহিত্যকে আদর্শ করে রোমান্টিক কাব্য লিখতে বসেছিলেন এবং ক্ল্যাসিকে বহিরঙ্গিকতাই বড় কথা। কিন্তু আসল কারণ এই যে বাংলা ভাষার 'জানে'র সঙ্গে মাইকেলের সত্যিকার চেনা ছিল না—অসামান্য অধ্যবসায়ে তিনি তাকে আয়ত্তে এনেছিলেন, কিন্তু আত্মসাৎ করতে পারেন নি। তাই তিনি সবই করেছেন, কিন্তু তাঁর কাব্য-শরীরে সুগভীর প্রাণ-রস সঞ্চার করতে পারেন নি—এমন কি সনেটে বা একান্ত ব্যক্তিগত 'আত্ম-বিলাপে'ও না।

[৪]

মাইকেল প্রবর্ত্তিত মহাকাব্যের ধারা তাঁর পর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেনের হাত দিয়ে অন্য দিকে মোড় ফিরলো। হেমচন্দ্র আসলে 'জাত কবি' ছিলেন না, অধ্যবসায় তাঁকে দিয়ে কিছু কাব্য লিখিয়ে নিয়েছে মাত্র—তাঁর খণ্ড কবিতা বা লিরিকের আলোচনা পরের অধ্যায়ে করবো, তাঁর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বই 'বৃত্রসংহারে'ই বর্ত্তমান প্রসঙ্গ সীমাবদ্ধ থাকবে। বৃত্রসংহারের নাম থেকে সুরু করে ভেতরকার চরিত্র পর্য্যন্ত আগাগোড়াই মেঘনাদ বধের অনুকরণ। উভয় ক্ষেত্রেই দৈবী শক্তির সঙ্গে দানবীয় শক্তির সঙ্ঘর্ষ এবং শেষ পর্য্যন্ত দানবীয় শক্তির পরাজয়—একে রাম আর রাবণ, অন্যে ইন্দ্র আর বৃত্র—তারপর মেঘনাদ ও প্রমীলা, রুদ্রপীড় ও ঐন্দ্রিলা—সীতা ও সরমা, শচী ও ইন্দুবালা। ঘটনা-সংস্থানে পর্য্যন্ত হেমচন্দ্র মাইকেলের ছায়া অনুসরণ করেছেন—শুধু দধীচীর আত্মত্যাগ এবং বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালা বর্ণনা ছাড়া। কিন্তু কল্পনাশক্তির অজস্রতায়, বর্ণনার তেজস্বিতায়, প্রকাশভঙ্গীর গাঢ়তায় মেঘনাদ বধে যেমন একটি জমজমাট ভাব আছে, বৃত্রসংহারে তা নেই, তা থাকা সম্ভবও নয়। নানা ছন্দের ব্যবহার যেমন একদিকে তাঁর কাব্যের অব্যাহত গতিকে খোঁড়া করেছে, তেমনি কোনস্থানেই তিনি ঘরোয়া সংস্কারের ঊর্দ্ধে উঠতে পারেন নি। বৃত্রসংহারের আরম্ভ এবং শেষ সত্যিই ভালো এবং সমগ্র কাব্যের মধ্যে ঐ দুটি জায়গাতেই তাঁর লেখনীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। আরম্ভটা প্যারাডাইস্ লষ্টের প্যাণ্ডিমনিয়ম মনে করিয়ে দেয়, আর বিশ্বকর্ম্মার কর্ম্মশালাও সুন্দর (দান্তের নকল হলেও)।

নকল মাইকেলও করেছেন। ইলিয়াডের হেক্টর-এণ্ড্রোমেকি তাঁর হাত দিয়ে মেঘনাদে-প্রমীলায় রূপান্তর লাভ করেছে—কোমসের

স্ত্যাব্রিনার বিবরণ থেকে তিনি জল-তল-নিবাসিনী বারুণীর কাহিনী রচনা করেছেন, ইউলিসিজের নরক-যাত্রা থেকে নিয়েছেন রামের প্রেতপুরী ভ্রমণের বিষয়—ভার্জিল, দান্তে, ট্যাসো প্রভৃতি থেকে টুকরো অংশ আরো যে কত নিয়েছেন মেঘনাদে, তার ইয়ত্তাই নাই। কিন্তু তাঁর নিজের হাতে ছিল এমনই একটি প্রাণবন্ত সৃজনী-শক্তি যে বহিরুপাদান তিনি যেখান থেকেই আহরণ করুন, তাকে নিজের করে নিতে পেরেছেন। হেমচন্দ্রের সৃজনী-প্রতিভা ছিল অত্যন্ত কম, ভাষা ছিল অতিশয় অপটু, তাই তাঁর রচনায় ভালো মাল-মশলা প্রচুর থাকলেও, সবশুদ্ধ জড়িয়ে বড় কিছুই হয় নি।

নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের চেয়ে ত বটেই, প্রাক-রবীন্দ্র কবিদের মধ্যে বিহারীলাল ছাড়া আর সকলের চেয়েই বড়। তাঁর লেখায় একটি সত্যিকার বেগবান কবি হৃদয়ের ছাপ পাওয়া যায়—সে পলাশীর যুদ্ধের মতো কাঁচা কাব্যেই হক, আর প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতকের মতো সুলিখিত এবং সুপরিণত কাব্যেই হক। ব্যক্তিগত জীবনে কবি ছিলেন শুনেছি অত্যন্ত আত্ম-সচেতন এবং সাদা কথায় যাকে বলে উচ্ছৃঙ্খল—তাঁর কাব্যে যে আবেগকম্পিত অনায়াস রচনার ঔজ্জ্বল্য দেখা যায়, তার জন্ম বোধ হয় ঐখানে। পোষমানা ভালো মানুষের দ্বারা আর যাই হক শিল্প-সৃষ্টি হয় না—নবীনচন্দ্র ভালো মানুষ ছিলেন না এইটাই বোধহয় ভাগ্যের কথা। আগেই বলেছি, পলাশীর যুদ্ধ তাঁর খুব কাঁচা লেখা—বাইরণের সুরা, শোণিত ও স্বাধীনতার উন্মাদনায় উচ্ছ্বসিত চাইল্ড হেরল্ড কাব্যকে উমিচাঁদ, মিরজাফর, আর গোটাকয়েক হিন্দুশয়তানের চক্রান্তে রাজ্যচ্যুত নাবালক নবাবের নিধন-কাহিনীর ভেতর রূপায়িত করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি এই কাব্যে। কিন্তু বাইরণের কাব্য হচ্ছে আসলে বর্ণনাত্মক, আর নবীনচন্দ্র লিখেছেন

উপাখ্যান। কাজেই মডেল হিসাবে বাইরণকে নেয়ার এবং ছত্রে ছত্রে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করার ফলে তাঁর কাব্যে আখ্যানবস্তু দানা বাঁধতে পারে নি। তবে যুদ্ধ বর্ণনায়, সিরাজের স্বপ্ন বর্ণনায় এবং সর্বশেষে তাঁর হত্যা বর্ণনায় পলাশীর যুদ্ধেও যে ঔজ্জ্বল্যের পরিচয় আছে, তা বাংলা সাহিত্যে আর কোথাও ছিল না।

রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস—আসলে একখানাই কাব্য, কৃষ্ণ-লীলার তিনটি পর্য্যায় নিয়ে পৃথক্ পৃথক্ তিন খণ্ড লিখিত হলেও, তিনের মধ্যে তাই আখ্যানগত একটি যোগসূত্র অক্ষুণ্ণ রাখা হয়েছে। আধুনিক কালে কয়েকখানি তে-ভাগী উপন্যাস বিশ্ব-সাহিত্যে খ্যাতিলাভ করেছে—নবীন সেনের এই Trilogy নিতান্ত বাংলা বলেই হয়ত বাঙালীর কাছে উপেক্ষিত। কিন্তু মাইকেলোত্তর এবং প্রাক-রবীন্দ্র পর্ব্বে এর পাশে দাঁড়াতে পারে, এমন বই ত আমার জানা নেই। ছোট ছোট কয়েকটা নিদর্শন নেয়া যাক—রৈবতক পর্ব্বতে অন্তরীণ অর্জ্জুনের কাছে শ্রীকৃষ্ণের শৈশব কাহিনী বর্ণনা, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে, মৃত্যু-কণ্টকিত মুহূর্ত্তের পটভূমিতে সুলোচনার সেবাব্রত বা উত্তরার স্বপ্ন, শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য পরিকল্পনার প্রতিকূলে দুর্ব্বাসার বিদ্রোহ—নাগজাতির অভ্যুত্থান এবং তাদের পুরোভাগে থেকে অশিববুদ্ধি দুর্ব্বাসার কপট যজ্ঞানুষ্ঠান—পরিকল্পনার দিক থেকে যেমন সুন্দর, তেমনি মহত্ত্ব ব্যঞ্জক, বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যেও সম্পূর্ণ অনাস্বাদিতপূর্ব্ব। পরিকল্পনা এবং ভাব-ব্যঞ্জনার ব্যাপারে বৃত্রসংহারের চেয়ে ত বটেই, মেঘনাদ বধের চেয়েও এরা উন্নত রুচির নির্দ্দেশক। মেঘনাদ বধের দ্বন্দ্ব অদৃষ্ট-পুরুষকারের দ্বন্দ্ব এবং পরিণতিতে অদৃষ্টেরই হয়েছে জয়, যদিও কবির সহানুভূতিটা বরাবরই থেকে গেছে পুরুষকারের ওপর (রাবণ দুর্বৃত্ত বলে নয়, দোষ ত্রুটি দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তার পুরুষকার-দৃপ্ত চরিত্রে অদৃষ্টের

সঙ্গে যুদ্ধ চালাবার দুর্দ্ধর্ষতা প্রকাশ পেয়েছে বলে)। বৃত্রসংহারে এ ধরণের কোন সুগভীর বাণীই দুর্লভ, যদিও একদা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বৃত্রসংহারকে মেঘনাদের ওপরে স্থান দিয়েছিলেন। আমরা নবীনচন্দ্রেই সর্ব্বপ্রথম দেখলাম লাঞ্ছিত মানবতার বিদ্রোহ অভিযান, তথাকথিত বর্ণ-হিন্দুর সযত্ন প্রসারিত শাসন ও শোষণের বেড়া-জাল কাটিয়ে তারা বেরিয়েছে তেড়েফুঁড়ে—প্রাচীরঘেরা বর্ণাশ্রমের বিরুদ্ধে ছুটেছে বিপ্লবারক্ত চোখে, যার মুখে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মরাজ্য স্থাপনের সুমহৎ পরিকল্পনা পর্য্যন্ত পর্য্যবসিত হল প্রভাসের প্রসন্ন সমাপ্তিতে। এই রসঘনতা স্পষ্ট করেই রবীন্দ্র যুগের পূর্ব্বাভাস সূচনা করে। (অমিত্রাক্ষর লক্ষণাক্রান্ত পয়ার যা রবীন্দ্রনাথের হাতে পূর্ণতা পেয়েছে, নবীন সেনে তারও সূত্রপাত)। বিসর্জ্জন, চিত্রাঙ্গদা, কর্ণকুন্তী সংবাদ, কচ ও দেবযানী প্রভৃতির পাশে প্রভাস, কুরুক্ষেত্র, রৈবতক রেখে পড়লে, সহজেই বোঝা যায় এরা এদের অব্যবহিত পূর্ব্বপুরুষ।

নবীন সেনের এই Trilogyর আর একটি উল্লেখযোগ্য জিনিষ শৈলজার চরিত্র। শেষাংশে একটু অনৈসর্গিক পথে গেলেও, শৈলজার মোটামুটি পরিকল্পনাটা রবীন্দ্র নাথের চিত্রাঙ্গদা চরিত্রেরই অপ্রস্ফুট রূপ, যেমন রঘুপতির বিদ্রোহ নাগবিদ্রোহেরই পূর্ণতর রূপ! অবশ্য রবীন্দ্র-প্রতিভার প্রসঙ্গে প্রভাবের কথাটা অবান্তর, তবু ইতিহাস লেখকের একটা ব্যবহারিক হিসাব ত চাই। নবীন সেনের Trilogyর প্রধান দোষ তার ভাষা। যথেষ্ট গতিশীল এবং সঙ্ঘাতমুখর ভাষাতেই অবশ্য কবি লেখনী চালনা করতেন, কিন্তু শব্দ-ভাণ্ডার তাঁর ছিল খুব সীমাবদ্ধ, তাই থেকে থেকে তাঁর লেখা পড়ে যেতো এবং অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোড়নে কাব্য-বস্তু যখন খুব জমে উঠতো, ভাষা তার থৈ না পেয়ে

বাইরে মাথা ঠুকে মরতো। নবীন সেনের কাব্যে অব্যাহত একাত্মতার যে অভাব, তার মূল এইখানে।

[৫]

নবীন সেন দিয়েই মহাকাব্যের ইতিহাস শেষ। মাইকেলে এর জন্ম এবং নবীন সেনে শেষ, মধ্যে হেমচন্দ্র। অত্যন্ত অল্পকালের হলেও, বাংলা মহাকাব্যের মর্য্যাদা অবশ্যই স্বীকার্য্য, কিন্তু তার কৌলিক গরিমার সন্ধান পাওয়া যায় না। পুরাণো মঙ্গল কাব্যগুলো কাব্যাকার উপাখ্যান, যেমন ইংরেজীতে ওয়াল্টার স্কটের কাব্যগুলো। প্যারাডাইস লষ্ট যে জাতের মহাকাব্য, সেই জাতের মহাকাব্য প্রাচীন বাংলায় ছিল না—তার প্রবর্ত্তন করলেন এঁরা। (অবশ্য ইলিয়াড বা রামায়ণ-মহাভারত যে হিসাবে মহাকাব্য, প্যারাডাইস লষ্ট বা মেঘনাদ বধ সে হিসাবে মহাকাব্য নয়—তবু এগুলোকেও মহাকাব্যই বলা যাবে, বরং বলা যেতে পারে, এরা একেলে মহাকাব্য)। উপাখ্যান-কাব্যের সঙ্গে মহাকাব্যের তফাৎ শুধু আকারে নয়, প্রকারেও। একটি দ্বন্দ্বসঙ্কুল বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র করে পরস্পর-বিরোধী চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত সৃষ্টি করা এবং তা থেকে কোন সুগভীর পরিণামের নির্দ্দেশ দেওয়াই হল মহাকাব্যের লক্ষ্য। তাই তার আঙ্গিক সংস্থানও হয় গুরুগম্ভীর এবং ভাষাও হয় বলদৃপ্ত। উপাখ্যানের লক্ষ্য হল গল্প বলা এবং তা থেকে রসের সন্ধান দেওয়া, তাই তাতে দরকার লালিত্যের। অর্থাৎ মহাকাব্যের প্রাণ-ধর্ম্মে আছে নাটক, আর উপাখ্যানে আছে লিরিক! মাইকেল যুগের অন্তে বাংলা কাব্যে আবার লিরিক ফিরে এলো—এবং সেও এলো পাশ্চাত্য প্রবর্ত্তনা থেকেই।

মহাকাব্যের ভাঙা আসরে অনুবৃত্তি চলেছিল অবশ্য অনেকদিন। আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনা কাব্য,' হরগোবিন্দ লস্কর চৌধুরীর 'রাবণ বধ,' বলদেব পালিতের 'কর্ণার্জ্জুন,' সর্ব্বশেষ যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'পৃথ্বীরাজ,' 'শিবাজী' এক সময় অনেকেরই আনন্দবর্দ্ধন করেছে। এঁরা মহাকাব্যের ক্ষয়িষ্ণু ধারাকে কিছুকাল বাঁচিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু পারেন নি। মহাকাব্য জিনিষটা হচ্ছে অতি-কায় জীবের মতো। ' সভ্যতার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে তার ক্ষয় অনিবার্য্য—তার কঙ্কাল আমরা সাগ্রহে ভাষার যাদুঘরে রাখতে পারি, কিন্তু জীবন্ত অবস্থায় সামনে পেলে তাকে আমরা আদৌ সহ্য করতে পারি না। উপাখ্যান কাব্যের বিলুপ্তি আগেই হয়েছিল। এযুগে তাকেও আর একবার ফেরাবার চেষ্টা হয়েছিল। হেমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায় 'যোগেশ' বলে একখানি সামাজিক কাব্য-কাহিনী লিখেছিলেন—দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের মাঝখানে ফেলে নায়ক যোগেশের হৃদয়-দ্বন্দ্ব এবং তার আনুষঙ্গিক ট্র্যাজেডী বর্ণনাই হল এই কাব্যের বিষয়। মনস্তত্ত্বের খেলা এতে চমৎকার, ভাষাও দিব্যি ঝরঝরে—তার ওপর গল্পাংশে কোথাও অলৌকিকতার বালাই নেই, হিন্দুয়ানির নামে নীতি-উপদেশের উৎপাত নেই, বরং আখ্যায়িকার স্বাভাবিক পরিণতিকে কবি অসঙ্কোচে এবং অনেকটা অকপটেই ফোটাতে চেষ্টা করেছেন বলতে পারি। মাইকেলোত্তর বাংলা সাহিত্যে একাধিক দিক থেকে উল্লেখযোগ্য এই কাব্যটির কিন্তু দেশে যথোচিত সমাদর হয় নি। হয়ত দাদা হেমচন্দ্রের অতি-খ্যাতির আড়ালে বেচারী ঈশানচন্দ্র ঢাকা পড়েই গিয়েছিলেন এবং দেশের সাহিত্যিক সমাজ সে আড়াল ভেঙে তাঁকে আর কোন দিনই বের করতে সময় পাননি, যদিও স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এবং নবীন সেন তাঁকে বিশেষ

শ্রদ্ধা করতেন, আর অক্ষয় বড়াল 'শঙ্খ' কাব্যে তাঁর উদ্দেশে একটি সুন্দর সনেট উৎসর্গ করে গেছেন। কিন্তু ঈশানচন্দ্র হেমচন্দ্রের চেয়ে অনেক উঁচুদরের কবি ছিলেন—হেমচন্দ্রের 'চিন্তা-তরঙ্গিনী' এবং 'ছায়াময়ী' নামক দুখানি অক্ষম সামাজিক আখ্যানের পাশে 'যোগেশ' কাব্যকে অসাধারণ রকম উজ্জ্বল দেখায়। আগাগোড়া কাব্যখানি সরল অমিত্রাক্ষর ছন্দে (এবং সম্ভবতঃ টেনিসনের Enoch Arden জাতীয় কাব্যের অনুকরণে) লেখা। কিন্তু 'ছায়াময়ীতে' দান্তের Purgatorioর নকল করতে গিয়ে হেমচন্দ্র কি গলদঘর্ম্মই হয়েছেন, আর ঈশানচন্দ্র সুন্দর স্বচ্ছন্দ প্রবাহিত একটি কাব্য-কাহিনী কত অনায়াসেই গড়ে তুলেছেন! খ্যাতির মতো অনির্ভরযোগ্য জিনিষ বোধ হয় আর কিছুই নেই।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্ন-প্রয়াণ' কাব্যও উপাখ্যান পর্য্যায়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য বই। এখানি রূপক কাব্য। মায়াময় স্বপ্ন-লোকের আবেষ্টনীতে এর আখ্যানাংশ সংস্থিত, কল্পনার অনায়াস লীলায়, সুললিত ছন্দের খেলায়, বিচিত্র বর্ণবহুল চিত্রের অজস্রতায় অপরূপ এই কাব্যখানিও বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ সম্পদ। কত হাল্কা হাতে লেখনী চালালে, তবেই এই স্বপ্নের আবহাওয়া অক্ষুণ্ণ থাকে তা ভেবে অবাক হতে হয়। একটু চাপ পড়লেই, এই তুলার মতো লঘু মায়ার আস্তরণ ছিঁড়েখুড়ে একাকার হয়ে যেতো! রীতিমতো তৈরী হাত না হলে, তাকে যে এত সহজে চালানো যায় না, এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই। সবচেয়ে বিস্ময়কর এর ছন্দ-লীলা—সে যেন নেচে চলেছে ঝর্ণার মতো, কোথাও তার পথে এতটুকু বাধা নেই।

হোথায় মহাবট, শিরে জট, অতি নিবিড়,
পালিছে চুপে চাপে, খোপে খাপে, অযুত নীড়।

কিংবা—

গরজন সুবিকট হইল সন্নিকট
গোগণ ঝটপট খোঁজে আড়াল,
কভু বা ঝোপ-ঝাড়, করিয়া তোলপাড়,
পালায় দুদ্দাড় মৃগের পাল!

পড়তে পড়তে কেমন একটা নেশা লাগে। যুক্তাক্ষরের স্বর-তরঙ্গের ওপর নির্ভর করে ছন্দের যতি-নির্ণয় করার পদ্ধতিও বোধ হয় বাংলা ভাষায় এসেছে স্বপ্ন-প্রয়াণ থেকেই, যা মাইকেল, হেমচন্দ্র, নবীন সেন কারুর লেখাতেই হয় নি। কেবলমাত্র অক্ষরের দিক থেকেই তাঁরা ছন্দের তাল ঠিক করতেন, তাই আজকের বিচারে তাঁদের পয়ারাতিরিক্ত মিত্রাক্ষরে পদে পদেই ছন্দ-পতন দেখা যায়। এটা দূর হল দ্বিজেন্দ্রনাথে এসে। তিনিই প্রথম অক্ষরের হিসাব ছেড়ে, মাত্রার হিসাবকে ছন্দবিচারের নিরিখ দাঁড় করালেন—বিহারীলালেও এটা পাওয়া যাবে। আর একখানা মাত্র বাংলা রূপক কাব্য আছে, হেমচন্দ্রের 'আশা কানন', তা এত স্থূল যে একটানা পড়াই কঠিন। বাংলা ভাষার কথা ছেড়েই দিই, সেক্সপিয়ারের 'নিদাঘ নিশীথের স্বপ্ন', বা মেটার-লিঙ্কের 'নীলপাখী'ও আমার কাছে স্বপ্ন প্রয়াণের তুলনায় রীতিমতো নিস্তেজ মনে হয়।

[৬]

এরপর বিহারীলাল। আধুনিক লিরিকের পুনরুজ্জীবনে বিহারীলালের যে দান, তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে।

এমন কি, বিহারীলালকে তিনি তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভিক প্রবর্ত্তনা দেবার জন্যে গুরু বলেই স্বীকার করেছেন। বিহারীলালের প্রভাব রবীন্দ্রনাথ অবশ্য অত্যন্ত অল্প বয়সেই কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু বিহারীলালের লিরিক-দৃষ্টি বাংলা কবিতার মোড় যেদিকে ফিরিয়ে দিয়েছিল, সেই পথেই তার পরবর্ত্তী বিকাশ এবং বিস্তার হয়েছে। সুতরাং এক হিসাবে তিনি আধুনিক কাব্যের গুরু বৈ কি!

বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে লিরিক আছে, তবে তা নৈর্ব্যক্তিক। বাউলে এবং কবিওয়ালায় ব্যক্তিক লিরিক এসেছে ভাঙা ভাঙা ভাবে, কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত রেশ রয়েছে উপধর্ম্মের। যে লিরিক আমরা পড়তে অভ্যস্ত, মূক প্রকৃতিতে মানবিক সত্তা আরোপ করে, রবীন্দ্রনাথ যে বিচিত্র সুখ-দুঃখ, মিলন-বিরহের ব্যক্তিক অনুভূতি সঞ্জাত কবিতা দেশকে উপহার দিয়েছেন, তা বাংলা কাব্যে আগে ছিল না। বাংলা কাব্যে প্রকৃতি ছিল বরাবর জড়—ব্যক্তিক অনুভূতির অকপট স্বীকৃতি ছিল ঔদ্ধত্যের নামান্তর (তাই শ্রীরাধার বা শ্রীকৃষ্ণের বা আর কারুর জবানীতে নিজের কথা বলারই রেওয়াজ ছিল)। মাইকেল যুগ পর্য্যন্ত এরই জের চলেছে। মাইকেলের 'আত্ম-বিলাপে' বা মুষ্টিমেয় সনেটে ব্যক্তিক অনুভূতি পাই। হেমচন্দ্রের 'আবার গগনে কেন' প্রভৃতিতে বা নবীন সেনের 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তেও তা পাই। কিন্তু সে অনুভূতি বস্তুগত সুখ-দুঃখের সীমাতেই আবদ্ধ—তা অনুতাপ, বিলাপ, হাহাকার, এক কথায় ব্যক্তিগত দুঃখ-বেদনার বিবরণেই পর্য্যবসিত। প্রকৃতিকে তাঁরা রেখেছিলেন বাইরে এবং দেখেছিলেন বাইরে থেকেই। তাই অন্তঃপ্রকৃতি এবং বহিঃপ্রকৃতির পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের প্রেরণায় ব্যক্তিগত অনুভূতিকে সার্ব্বজনিকতার স্তরে উন্নীত করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। এটা করলেন বিহারীলাল।

মাইকেল যুগের শেষ ও রবীন্দ্র যুগের সূচনা, এই দুয়ের মাঝখানে যে সংক্ষিপ্ত সময়টুকু, তাকে আর একটা স্বতন্ত্র যুগ বলা যায় না। মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে আসবার পথে ওটা একটা সেতুর মতো—পার হয়ে আসবার জন্যে ওর প্রয়োজনীয়তা কম নয়, কিন্তু ওর ওপরই নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় বাসা বাঁধা চলে না। অবশ্য এ কথার দ্বারা আমি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী এবং তাঁর সমসাময়িক সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের সৃজনী-প্রতিভাকে অস্বীকার করছি না—তাঁরা দুজনেই কবি, এবং সত্যিকার বড় কবিই। কিন্তু তাঁদের প্রতিভার কতকাংশ অপচিত হয়েছে সাহিত্যের পূর্ব্বতন ঐতিহ্য থেকে আশানুরূপ সহায়তা না পাওয়ায়। নিজে হাতে পথ তৈরী করে সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চলতে হয়েছে বলে, তাঁদের সাহিত্য ভবিষ্যৎ সম্ভাবনীয়তার দিকে যতটা সাহায্য করেছে, নিজস্ব সম্পূর্ণতা ততটা অর্জ্জন করতে পারে নি।

বিশেষতঃ বিহারীলাল। বাংলা কাব্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথম প্রকৃতির মধ্যে মানবিক সত্তা অনুভব করেছেন এবং অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির যোগাযোগকে আশ্রয় করে একটি বাস্তবাতীত রসলোকের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর আগে মাইকেলে, হেমচন্দ্রে, নবীনচন্দ্রে মানুষের প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখের পশ্চাৎপট রূপেই প্রকৃতির স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়েছে, কিন্তু মানুষের হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে তার কোন আত্মীয়তার বন্ধন স্বীকৃত হয় নি, তাই প্রকৃতি সেখানে নিষ্প্রাণ—হৃদয়ও দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের বস্তুসীমাতেই আবদ্ধ। প্রত্যক্ষকে অবলম্বন করে রসের পর্য্যায়ে উঠতে, মাঝখানে যে কল্পনার অজস্রতা থাকা দরকার, তার অভাবেই তাঁদের হাত দিয়ে সত্যিকার লিরিক কবিতা সৃষ্টি হতে পারে নি। কোন ভাব বা চিন্তা বা ঘটনার জড় উপাদানকে সরাসরি ছন্দে রূপায়িত করেই তাঁরা কবিতা করেছেন—উপাদানের গুণে বা লিপি-চাতুর্য্যের

বৈশিষ্ট্যে সময় সময় তা সুখপাঠ্য হলেও, আসলে তা কিছুই হয়নি। প্রাণ-ধর্ম্মের দিক থেকে এই সব কবিতা একেবারেই দেউলে।

বিহারীলালেই সর্ব্ব প্রথম প্রাণ-ধর্ম্মের পত্তন হল, অর্থাৎ উপাদানের বদলে অনুভূতিকে, ভাবের বদলে রসকে লিরিক কবিতার নিরিখ হিসাবে নেয়া হল। 'সারদা-মঙ্গলে'র গোড়ার কবিতাটাই ধরা যাক—

কিবা মনোবিমোহন মূরতি তোমার,
সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার।
সদা যেন ঘরে ঘরে,
কমলা বিরাজ করে,
ঘরে ঘরে দেব-বীণা বাজে সারদার।
ধাইয়ে হরষ ভরে, কোলাহল করে করে
হাসি মুখে ঘুরে ফেরে কুমারী-কুমার।
মরুময় ধরাতল,
তুমি শুভ শতদল,
করিতেছ ঢল ঢল সমুখে আমার।
হয়ে কত জ্বালাতন,
করি অন্ন আহরণ,
ঘরে এলে উবে যায় হৃদয়ের ভার।
ক্ষুধা-তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি,
নয়ন-পরাণ দিয়ে দেখি অনিবার।
তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী,
আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি,
হকগে এ বসুমতী যার খুসী তার।

প্রসিদ্ধ 'হিমালয়' কবিতা থেকেও একটু উদ্ধৃত করে দেখাই—

পদে পৃথ্বী, শিরে ব্যোম, তুচ্ছ গিরি সূর্য্য সোম,
নক্ষত্রে নখাগ্রে যেন গণিবার পারে।
সম্মুখে সাগরাম্বরা, ছড়ায়ে রয়েছে ধরা,
কটাক্ষে কখনো যেন চাহিছে উহারে।

প্রিয়াকেই হক, আর প্রকৃতিকেই হক, এই যে একটা বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে দেখা, এর নজীর বাংলা সাহিত্যে এর আগে নেই। অবশ্য অন্যান্য সাহিত্যের মতো বাংলা সাহিত্যেও প্রিয়া এবং প্রকৃতিই চিরদিন কবিতার প্রধান অবলম্বন বলে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু এ দুই বস্তুকেই কবিরা দেখেছেন তাঁদের আত্মকেন্দ্রীয় সত্তার বাইরে রেখে, তাই কবির স্বকীয় বাসনার অনুরঞ্জনে এদের বস্তু-রূপের ওপর একটা করে নূতন দিব্যরূপ গড়ে উঠতে পারেনি, যা কাব্যকে রসোত্তীর্ণ করে। বিহারীলালেই সর্ব্বপ্রথম সেই meta-psychic দৃষ্টি এলো, যে দৃষ্টিকে মোটা কথায় আমি লিরিক mood আখ্যা দেব। কাব্য-শরীরে এই mood, এই প্রচ্ছন্ন প্রাণ-বস্তুর সঞ্চার করাই হল সারদা মঙ্গলের কবির সত্যকার কৃতিত্ব। সারদা সরস্বতীই হন, আর কবির মানসীই হন, আর কোন বাস্তবী নারীই হন, আসলে ইনি কাব্যলক্ষ্মী, যাঁর প্রসন্ন আশীর্ব্বাদে কবির স্থূল চক্ষুর ওপর থেকে প্রত্যক্ষতার পর্দ্দা সরে গিয়েছিল, এবং তিনি প্রবেশাধিকার পেয়েছিলেন সৃষ্টি-রহস্যের অন্তর্লোকে। শেলীর Spirit of Eternal Beauty বা রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতারই ইনি একটি অনুজা বিশেষ। এঁর উদ্বোধন করেই বিহারীলাল ধন্য হয়েছেন, আর বাংলা কবিতাকেও স্থূলতার বন্ধন থেকে চিরদিনের জন্যে মুক্তি দিয়েছেন।

অবশ্য এ কথা মনে করলে ভুল হবে যে বিহারীলালের হাতেই বাংলা

লিরিক সম্পূর্ণতা লাভ করেছিল—তা করে নি। বিহারীলাল বাংলা যে বিশেষ পথে মোড় ফিরিয়ে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাতে যে সম্ভাবনীয়তার বীজ সঞ্চার করে দিলেন, সেই পথেই পরবর্ত্তী কালের কবিতা এগিয়ে গিয়েছে এবং সেই বীজই কালে রবীন্দ্রকাব্যের বিরাট বনস্পতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। এইখানেই বিহারীলালের সত্যিকার গৌরব এবং এর জন্যেই রবীন্দ্রনাথ ও অক্ষয় বড়াল তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছেন। (অক্ষয় বড়ালের লেখায় বিহারীলালের ছায়া অবশ্য বরাবরই থেকে গেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বাল্যেই তাঁর প্রভাব কাটিয়ে উঠেন। তবু তাঁর কাব্য-দৃষ্টির প্রাথমিক গঠনে বিহারীলালের প্রেরণাই যে বিশেষভাবে কাজ করেছে, তা অস্বীকার করবার উপায় নেই।) কিন্তু নিজস্বভাবে বিহারীলালের কবিতা ষোল-আনা টেঁকে নি, তার কারণ তাতে নূতন দৃষ্টি আছে, কিন্তু সেই দৃষ্টি আগাগোড়া সংহত হয়ে উঠতে পারে নি। মাঝে মাঝে অসাধারণতার চমক আছে, কিন্তু আগাগোড়া জড়িয়ে তা একটা-কিছু হয়ে ওঠে নি, ঘূর্ণ্যমান নীহারিকা পুঞ্জের মতো নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় তা শুধু আবর্ত্তিতই হয়েছে—দানা বাঁধতে পারে নি। তাঁর কবিতায় অবোধ্যতার মূলও এইখানে।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার সম্পূর্ণ অন্য জাতের কবি। তিনি লোকোত্তর রসদৃষ্টির অধিকারী ছিলেন না, সে ব্যাপারে তাঁর অবস্থাও বিশেষ ছিল কিনা সন্দেহ! বরং স্পষ্ট গলাতেই তিনি বলেছেন—

হে কবি-কল্পনা-মায়া, সত্যের সোণালী ছায়া,
কাব্য-ইন্দ্রজাল-ভানুমতী।
সুখে তুমি যথা ইচ্ছা যাও রূপবতী।

চড়িয়া কল্পনা রথে, ভ্রম গিয়া ছায়াপথে,
কর ইন্দ্রচাপ বিরচন,
কিংবা কর পরী সাথে চন্দ্রিকা ভোজন।
আমি না করিব দেবী তব আরাধন।
বিধাতার এ সংসারে, যারে না তুষিতে পারে,
যে কবির মহতী কামনা,
তাহারা করিবে শুধু তব আরাধনা।
তত লোকাতীত নয় বাসনা আমার,
লক্ষ্য মম সামান্য এ সত্যের সংসার।

'মহিলা' কাব্যের মঙ্গলাচরণেও প্রায় এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন—

না চাই বর্ণিতে নদ, নদী, সরোবর,
শৈল সিন্ধু মরুভূ প্রান্তর।
গাব গান খুলি হৃদি-দ্বার,
মহীয়সী মহিমা, মোহিনী মহিলার।

আশ্চর্যের বিষয়, বিহারীলাল কল্পনার অনুরঞ্জনে বাস্তবকে অতিবাস্তবে রূপায়িত করছিলেন যে সময়, ঠিক সেই সময়ই তাঁর সমকালীন কবি সুরেন্দ্রনাথ কল্পনাবাদকে পরিহার করে, 'সত্যের সংসার'কে চিত্রিত করবার জন্যে লেখনী চালাচ্ছিলেন! অর্থাৎ দুজনে রসাদর্শের পরস্পর-বিরোধী দুটি সীমানা ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এক সমসাময়িকতা ছাড়া দুজনের মধ্যে আর কোন দিক থেকেই কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের এই বাস্তবতা বস্তু-সংসারকে যথাযথ অঙ্কিত করা মাত্র নয়, বস্তুকে তত্ত্বের মধ্যে দিয়ে বুঝানো এবং সেই কারণেই তা অতিমাত্রায় intellectual।

এই প্রজ্ঞাত্মতার আতিশয্যে মহিলা কাব্যের পাঠককে বারংবার হোঁচট খেতে হয়। প্রত্যক্ষ সংসারের কেন্দ্রস্থানে দাঁড়িয়ে মাতা, ভগিনী, জায়া, নানারূপে নারী নানামুখী আকর্ষণ-বিকর্ষণের ভেতর দিয়ে ব্যষ্টি ও সমষ্টি জীবনকে যেভাবে চালাচ্ছে, বাইরে থেকে সে একটা ব্যবস্থা মাত্র, কিন্তু ভেতর থেকে সে একটা গূঢ় শক্তির খেলা, একটা অপরিস্ফুট উদ্দেশ্যের অনুপূরণ। বিশ্ব-সংস্থানে এই প্রাকব্যবস্থিত উদ্দেশ্যের প্রতিনিধি হচ্ছেন নারী—এই কথাই হল মহিলা কাব্যের মূল তত্ত্ব। এই তত্ত্বকে মহিলার নানা পর্য্যায়ে নানাভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে, যথেষ্ট বেগবান ও বর্ণবহুল ভাষায় এবং রীতিমতো গাম্ভীর্য্যের সঙ্গেই। বইটি কবি শেষ করে যেতে পারেন নি, কিন্তু যতটা পাওয়া গেছে, তাতেই সর্ব্বাঙ্গীনতার যে পরিচয় পাই, তা বিস্ময়কর।

[৭]

আদর্শবাদ ও বাস্তববাদ নিয়ে সাহিত্যের চিরকেলে বিবাদকে আর একবার খুঁচিয়ে তুলে লাভ নেই। সংক্ষেপে এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বস্তু-সংসারের কোন প্রত্যক্ষ প্রেরণা যখন রস-কল্পনার ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়, তখনই তাকে বলে আদর্শ, আর যখন তা মূর্ত্ত হয় প্রজ্ঞাশীলতার আলোকে, তখন তাকে বলে বাস্তব। অর্থাৎ প্রথমের সঙ্গে সম্বন্ধ ব্যক্তিক অনুভূতির—অবচেতন মনের প্রচ্ছন্ন বাসনা কামনার, আর দ্বিতীয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ নৈর্ব্যক্তিক যুক্তিসিদ্ধতার। মূলে দুইয়েরই উৎপত্তি এক জায়গা থেকে, কিন্তু মনোধর্ম্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্যে দুটো যায় দুইপথে—দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন attitude-এ রূপান্তরিত হয়। সাহিত্যে এ দুয়েরই স্বীকৃতি আছে এবং চিরদিন ধরেই আছে। প্রাকৃত

মনে কল্পনার সঞ্চয় অধিক বলে, কল্পনাত্মক রচনাকেই তাঁরা সমাদরে গ্রহণ করতে থাকেন, এই জন্যে তাঁদের বিচারে তাই হল সত্যিজাতের আর্ট। প্রজ্ঞাত্মক রচনাকে তাঁরা রসহীনতার অপবাদ দিয়ে অপাংক্তেয় করে থাকেন। কিন্তু বিশুদ্ধ কল্পনা আর নির্ব্বিশেষ প্রজ্ঞা যে আসলে দুই সহোদর, এ কথা অপ্রমাণিত নয়।

বাস্তবতা প্রসঙ্গে আর একটা কথা বলার আছে। নিছক বাস্তবের প্রতিরূপ যে ছবি, তাহা হল ফোটোগ্রাফ, আর যে রচনা, তা হল সংবাদপত্রের বিবরণ। প্রত্যক্ষ জীবনে তাদের প্রয়োজনীয়তা আছে, কিন্তু কাব্যে বা শিল্পে তারা অকুলীন। আত্মকেন্দ্রিক কল্পনার রঙে রঙীন করেই হক, আর নৈর্ব্যক্তিক তত্ত্বের আলোকে উদ্ভাসিত করেই হক, প্রত্যক্ষকে বস্তুসীমার ঊর্দ্ধে তোলা চাই—তা না হলে আর আর্টের প্রয়োজন কি? বাস্তবই ত আছে। বস্তুতান্ত্রিকতার নামে যে প্রত্যক্ষানুগামিতার ব্যাপক প্রসারে বিংশ শতাব্দীর শিল্প বিপর্য্যস্ত হতে চলেছে, তা আর্টের রাজ্যে অনেক ক্ষেত্রেই উপদ্রব বিশেষ। রসের বা তত্ত্বের খাদ মিশেল না দিলে বাস্তবের খাঁটি সোনাও শিল্প পদবাচ্য হতে পারে না—কিন্তু সে প্রজ্ঞা সকলের নেই, অথচ বাস্তববাদী হবার বাসনা আজ সকলেরই! তাই বাস্তবপন্থা অনুসরণের নাম দিয়ে জড় প্রত্যক্ষতাকে রূপায়িত করার দিকে এসেছে দুর্নিবার ঝোঁক, এবং বাজারেও তা চড়া দামেই বিকোচ্ছে। বস্তুতঃ এরা সৃষ্টি নয়, খুব সস্তা জাতের অনুলিপি এবং রচয়িতাদের অপরিণত দৃষ্টি ও বিচার-বুদ্ধিরই পরিচায়ক। সত্যিকার কল্পনার আত্ম-সমাহিত অনুভূতির বিস্তারও এতে নেই, সত্যিকার প্রজ্ঞার আত্ম-বিচ্ছিন্ন নিরাসক্তিও নেই এতে। সৌভাগ্যের বিষয়, সুরেন্দ্র মজুমদারের কাব্যে বাস্তবানুসরণের সঙ্গে সেই নিরাসক্তি ও তত্ত্বমুখিতা পাই, যা শ্রেষ্ঠ সাহিত্যেরই লক্ষণ। তাঁর

কাব্যের অশ্লীলতাও তাই আমার কাছে দোষনীয় নয়। (তবে তাঁকে আমি লিরিক কবি বলতে পারি না, আত্মকেন্দ্রিকতা বর্জ্জন করে লিরিক হয় না বলেই আমার বিশ্বাস।) কিন্তু একটা জিনিষ আমি সবিস্ময়ে ভাবি, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের মতো কবি রবীন্দ্রনাথের ওপর বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি!

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের বা বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর সমগ্র রচনা নিয়ে আলোচনা করার স্থান এবং অবকাশ আমার নেই। আমি উভয়ের রচনার মূল সূত্রগুলি শুধু ধরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি—সেই জন্যে দুজনের দুটি শ্রেষ্ঠ রচনা নিয়েই এখানে আলোচনা করেছি। এ ছাড়াও সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের অসমাপ্ত কাব্য 'সবিতা-সুদর্শন' এবং 'সন্ধ্যার প্রদীপ', 'বর্ষ বিবর্ত্তন' প্রভৃতি কবিতা যে-কোন পাঠকেরই মনোহরণ করবে। বিহারীলালের 'বঙ্গ সুন্দরী', 'সাধের আসন', 'বন্ধু বিয়োগ', 'নিসর্গ দর্শন' ইত্যাদিও কম আনন্দ-দায়ী হবে না। কৌতূহলী পাঠক বসুমতীর গ্রন্থাবলীতে উভয়েরই সমগ্র রচনার সাক্ষাৎ পাবেন—যদিও আমার মনে হয়, তার চেয়ে নির্ব্বাচিত পরিচয়েই উভয়ের প্রতিভা উজ্জ্বলতররূপে প্রতিভাসিত হবে।

বিহারীলাল ও সুরেন্দ্রনাথের সমসাময়িক আর একজন শক্তি-মান কবি হচ্ছেন গোবিন্দ চন্দ্র রায়। এঁর দুটি মাত্র রচনা বাংলা সাহিত্যে বেঁচেছে, অবশিষ্টেরা আজ কোথায় তা প্রত্নতাত্ত্বিকেরা হয়ত বলতে পারবেন। গোবিন্দ রায় প্রাক-রবীন্দ্র যুগের এক জন বিশিষ্ট কবি, এমন কি, বিহারীলাল, সুরেন্দ্র নাথের চেয়েও এঁর লেখনীর ধার বেশী বলেই আমার বিশ্বাস। কিন্তু তাঁর জীবন এবং সাহিত্য দুইই লজ্জাজনক উপেক্ষার চাপে কোথায় তলিয়ে গেছে। শুনেছি,

তিনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করতেন, ইংরেজী আদৌ জানতেন না, আগ্রায় থাকতেন—হিন্দী সাহিত্যের অনুশীলন করতেন এবং হিন্দী কবিতার শব্দ ঝঙ্কার বাংলায় আমদানি করে কবিতা রচনা করতেন। এ বিবরণ কবির প্রতিভা-নির্ণয়ের পক্ষে অবশ্য নিতান্তই অনাবশ্যক, তবু একটা জিনিষ এই প্রসঙ্গে লক্ষ্য করবার আছে—তা হচ্ছে এই যে অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী আমলের কবি সাহিত্যিকরা, অর্থাৎ বঙ্কিম, মাইকেল, দীনবন্ধু, নবীন সেন, হেমচন্দ্র প্রভৃতি, কেউ ছিলেন ডেপুটি, কেউ ব্যারিষ্টার, কেউ পোষ্টাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, নিদান পক্ষে কেউ হাইকোর্টের নাম করা উকিল। তাঁদের পর সাহিত্যের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে এলো, তাঁদের মধ্য একজনও কেউ-কেটা ছিলেন না। বিহারীলাল করতেন পৌরহিত্য এবং প্রাইভেট টিউটারী, সুরেন্দ্র মজুমদার ছিলেন আধা-সন্ন্যাসী গোছের মানুষ, গোবিন্দ রায় ছিলেন অখ্যাত হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, তারক গাঙ্গুলী কি করতেন, তা আমার ঠিক জানা নেই—তবে বড় কাজ বোধ হয় কিছুই করতেন না। এর থেকে এই কথাই আমি বলতে চাইছি যে সাহিত্যিকের ব্যক্তি-জীবন এবং সামাজিক আবেষ্টনী তাঁর সাহিত্য দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রিত করে, এ কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে বলতে হবে যে বাংলা সাহিত্যে ধীরে ধীরে তথাকথিত সাধারণের অধিকারই প্রতিষ্ঠিত হয়ে চললো। মাইকেল-বঙ্কিম যুগের সাহিত্যাদর্শ যে এই যুগে একটি বিশিষ্ট পরিবর্ত্তনের সম্মুখীন হল, সে কি এই কারণেই? কিন্তু এ আলোচনা আপাততঃ অনাবশ্যক।

গোবিন্দ রায়ের একমাত্র স্মরণীয় কবিতা 'যমুনা-লহরী' আজকের পাঠক অনেকেই হয়ত পড়ে থাকবেন। এই কবিতায় মিলহীন মিত্রাক্ষরে কেবলমাত্র স্বর-তরঙ্গের সাহায্যে ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করা

যেমন লক্ষ্যণীয়, তেমনই এর অন্তর্নিহিত সুগভীর সত্যানুভূতিও অনুপেক্ষনীয়। সুরেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে যে নিরাসক্ত তত্ত্বদৃষ্টির উল্লেখ করেছি, গোবিন্দ রায়ে সেই দৃষ্টিরই পূর্ণতর বিকাশ দেখতে পাই। হিন্দু ও মুসলীম ভারতের বিলুপ্ত কীর্ত্তির মহাশ্মশান ধৌত করে বইছে যে যমুনা লহরী, তাকে কবি দেখছেন একটি ক্রিয়াশীল ধ্বংসশীল চৈতন্যধারা রূপে, যা কেবল একের পর এক করে নূতন খেলার ছক পেতে চলেছে, এবং চোখ ফেরাতে না ফেরাতেই সব ভেঙে-চুরে আবার নূতনের পত্তন করে যাচ্ছে—ধ্বংস ও সৃষ্টির এই অবিশ্রাম প্রবাহের মাঝখানে সাময়িক ছেদ রচনা করে দাঁড়িয়ে আছে যে তাজমহল, তার কাছে আসতেই কবির দৃষ্টির সামনে একটি নূতন চিন্তা-লোকের দরজা খুলে গেছে। তিনি বলছেন—

ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে, দণ্ডায়িত গৃহরাজ ও,
যার সমৃদ্ধে, দিক দিক হইতে, কর্ষে মনুজ-সমাজ ও।
অহো কত কাল, রবে এ বিরাজিত, তটিনী তব তট ভূষি ও,
ভূষণ হইয়া, তব তটনীরে, ব্যঞ্জিতে মনো অভিলাষে ও!
কত নর-পঞ্জরে, নির্ম্মিল উহারে, শোণিত ধারা কোষে ও,
দর্শাইতে সব দর্শক জনে, প্রমদা-গৌরব শেষে ও!

প্রমদা গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্যে এবং তার ভেতর দিয়ে আসলে আপন অহঙ্কার প্রতিষ্ঠার জন্যে কোটি কোটি দরিদ্রের বক্ষ-পঞ্জরে নির্ম্মিত তাজমহল নামক বিরাট শোক-নাট্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী নিগূঢ় প্রহসনকে এমন করে আর কেউই উদ্ঘাটিত করেছেন কিনা সন্দেহ, মহাকবি রবীন্দ্রনাথও করেন নি। সত্যিকার পরিচ্ছিন্ন দৃষ্টি, যা সন্ন্যাসের সগোত্রীয়, তা কবির কতটা সজাগ ছিল এবং তাকে প্রকাশ করবার

ভাষা ছিল কতটা সতেজ, তা আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না আশা করি।

গোবিন্দচন্দ্রের আর একটি প্রসিদ্ধ কবিতা প্রায় সকলেরই কণ্ঠস্থ আছে, কিন্তু তার রচয়িতার নাম বোধ হয় অনেকেরই জানা নেই। সে হচ্ছে 'হিন্দু মেলার' আমলে লেখা গান—

কতকাল পরে বলো ভারতরে,
দুখ-সাগর সাঁতারি পার হবে!
অবসাদ-হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে,
ও কি শেষ নিবেশ রসাতল রে!
পরো দীপমালা নগরে নগরে,
তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে!

মনে রাখতে হবে, কংগ্রেসের তখন শৈশব, দেশের জনসাধারণের মনে জাতীয়তা বোধ তখনো রূপ পরিগ্রহ করে নি, শিক্ষিত সমাজের জাতীয় আন্দোলনও তখন সীমাবদ্ধ রয়েছে আবেদন-নিবেদনে। কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিত যুবক ইতস্ততঃ মরচে পড়া তলোয়ার নিয়ে ছোট ছোট গোপন সভা করছেন এবং প্রকাশ্যভাবে করছেন হিন্দু-মেলার অনুষ্ঠান! সেই অবসাদ হিমের অস্বচ্ছ অন্ধকারে বসে দরিদ্র কবি কেঁদেছিলেন অকপট প্রাণের কান্না, যার সমান আন্তরিকতা হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষায়', নবীন সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে', এমন কি বঙ্কিমের 'আনন্দমঠে'ও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হিন্দু মেলাকে কেন্দ্র করে অপরাপর কবির লেখাতেও অবশ্য স্বাদেশিকতার সুর বেজেছিল। ঢাকার কবি দীনেশচরণ বসুর 'কবি কাহিনী'তে, শিবনাথ শাস্ত্রীর স্বদেশী গানে, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

'মিলে সব ভারত সন্তান' গানে ক্ষীণভাবে একটা জাতীয় চৈতন্যের আগমনী শোনা গিয়েছিল। পরবর্ত্তীকালের বন্দেমাতরম আন্দোলনে হঠাৎ যখন সমগ্র ভারত জুড়ে দেশাত্মবোধের বন্যা এসেছিল, তখন এই সব প্রাথমিক কলকাকলী ছাড়া দেশের প্রাণ-বাণী প্রকাশের আর কোন ভাষা ছিল না। (তাই কি বন্দেমাতরমকে তখন জাতীয় সঙ্গীত বলে নিতে হয়েছিল ?) এই সব গান বাঁচে নি, তার কারণ এদের ভেতর প্রয়াস ছিল, কিন্তু পূর্ণতা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ,' দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশী সঙ্গীতে যে পূর্ণতা দিলেন, তার একমাত্র জীবন্ত পূর্ব্বাভাস পাওয়া যায় শুধু গোবিন্দ রায়ের এই গানে।

[৮]

রবীন্দ্রকাব্যের বিস্তারিত আলোচনা আমরা করবো না, এত অল্প পরিসরে তা করাও সম্ভব নয়। মাইকেলী কাব্যের বহিরঙ্গিকতা বিহারীলাল প্রমুখ কবির হাত দিয়ে ক্রমে ক্রমে লিরিকের অন্তর্মুখিতার দিকে মোড় ফিরেছে, এ আমরা আগেই দেখিয়েছি। তবু সে রব্যুদয়ের পূর্ব্ববর্ত্তী ক্ষণস্থির একটি অরুণালোকিত মুহূর্ত্ত মাত্র— রবির পরিপূর্ণ কিরণ সম্পাতের পর তা নিঃশব্দে দিগন্তে বিলীন হয়ে গেল। তারপর থেকে সুদীর্ঘ অর্দ্ধশতাব্দী কাল বাংলার সাহিত্য ভুবন আলোকিত, উদ্ভাসিত ও সঞ্জীবিত হয়ে রয়েছে শুধু রবীন্দ্রনাথের একক জ্যোতিতে। রবীন্দ্রনাথের মতো অতি-মানুষী প্রতিভার আবির্ভাব বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আকস্মিক সংঘটনের মতো। দেশের প্রচলিত সাহিত্যধারার বা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ক্রম-পরিণতি হিসাবেই এত বড় প্রতিভার বিকাশ হয় নি—হয়েছে অনন্যসাধারণ সৃজনী শক্তির জন্মান্তরীণ অধিকার থেকেই। কারণ

প্রতিভা বস্তুটি যথেষ্ট অনুশীলন সাপেক্ষ হলেও, তার ওপর সহজাত শক্তির ক্রিয়াও সমধিক।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথে দেশীয় ঐতিহ্যের প্রভাব নেই এমন নয়। তাঁর গানে বাংলা বৈষ্ণব ও বাউল গানের ছায়া আছে—কান্তা প্রেমের কবিতায় ও গানে মধ্যযুগীয় মিষ্টিকদের রচনার প্রতিধ্বনি আছে—শব্দালঙ্কারময় স্বভাবোক্তির কবিতায় ক্ল্যাসিকাল্ সংস্কৃতের অনুসরণ আছে—পরমার্থিক কবিতায় উপনিষদের প্রবর্ত্তনা আছে। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বড় কথা, রবীন্দ্রকাব্যে প্রকৃতির সঙ্গে হৃদয়-সম্পর্কের যে লীলা, তা কবি দেশীয় ঐতিহ্য থেকে পান নি—পেয়েছেন শেলীর কাব্য থেকে। যে Creative-Evolution তাঁর জগত, জীবন ও প্রেম সম্বন্ধীয় কবিতার প্রধান অবলম্বন, তাও তিনি পেয়েছেন পাশ্চত্য সাহিত্য এবং দর্শন থেকে। তাঁর গাথা-কবিতায় এবং বর্ণনাত্মক কবিতায় টেনিসনেরও প্রভাব দেখা যায়। অবশ্য রবীন্দ্রকাব্যের প্রসঙ্গে প্রভাবের কথা অবান্তর। নানা দিক-দেশের নানা ধারা তাঁতে এসে মিশলেও, সব কিছুর সমবায়ে তাঁর মনোধর্ম্ম এবং জীবন-বেদ এমন একটি স্বকীয়তা অর্জ্জন করেছে, যার জন্মস্থান কবির অন্তর্লোকে। শুধু একটা কথা বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ লিরিক কবিতার আবেদনই নৈর্ব্যক্তিক, ব্রাউনিঙ বা শেলীর তীব্র আত্মকেন্দ্রিকতা তাতে নেই। ভাবাবেগের অজস্রতা তাতে আছে, কিন্তু কবির ব্যক্তিক অনুভূতিকে আশ্রয় করে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তা যায় নৈর্ব্যক্তিক বিশ্ব-মানবের দিকে। তাই তাঁর কাব্যে নিরুপাধিক এবং বস্তু-নিরপেক্ষ ভাব-ব্যঞ্জনার আধিপত্য যতটা মুখ্য, অন্তরের অকপট উন্মোচন ততটা নয়। অর্থাৎ পারিভাষিক অর্থে যাকে বলে values বা শ্রেয়গুণ,

তা রবীন্দ্রকাব্যে বরাবরই একটু কম। তাঁর কাব্যের অন্তর্লগ্ন রূপ-জগৎ আগাগোড়া দাঁড়িয়ে আছে একটা অব্যক্তিক কাঠামোর ওপর—সেই কাঠামোটা যদিও অপূর্ব্ব শব্দ-যোজনার কৌশলে এবং অনন্য-সাধারণ বিন্যাস-ভঙ্গীর গুণে অনতিক্রমনীয় মোহই সৃষ্টি করে। সত্যি বলতে কি, রবীন্দ্রনাথের কাব্যে এই শাব্দিক অপূর্ব্বতাই হচ্ছে সব চেয়ে বড় কথা এবং এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষ কবিও আর দেখা যায় নি।

রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কবির অভাব ছিল না—তাঁদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছেন ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস। তাঁর কবিতায় সুতীব্র ভাবাবেগের সঙ্গে বল্গাহীন অসঙ্কোচে অন্তরকে উজাড় করে দেবার অনায়াসতা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। বাছাই করা ভাব ও শব্দ নিয়ে ভদ্র, পরিচ্ছন্ন ও সংহত রীতির কবিতা রচনা তাঁর ধাতুতে ছিল না। সেই জন্যেই তিনি এমন সমস্ত উজ্জ্বল পংক্তি নিয়ে এত অবাধে খেলা করে গেছেন—

আয় বালিকা খেলবি যদি এ এক নূতন খেলা!
তোমার সঙ্গে গেলে ছাই,
সকাল আসতে ভুল হয়ে যায়,
ভয়ে মরি ফিরতে একা, সবুজ সন্ধ্যে বেলা।
চুপ চুপ চুপ, কসনে কারেও, এ এক নূতন খেলা।

নয়ত—

তরুলতা ঘুম যায়, ঘুম যায় ফুল,
পল্লবের কোলে কোলে ঘুমায় মুকুল।
আকাশে হেলান দিয়া ঘুমায় পর্ব্বত,
সম্মুখে সমুদ্র পাতা মহাশয্যাবৎ।

নিরাশার নিষ্পেষিত মহামরুভূমে,
কত বক্ষ অস্থি-চূর্ণ আছে ঘোর ঘুমে।
ঘাসে ঘাসে ঘুম যায় কত অশ্রুজল,
সৈকতে শোকের শ্বাস ঘুমেতে বিহ্বল।
দিকবদ্ধ শ্যাম মাঠ, অনিবদ্ধ নীবি,
স্খলিত অঞ্চল অঙ্গে ঘুমায় পৃথিবী।

সংযম এবং মাত্রা-জ্ঞানের অভাবে তাঁর কবিতা শিষ্ট হয় নি বলে অবশ্য আমার কোন ক্ষোভ নেই। কবি লেখাপড়া শিখতে পান নি, সাংসারিক জীবনে শান্তি লাভ করেন নি, তথাকথিত ভদ্রসমাজে ভালো ভাবে মিশবার সুবিধা লাভ করেন নি, তাই তাঁর অন্তরের native সুরটা অক্ষুণ্ণ থাকতে পেরেছিল এবং কোন snobbery বা কৃত্রিমতার দ্বারাও তা আক্রান্ত হয়নি। কিন্তু অন্য দিক থেকে একটা বিপদও ঘটেছিল—ব্যক্তিগত জীবনের বিষাক্ত বাস্তবতা কবিকে এত বেশী অভিভূত করেছিল যে তাঁর সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিই কেমন একটা অসুস্থ আতিশয্যে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁর রচনায় স্বতস্ফূর্ত্ত বাস্তবতার সঙ্গে সহজ প্রশান্তি নেই, সে ভালোই—কিন্তু বিদ্রোহের সঙ্গে বিকৃতির সংযোগ হয়েছে বলেই বোধ হয় তিনি এত বড় কবি হয়েও জনপ্রিয় হতে পারেন নি।

অক্ষয় বড়ালে ভাবের ঐশ্বর্য্য, এবং ভাষার শুচিতা অসাধারণ। কিন্তু তাঁর লেখায় আবেগের উত্তপ্ততা নেই, অনেকটা টেনিসনের মতো। এটাকে সংযম বলে ভুল করলে চলবে না। ভেতরকার প্রাণ-স্পন্দন যদি সত্যি জাতের হয়, তাহলে তাকে যত পরিচ্ছন্ন ভাষা দিয়েই বাঁধা যাক, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তা ভাষার বাঁধ ছাপিয়ে বাইরে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়বেই এবং সেই ভাবে-ভাষায় টলোমলো অবস্থাই হচ্ছে প্রাণবন্ত লিরিকের

বিশেষত্ব। এই বিশেষত্ব গোবিন্দ দাসে পরিস্ফুট। অক্ষয় বড়াল হলেন প্রৌঢ়তার কবি, তাঁর ভেতরটাই জুড়ানো। তাই তাঁতে সেই স্নিগ্ধতা দেখা যায়, যা বার্দ্ধক্যের পাণ্ডুরতারই পূর্ব্বাভায স্বরূপ। গোবিন্দদাস হলেন বে-পরোয়া যৌবনের কবি—স্থৈর্য্য, শান্তি, এ সবের তিনি ধারও ধারেন না। তাঁর লাইনে লাইনে অশান্ত রক্তের উন্মাদ নৃত্য! পত্নী বিয়োগে ব্যথিত হয়ে উভয়েই কবিতা লিখেছেন—কিন্তু অক্ষয় বড়ালের 'এষা' এবং গোবিন্দদাসের 'কস্তুরী'র সনেটগুলি পাশাপাশি রেখে পড়লেই বোঝা যায়, দু'জনে তফাৎটা কোথায়। তাই বলে অবশ্য অক্ষয় বড়ালও ফেলনা কবি নন, রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর স্বাতন্ত্র্য অনুপেক্ষনীয়। একটু তুলেই দেখাই—

এসো এ হৃদয়ে মম, অস্ফুট চন্দ্রিকা সম,
এসো প্রেমে, স্নিগ্ধ করুণায়—
ঢেকে দাও সব ব্যথা, অসমতা অক্ষমতা,
ছড়ায়ে জড়ায়ে মমতায়।
লয়ে প্রেম সুধা হাসি; এসো দেবী এসো দাসী,
এসো সখী, এসো প্রাণপ্রিয়া,
সব সুখ-দুঃখ ঘুরে, জন্ম-মৃত্যু ভেঙে চুরে,
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ব্যাপিয়া।

অক্ষয় বড়ালের রচনার এই শান্তশুচিতা ও মানুষীভাবের সহজ অভিব্যক্তি সকলেরই ভালো লাগবার কথা। বিহারীলালের মন্ত্রশিষ্য হয়েও রচনাভঙ্গীতে তিনি খানিকটা ক্ল্যাসিকাল—আবার রবীন্দ্রনাথ থেকেও এইখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য। প্রিয়াকে তিনি বিশ্ব-মানবী বা আদর্শ-নারীত্ব রূপে দেখেন নি—দেখতেই পারেন নি। এষা কাব্যের সূচনায় তিনি বলেছেন, 'মানবীর তরে কাঁদি, চাহিনা দেবতা', এবং

এই প্রিয়ার লোকান্তর প্রাপ্তিতে তিনি মৃত্যুর নির্ব্বিশেষ রূপ দেখেন নি, তার মাধুর্য্যও অনুভব করেন নি। তিনি ভেবেছেন—

পতি নাই, পুত্র নাই, অতি অসহায়,
সকল বন্ধন ছিঁড়ে, পাগলিনী কোথা ফিরে,
অনলে অনিলে শূন্যে, কোথায় কোথায়!

পদ্মাতীরে বেল কাঠ মাথায় চিতা-শয্যায় শায়িতা প্রিয়ার স্মৃতিতে উদ্‌ভ্রান্ত গোবিন্দদাসের উচ্ছ্বসিত কান্না এ নয়, আবার মৃত্যু-মহোৎসবের ভেতর দিয়ে চিরন্তন অমরত্বে অভিষিক্তা প্রিয়ার স্মৃতিতে আশ্বস্ত রবীন্দ্রনাথের নৈর্ব্যক্তিক তাত্ত্বিকতাও এ নয়, এ হল সেই সুগভীর বেদনার অভিব্যক্তি, যা আপামর সাধারণের নিত্যকার অনুভূতি।

এর পরই উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দেবেন্দ্রনাথ সেন। দেবেন্দ্রনাথ সেনে গোবিন্দদাসের বাঁধন-ছেঁড়া ভাবোন্মত্ততা নেই, অক্ষয় বড়ালের সমাহিত স্নিগ্ধতা নেই, তার স্থানে আছে প্রবীণতার প্রসন্ন পীতাভা—তাঁর কবিতা উচ্ছ্বাসপ্রধান ঠিকই, কিন্তু সে উচ্ছ্বাস উদ্বেল নয়, বিহ্বল এবং বিশীর্ণ। বাস্তবিক পক্ষে তাঁকে বলা যেতে পারে, সত্যিকার বার্দ্ধক্যের কবি। এই বার্দ্ধক্যের ছোঁয়া তাঁর কাব্যে এমন একটি ভক্তিপ্রবণতার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, যা বৃদ্ধদেরই ভালো লাগে। গোবিন্দদাসের মতো অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যে শব্দের পর শব্দ নিয়ে ছিনিমিনি খেলার সহজ অজস্রতা তাঁতে দুর্লভ। অক্ষয় বড়ালের মতো শব্দ-প্রয়োগের জহুরীপণাও তাঁর শক্তির বাইরে। তাঁর ভাষা শ্লথ, প্রয়োগ অনেক স্থানেই অসিদ্ধ এবং তাঁর কাব্যে অব্যাহত সঙ্গতিও সুলভ নয়। এটা অবশ্যই একটু বিস্ময়ের বিষয়! দেবেন্দ্রনাথ সেনের অন্তরে একটা বড় কবিই ছিল, কিন্তু হাতে ছিল একটা চলনসই কবির ভাষা। তা সত্ত্বেও তাঁর উপমার কায়দা, উক্তির স্বচ্ছতা এবং অনুভূতির নিবিড়তা

মনকে স্পর্শ করে এবং সেই জন্যেই রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁকে আমরা একজন বিশিষ্ট শ্রেণীর কবি বলে মনে করি। দেবেন্দ্রনাথকে 'সোনার তরী' উৎসর্গ করে রবীন্দ্রনাথও আমাদের এই সিদ্ধান্তকেই অনুমোদন করেছেন।

অপূর্ব্ব রূপসী মরি, তোমার মুখর চাহনিতে
থাকে সুপ্ত হৃদয়ের কথা—
প্রথম ফাল্গুনে যথা থাকে চাপা চাঁপার কলিতে
বসন্তের পূর্ণ মাদকতা!
বাল বিধবার যথা অতি মৃদু মলিন হাসিতে
ঝরে পড়ে ঘোর আকুলতা,
শেফালী ইঙ্গিতে যথা বলি যায় ঝরিতে ঝরিতে
আপনার সৌরভ বারতা!

সুন্দর নয় কি? এই রকম সুন্দর পঙ্‌ক্তি দেবেন্দ্র সেনের কবিতায় রাশি রাশি পাওয়া যাবে। ঠিক এমনি সুন্দর—

মুক্ত মেঘ বাতায়নে বসি,
এলোকেশী কে ঐ রূপসী,
জল-যন্ত্র ঘুরায়ে ঘুরায়ে
জলরাশি দিতেছে ছড়ায়ে।
... ...
নীলবর্ণ শাড়ীখানি পরি
অপূর্ব্ব মল্লার রাগ ধরেছে সুন্দরী,
স্রস্ত কেশদাম হতে বেলফুল চৌদিকে ঝরিছে,
কালোরূপ ফাটিয়া পড়িছে,
যাই বলিহারী!



আর দেবেন সেনের কতকগুলি সনেটও চমৎকার। বাংলা ভাষায় সনেটের প্রবর্ত্তন করেন মাইকেল—তাঁর পর রবীন্দ্রনাথ, গোবিন্দদাস, চিত্তরঞ্জন, অনেকেই অল্পবিস্তর সনেট লিখেছেন, কিন্তু খাঁটি ইটালীয়ান ঢঙে Octave এবং Sestette বজায় রেখে লম্বিত পর্ব্বের সনেট প্রথম দেবেন সেনই লিখেছেন—আর তাঁর পর লিখেছেন মোহিতলাল মজুমদার, অজিত দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বর্ত্তমান লেখক এবং আরো কোন কোন আধুনিক কবি। দেবেন সেনের সনেটগুলির মধ্যে 'নয়নে নয়নে কথা ভালো নাহি লাগে', 'চাহিনা আনার যেন অভিমানে ক্রুর' প্রভৃতি যে কোন কাব্যরসিকেরই ভালো লাগবার মতো। 'ডায়মণ্ডকাটা মল', 'বিধবার আরসি' প্রভৃতি যাচ্ছেতাই কবিতাগুলোকে তাঁর কবি-কীর্ত্তির নিদর্শন রূপে খাড়া করে না রেখে, এই সনেটগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে কাজের কাজ হয়। কিন্তু এদেশে সে মেহনৎ করে কে? তাই দেবেন সেনের 'তবু ভরিল না চিত্ত' শীর্ষক একটি মাত্র কবিতাকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নানা বইয়ে চালানো হয়, আর মনে করা হয়, তার দ্বারাই কবির প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা প্রকাশ করা হচ্ছে!

গোবিন্দচন্দ্র দাস, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন, এই তিনজন কবির কাব্য-ধর্ম্ম নিয়ে আমি সংক্ষেপে একটু আলোচনা করলাম—এর বেশী করার অবকাশ উপস্থিত নেই। প্রথমের 'কুঙ্কুম', 'কস্তুরী', 'বৈজয়ন্তী', 'ফুলরেণু', দ্বিতীয়ের 'শঙ্খ', 'এষা', 'কনকাঞ্জলি', 'প্রদীপ', তৃতীয়ের 'অশোক গুচ্ছ', 'গোলাপ গুচ্ছ', 'শেফালী গুচ্ছ', 'অপূর্ব্ব নৈবেদ্য' প্রভৃতি রবীন্দ্র সমসাময়িক কবিতা-সংগ্রহ গুলির বিস্তৃততর আলোচনা প্রয়োজন। এদেশের রসিকজন সেদিকে মনোনিবেশ করেন নি, তাই

এই সমস্ত বই আজ বিলুপ্ত প্রায়, বাজারে এদের সাক্ষাৎ মেলে না, মেলে কদাচিৎ ফুটপাথে ফেরীওয়ালার হাতে।

এই তিনজনের পর আসেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম শ্রেণীর কবি তাতে আর সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর বেশীর ভাগ শক্তিই নিয়োজিত হয়েছিল নাটক, গান এবং হাসির গান রচনায়, যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো। 'মন্দ্র', 'আলেখ্য', 'ত্রিবেণী' প্রভৃতি বইয়ে তাঁর যে লিরিক কবিতাগুলো সংগৃহীত হয়েছে, তার ভেতর ভালো কবিতার অভাব নেই, কিন্তু হীরের টুকরোর মতো কবিতা একটিও নেই। গম্ভীরের সঙ্গে তরল সুরের মিশেল দিয়ে, তিনি এক ধরণের রসসৃষ্টি করতে চাইতেন, যা আজকের দিনে কেমন বিসদৃশ ঠেকে! এছাড়া নূতন ছন্দ-প্রবর্ত্তনের নামে তাঁর কবিতায় যে রকম পদে পদে যতির ক্রম-ভঙ্গ দেখা যায়, তাও অসহ্য মনে হয়। গানে এবং হাসির গানে যাঁর অমন তৈরী হাত, শব্দ-যোজনায়, ছন্দ লালিত্যে, প্রকাশ বৈচিত্র্যে যার তুলনাই হয় না আর কারুর সঙ্গে, লিরিক কবিতায় তাঁর এই ব্যর্থতা কেন, ভেবে অবাক হতে হয়। অবশ্য একথা ঠিক যে রবীন্দ্রনাথ যে মুক্ত-ছন্দ (Vers libre) 'বলাকা'য় প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন, ভাঙাচোরা ভাবে তার প্রাথমিক আভাষ দ্বিজেন্দ্রলালই দিয়েছিলেন, এই সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে। যেমন,

এসেছো তুমি,
বসন্তের মতো স্নিগ্ধ,

কভু ভাবি মনে, তুমি নহ শীত ধরণীর।



কোন সূর্য্যালোকে হতে খসা,
নন্দন কিরণে
লালিত ললিত এক অমর স্বপন!

দ্বিজেন্দ্রলালের 'ঘুমন্ত শিশু', 'হাসি ও অশ্রু', 'সমুদ্র', 'বাইরণের প্রতি', ইত্যাদি কবিতা বা পত্নী-বিয়োগের কবিতাগুলো বার বার চেষ্টা করেও পড়া যায় না। অন্তঃসারহীন বাক্যের বুদ্বুদ ছাড়া সেগুলো আর কিছুই নয়। আশ্চর্য্যের বিষয়, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত এক সময় এদের উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন!

[৯]

রবীন্দ্র সমসাময়িক কবিদের মধ্যে 'সাহিত্য' পত্রিকার নিয়মিত লেখক নিত্যকৃষ্ণ বসু, অক্ষয়কুমার চৌধুরী, 'অবসর' কাব্য রচয়িতা বরদাচরণ মিত্র, 'বেলা', 'পরিমল' প্রভৃতির কবি গিরিজানাথ মুখোপাধ্যায়, 'মন্দির' কাব্যের লেখক কিরণচাঁদ দরবেশ, 'যজ্ঞ ভস্ম' রচয়িতা বিজয়চন্দ্র মজুমদার ইত্যাদির কবিতায় বেশ একটু স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'প্রতিধ্বনি' বা রজনীকান্ত সেনের 'বাণী' 'কল্যাণী'কেও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। রজনীকান্ত সম্পর্কে আমরা গানের প্রসঙ্গে আলোচনা করবো। অপরাপর কবিদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের 'ধুতুরা ফুল', 'অন্ধকার', বরদা মিত্রের 'আলোক', 'অন্ধকার', 'সুপ্তোত্থিতা,' দরবেশের 'উর্ব্বশী ও পুরূরবা', গিরিজানাথের 'মধ্যাহ্ন', 'হে মরণ', বিজয়চন্দ্রের 'লক্ষ্য পথে' প্রভৃতি কবিতা, রবীন্দ্রনাথের কবিতার পাশে আজ যথেষ্ট নিষ্প্রভ দেখায় সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের প্রভাব দেশের সাহিত্যে সর্ব্বাঙ্গীনভাবে বিস্তার লাভ করবার আগেই এদের

জন্ম—এরা রবীন্দ্রনাথের সহ-জ বা অনুজ, আত্মজ কেউ নন। সে হিসাবে এঁদের কারুকেই উপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। নিত্যকৃষ্ণ বসু এবং অক্ষয় চৌধুরীকে, বিশেষতঃ প্রথমকে আমার ত খুব বড় কবি বলেই মনে হয়। প্রথমের 'জীর্ণ তরু' বা 'আমারি এ ভুল' প্রভৃতি কবিতা কতকাল আগে সাহিত্যের পৃষ্ঠায় পড়েছি—আজো মনে তাদের রেশ রয়েছে। অক্ষয় চৌধুরীর—

ডাগর ডাগর ফুটেছে টগর
গোলাপ প্রলাপ বাড়ায় মনে,
কামিনীর ফুল, হেসেই আকুল,
কেতকী কত-কি ছলনা জানে।
আমার হৃদয়, আমারি হৃদয়,
বেচিনি ত তাহা কারুর কাছে,
ভাঙা-চোরা হক, যা হক তা হক,
আমার হৃদয় আমারি আছে!

ইত্যাদি কবিতা এক সময় খুব আদৃত হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, নিত্যকৃষ্ণ বসু বা অক্ষয় চৌধুরীর রচনা কোন দিন মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগৃহীত হল না। নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' বইখানিও আজ বিলুপ্ত, অথচ এই বইটি সমসাময়িক জীবন ও সাহিত্য সম্বন্ধে নানা প্রয়োজনীয় তথ্যে পূর্ণ। প্রিয়নাথ সেন বা বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতাও সুখপাঠ্য, কিন্তু তাঁরা প্রধানতঃ গদ্য লিখিয়ে এবং গদ্যেই তাঁদের শক্তির পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে।

এর পর থেকে রবীন্দ্রধারার অনুসরণই বাংলা কবিতার একমাত্র অবলম্বন হয়ে দাঁড়ালো। এক নিশ্বাসে নাম করে যাওয়া যায়—ভুজঙ্গধর রায় চৌধুরী, রমণী মোহন ঘোষ, জগদিন্দ্রনাথ রায়, প্রমথনাথ

রায় চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ, দেবকুমার রায় চৌধুরী, নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য ইত্যাদি ইত্যাদি। এঁদের রাশীকৃত রচনা রুদ্ধশ্বাস ব্যগ্রতায় মন্থন করে রিক্ত হাতেই ফিরে আসতে হয়। এঁদের ভাষা, ভঙ্গী, বক্তব্য সবই রবীন্দ্রনাথ থেকে আহৃত—কোথাও কবিদের কোন স্বকীয়তার পরিচয় নেই। ভূজঙ্গধরের কয়েকটি বৈষ্ণব পদাবলী, প্রমথ রায়চৌধুরীর 'তাজমহল', চিত্তরঞ্জনের 'সাগর সঙ্গীতে'র দু'চারিটি ছত্র বা 'মালঞ্চে'র কোন কোন সনেট এবং নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের ছেলেদের জন্যে লেখা 'টুকটুকে রামায়ণ' ছাড়া এই পর্য্যায়ের আর কোন রচনারই কোন সাহিত্যিক মূল্য আছে কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রানুসরণ দিনের পর দিন এমন অন্ধভাবেই চলতে আরম্ভ হল যে রবীন্দ্রনাথের শব্দপ্রয়োগ, ছন্দ-বিন্যাস, বিষয় নির্ব্বাচন, বাচন ভঙ্গী, সবই সমসাময়িক কবিদের হাতে প্রচলিত কবি-প্রসিদ্ধির অনুসরণ হয়ে দাঁড়ালো। রবীন্দ্রনাথের মনোধর্ম্ম এবং দৃষ্টি ভঙ্গীতে যা এসেছিল স্বাভাবিক ভাবে, এঁদের হাত দিয়ে তাই এলো অনুকরণ রূপে, তার ফলে রবীন্দ্রোত্তর কবিতা থেকে কবির ব্যক্তি-স্বরূপই গেল অন্তর্হিত হয়ে এবং অসার শব্দ-লীলাই হয়ে দাঁড়ালো কবিতা রচনার একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ বাংলা লিরিক কবিতা একটা জীবন-সম্পর্কহীন ফাঁকিকে কেন্দ্র করে দিনের পর দিন বৃথা আবর্ত্তিত হতে লাগলো। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ কবিদের হাত দিয়ে প্রতিক্রিয়া সুরু না হওয়া পর্য্যন্ত এই অবস্থা অপরিবর্ত্তিত রইলো।

রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে কয়েকজন মহিলা কবির এবং কয়েক জন মুসলমান কবির নামও উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'মধ্যাহ্ণ', 'প্রভাত' প্রভৃতি হাল্কা সুরের বর্ণনাত্মক কবিতা বা কয়েকটি গাথা কবিতা পড়তে মন্দ লাগে না। কামিনী রায়ের 'আলো ও ছায়া'য়, গিরিন্দ্র মোহিনীর 'অশ্রুকণা'য়, মানকুমারী বসুর 'কাব্য-কুসুমাঞ্জলি'তে

পারিবারিক দুঃখ-বেদনা, ভগবদ্ভক্তি এবং নৈতিক পবিত্রতা নিয়ে লেখা যে কবিতাগুলো স্থান পেয়েছে, বিগত শতাব্দীর নারী-সমাজের চিন্তাধারা এবং আজকের সঙ্গে তার পার্থক্য বোঝার পক্ষে সেগুলো বিশেষ সহায়ক। এঁদের বা প্রসন্নময়ী দেবীর, তাঁর কন্যা প্রিয়ম্বদা দেবীর, বা প্রমীলা নাগ, ইন্দিরা দেবী প্রভৃতির কবিতা এক সময়ে দেশে বিশেষ আদর পেয়েছিল। এক প্রিয়ম্বদা দেবী ছাড়া, এঁরা সকলেই হেমচন্দ্র, নবীন সেন প্রভৃতিকে আদর্শ নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন। নারী হলেও, এঁদের রচিত কবিতা কোন স্বাতন্ত্র্যের দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে নি, তার কারণ বোধ হয় সেদিনকার নারীর স্বাধীনভাবে নিজের কথা বলারই অধিকার দেশে ছিল না। তাই নকল পুরুষালির আড়ালে আত্মগোপন করে এঁদের কবিতা লিখতে হত। এই মৌলিক দোষেই এঁদের কবিতাগুলো হয়েছে এমন অসার্থক। কায়কোবাদ কবির 'মহাশ্মশান' এবং সৈয়দ হোসেনের 'শিব মন্দির', 'যমজ ভগিনী' প্রভৃতি কাব্য বিস্তৃততর আলোচনার অপেক্ষা রাখে। কিন্তু এগুলিকে আমি পরবর্ত্তী ঐতিহাসিকের জন্যেই রেখে যাবো।

বাংলা কাব্যের যে পর্য্যায়টিকে আধুনিক আখ্যা দেওয়া হয়ে থাকে, তার বয়স এখনো কুড়ি বৎসর অতিক্রম করেনি। সুতরাং বয়সের দিক থেকে তা এখনো যথেষ্ট নূতন এবং যেহেতু নূতন, সেইজন্যেই তার সম্ভাবনীয়তা প্রচুর হলেও, সামর্থ্য সন্দেহাতীত নয়। আধুনিক বাংলা কবিতার সৌন্দর্য্য ও বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে স্বীকৃত হলেও, তার শ্রেষ্ঠতা অসংশয়িতরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে এখনো দেরী আছে। গঠনের অবস্থায় তা হওয়াই স্বাভাবিক।

বাংলা সাহিত্যে গদ্য-পদ্য উভয় দিকেই এখনো যে যুগ চলেছে, তাকে মোটা কথায় রবীন্দ্রযুগ বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের জন্ম

ভিক্টোরিয়ার আমলে—তাঁর সমসাময়িকরা বহু পূর্ব্বেই গত হয়েছেন, সৌভাগ্যবশতঃ তিনি আজো জীবিত আছেন এবং যুগাদর্শের দ্রুত পরীবর্ত্তনশীলতার সঙ্গে একটা আপাত-যোগ রেখেই চলতে চেষ্টা করছেন। তবু স্বভাবধর্ম্মেই তিনি পুরানোপন্থী এবং বর্ত্তমান শতাব্দীর সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য-ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। এই বিচ্ছিন্নতার সুরটা রবীন্দ্রকাব্য থেকে আধুনিক কাব্যে এলে কানে লাগেই। এটা ভালো কি মন্দ, এর মূল্য আছে কি নেই, সে বিচার পরে। কিন্তু এ যুগের কাব্যের প্রাণ-প্রেরণা যে খানিকটা রবীন্দ্র-চক্রের বাইরে থেকে সঞ্জাত, তা স্বীকার না করে উপায় নেই।

[১০]

বিগত কুড়ি বৎসরে পৃথিবীর সাংস্কৃতিক ইতিহাসে বিপুল ওলট-পালট হয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রবাদ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, পরীক্ষামূলক মনস্তত্ত্বের প্রভাব অনতিক্রমনীয় রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে, যন্ত্র-বিজ্ঞানের অবিশ্বাস্য উন্নতি হয়েছে—এসবের ফলে মানুষের রাষ্ট্রে, সমাজে, ব্যবহারিক জীবনে যে সমস্ত বিশ্বাস, চিন্তা এবং সংস্কার এতদিন মর্য্যাদার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়েছে, তা'ও ভেঙেচুরে গেছে। এই বহুমুখী বিক্ষোভের ভেতর দাঁড়িয়ে, মানুষ নির্ব্বিরোধ ভিক্টোরীয় আবহাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেনি—সেই স্বপ্ন মহাযুদ্ধের রূঢ় আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেছে—মানুষ জেগে উঠেছে বাস্তবতার সুতীব্র চেতনা নিয়ে—এ যুগের কবিতায় এই চেতনাই বিশেষভাবে প্রকট।

রবীন্দ্রনাথ যে যুগের প্রভাব পেয়েছিলেন, তাতে ভাব-বিলাসের অবসর ছিল—তাই সৌন্দর্য্য, কল্যাণ ও প্রশান্তির পটভূমিতে তাঁর সাহিত্য গড়ে উঠতে পেরেছিল। এ যুগের কবিরা জন্মলগ্নেই সে

প্রভাবে বঞ্চিত হয়েছেন। কাজেই আজ রবীন্দ্রপ্রদর্শিত পথে, তাঁরই রসাদর্শে, ভাবাত্মক সাহিত্য-সৃষ্টি শুধু অলীক নয়, অসার্থক। এই অসার্থক পথে যদিও এখনো পর্য্যন্ত বহু কবিই লেখনী চালনা করে চলেছেন, তবু এ কথা অসঙ্কোচেই বলা যেতে পারে যে এ চেষ্টা বৃথা। যে দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথের পক্ষে স্বাভাবিক, অনুকারীর পক্ষে তা প্রসিদ্ধির পশ্চাদ্ধাবন বৈ ত নয়! তার সঙ্গে প্রবাহমান জীবন-ধারার যোগ নেই, যোগ নেই পরিবর্ত্তনশীল রসাদর্শের।

কিন্তু প্রতিক্রিয়ার প্রভাবই স্পষ্টতর, এবং এই প্রতিক্রিয়া অতি-আধুনিক যুগে বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যলাভ করলেও, রবীন্দ্র-সমকালীন কবিদের কারুর কারুর হাতেই এর ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের ছন্দ-বৈচিত্র্য, যতীন্দ্রমোহন বাগচীর গার্হস্থ্য প্রসন্নতা, কুমুদ রঞ্জন মল্লিকের পল্লীপ্রীতি, করুণানিধান বন্দ্যো-পাধ্যায়ের স্বপ্ন-বিহ্বলতা, কালিদাস রায়ের ক্ল্যাসিকাল গাম্ভীর্য্য, হেমেন্দ্রকুমার রায় ও কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের শব্দ-চটুলতা একদিকে যেমন রবীন্দ্র-সুরের অনুরণনে মুখর, অন্য দিকে তেমনি নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তনে উন্মুখ। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা অব্যবহিত পরবর্ত্তী কয়েকজন কবির মধ্যে দিয়ে স্বচ্ছন্দতর বলিষ্ঠতর রূপে প্রতিভাত হল। মোহিতলাল মজুমদারের দেহাত্ম-বাদ, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের দুঃখবাদ এবং নজরুল ইসলামের বিদ্রোহিতা কাব্য-দৃষ্টির বিচারে যেমন অনেকাংশে রবিপ্রভাব মুক্ত, ভাষা-বিন্যাসের দিক থেকেও তেমনি অনেকখানি নিজস্বতার পরিচায়ক। এঁদের সমসাময়িক সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, হেমেন্দ্রলাল রায়, গোলাম মোস্তাফা প্রমুখ কবির নামও এই সঙ্গে উল্লেখের যোগ্য। সত্যিকার আধুনিক কবিতার সূত্রপাত এইখানে—যদিও যে ধারা,

ধরণ এবং আদর্শ আজকের কবিতায় আধুনিক আখ্যা লাভ করছে, এই সকল কবির হিসাবে তাও যথেষ্ট অর্ব্বাচীন।

কিন্তু আধুনিক কাব্যের মোটামুটি লক্ষ্য এবং লক্ষণ কি, এ প্রশ্ন স্বভাবতঃই উঠতে পারে। এক কথায় এর উত্তর দেয়াও সহজ নয়। তবে কয়েকটা মোটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে, যা এর গোত্র-নির্ণয়ের পক্ষে হয়ত সহায়ক হবে। আধুনিক কাব্য বিষয়-বস্তুর দিক থেকে অনভিজাত—কাজেই তাতে কলকারখানা, বস্তি, মুটে, মজুর, খুনী, মাতাল, সবাই এবং সব কিছুই অসঙ্কোচ অধিকারে প্রবেশ লাভ করেছে, পক্ষান্তরে ফুল, ফল, পাখী, চাঁদ, দক্ষিণা বাতাসের প্রভুত্ব তা থেকে কমে এসেছে। অর্থাৎ কাব্যের ভিত্তিভূমি এখন আর ততটা ভাবাত্মক নয়, যতটা অ-ভাবাত্মক—এই বনিয়াদের ওপর যার স্থিতি, স্বভাবধর্ম্মেই তা থেকে বাস্তবাতীত দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রভাব হ্রাস হয়ে এসেছে। তাই আধুনিক কবি যখন দেশাত্মবোধ প্রচার করেছেন, তখন তা রাষ্ট্রিক বিদ্রোহ হয়ে দাঁড়িয়েছে, যখন গেয়েছেন প্রেম-সঙ্গীত, তখন তা হয়ে পড়েছে দৈহিক চরিতার্থতার দাবী! দেহ এবং মন ও তাদের আনুষঙ্গিক দাবী-দাওয়া রবীন্দ্র-সাহিত্যে প্রচ্ছন্ন—সেগুলির ওপর ভাবসত্তার আরোপ করে, কতকাংশে তাদের নৈর্ব্যক্তিক ও অপার্থিব করে অঙ্কিত করাই রবীন্দ্র-রীতির লক্ষ্য। আধুনিক কাব্যের লক্ষ্য কিন্তু প্রত্যক্ষানুগামী—তাই তাতে স্নায়ুমণ্ডলের অধিগম্যতা অধিক। প্রতিক্রিয়া যুগের যে প্রথম তিনজনের উল্লেখ করেছি, তাঁরা এবং তাঁদের পরবর্ত্তীয়দের মধ্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জীবনানন্দ দাশ, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, এই নূতন সুরকে অধিকতর স্পষ্টতা দিয়েছেন। অজিতকুমার দত্ত, হেমচন্দ্র বাগচী, অন্নদাশঙ্কর রায়, হুমায়ুন কবীর, রাধারাণী দেবী, উমা দেবী প্রধানতঃ

রবীন্দ্র-রীতিকেই অনুসরণ করেছেন, তবু তাঁরাও কিছু পরিমাণে যুগাদর্শকে মানতে বাধ্য হয়েছেন। তাই তাঁদের রচনাতে পুরাতন ও নবীন উভয়বিধ রীতির মধ্যে একটা আপোষ-রফা দেখা যায়।

এই হল আধুনিক কাব্যের প্রথম পর্ব্ব। জসীমউদ্দীনের গ্রাম্য সরলতা, অপরাজিতা দেবীর অর্দ্ধ-নাটকীয় সহুরে চটক, বনফুল বা সজনীকান্ত দাসের রঙ্গ ও ব্যঙ্গের কখনো-সিধে কখনো-বাঁকা কারিকুরি, আধুনিক কাব্যে কিছু বৈচিত্র্য এনেছে এবং তাও এই পর্ব্বেরই অন্তর্গত—কিন্তু কাব্যাংশে এঁদের দাবী সবিশেষ কিনা সন্দেহ। স্থকুমার সরকার, নীলিমা দাস, প্রণব রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বা বর্ত্তমান লেখক পড়েন আধুনিক কাব্যের সমসাময়িক পর্ব্বে। এই পর্ব্ব অগ্রগামিতায় আরো খানিকটা উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কাব্যের স্বাভাবিক প্রবণতা এ পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার প্রত্যাশিত ঐতিহ্যকে এক হিসাবে এড়িয়ে যেতে পারেনি—রীতি ও শব্দ-যোজনার দিক থেকে তাতে পুরাতনের অনুবৃত্তিই চলে এসেছে যার ফলে প্রকারে নূতন হয়েও, আকারে তা খুব বেশী নূতন হতে পারেনি। তারপর তা যেদিকে মুখ ফিরিয়েছে, তা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে—এখনো কোন নিশ্চিত পরিণতিতে আসা সম্ভব হয়নি। এঁদের রচনা নিয়ে আধুনিক মহলে বহু বক্তব্যের আড়ম্বর দেখা গিয়ে থাকে, কিন্তু শিল্পস্থষ্টি এবং রস বোধের সমুদয় নিরিখকেই এঁরা পরিহার করেছেন, এঁদের কাব্য-রীতি তাই আজো প্রশ্নাতীত হতে পারে নি, যদিও অপ্রবুদ্ধ উৎসাহে অনেকেই এই নূতন পদ্ধতির নকল স্থরু করে দিয়েছেন! এঁরা এখনো বিশেষ নবীন, তাই এঁদের শক্তি-সামর্থ্য সম্বন্ধে নিন্দার বা প্রশংসার অত্যুক্তি না করে, আমরা শুধু

এইটুকুই আশা করে রাখি যে এঁদের এবং এঁদের সমদর্শীয়দের হাতে আধুনিক কাব্য একটা স্বচ্ছন্দতর পরিণতিতে গিয়ে পৌঁছুক। অবচেতনার কিংবা বামপন্থার নাম করে গদ্যে-পদ্যে যে অর্থহীন অবোধ্যতা ইদানীং ইউরোপ-আমেরিকার কোন কোন কবির অনুকরণে বাংলা দেশে আমদানি হচ্ছে, তা অসুস্থ এবং মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির ওপর তা একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ! এ আধুনিকতা আধুনিক কালের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য থেকে জন্মায় নি, জন্মেছে নূতন কিছু করার মোহ থেকে। এই মোহ কাটাতে পারলেই কবিরা সত্যিকার আধুনিক কবিতা লিখতে পারবেন। বলা বাহুল্য, অতি-আধুনিক কবিদের মধ্যে কারুর কারুর রচনায় সেরকম প্রতিশ্রুতিও পাচ্ছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

গান

[এই বইয়ের প্রথম খণ্ডে আমরা বহু শাখায় বিভক্ত প্রাচীন গীতি সাহিত্যের আলোচনা করেছি এবং তাতে দেখিয়েছি যে এক-একটা ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের আওতায় তাদের এক-একটি শাখার উদ্ভব ও অনুশীলন হয়েছে। সেই সঙ্গে একথাও আমরা বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে লৌকিক সুখ-দুঃখ মিলন-বিরহকে আনুষ্ঠানিক উপধর্ম্মের রূপকে আড়াল করে প্রকাশ করাই ছিল তখনকার রীতি। কিন্তু শিক্ষিত ও Orthodox সমাজের বাইরে জনসাধারণের ভেতর যে সব গান জন্মেছে, বাউল, ভাটিয়াল, মুর্শিদা প্রভৃতি পল্লী সঙ্গীত, তাতে এই বর্ণাশ্রমের আঁটুনি ও প্রচলিত প্রসিদ্ধির অনুসরণ দেখা যায় না। রচনা পদ্ধতিতেও সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের বাঁধা বুলি আবৃত্তি করার চিহ্ন নেই এই সব গানে। অবশ্য Orthodox পক্ষের সাহিত্যেও শেষাশেষি মানবিক প্রেমকে স্বীকার করে নেবার একটা প্রয়াস এসেছিল, রাম বসু, নিধুবাবু ইত্যাদিতে, কিন্তু তা পূর্ণতা লাভ করে নি। তার কারণ তখনকার কবিদের সামনেও ছক ছিল উপ-ধর্ম্মাত্মক সাহিত্যের। ইংরেজী আমলে দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও জীবন-নীতি যখন আমূল পরিবর্ত্তিত হয়ে গেল, তখন দেশের সাহিত্যাদর্শও প্রাচীন সাহিত্যের শুষ্করসকে অস্বীকার করে, বৈদেশিক অনুপ্রেরণায় রূপান্তরিত হয়ে গেল। এযুগের গীত-সাহিত্যে এই যুগধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। পৌত্তলিক ধর্ম্ম সঙ্গীতের স্থানে এযুগে এলো একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম সঙ্গীত, দেবদেবী সঙ্গীতের স্থানে এলো স্বদেশী সঙ্গীত, প্রকৃতি ও মানব মনের যোগাযোগকে কেন্দ্র করে এলো অতীন্দ্রিয় ভাব-সঙ্গীত। এছাড়া এলো কৌতুক সঙ্গীত, নৃত্যসঙ্গীত, আরো রকমারী গান। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে নিজেদের ধর্ম্ম ও সমাজকে সংস্কার করার চেতনা দেশে এসেছিল, ব্রাহ্মধর্ম্মে তারি কতকাংশ প্রকাশ লাভ করে, কতকটা বা প্রকাশ পায় স্বদেশী আন্দোলনে। প্রত্যক্ষ জীবনের এই অবস্থান্তর নবযুগের সাহিত্যকে নূতন রূপে অভিষিক্ত করলো। এযুগের গানেও

তারি একটি দিকের প্রকাশ হয়েছিল। রামমোহন রায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী, মনোমোহন বসু, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, বহু কবির সম্মিলিত দানে আধুনিক বাংলা গানের ইতিহাস সমৃদ্ধ হয়েছে। এঁদের পরও এর ধারা অব্যাহত বেগে চলেছে, তার মধ্যে নজরুল ইসলাম ও অতুলপ্রসাদ নিজস্বতার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের স্বদেশী গান, দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান, রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান এবং নজরুল ইসলামের গজল গান ঘরে ঘরে প্রচার লাভ করেছে। আজকের গীতিকারদের ওপর এঁদের, বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের, প্রভাব অসাধারণ। দ্বিজেন্দ্রলাল বাংলা গানে প্রথম ইংরেজী সুর সংযোজন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত করেছেন নানা মিশ্রসুর। দেশী কার্ত্তন ও বাউল এবং ক্ল্যাসিকাল সুরের সঙ্গেই তিনি বিদেশী সুরও এনেছেন প্রচুর। আজকের বাংলা গান এখনো আবর্ত্তিত হচ্ছে প্রধানতঃ রবীন্দ্র সঙ্গীতকে কেন্দ্র করেই।]

[১]

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে বৈষ্ণব পদাবলী, শ্যামা সঙ্গীত, উমা সঙ্গীত, টপ্পা গান, কবিগান ইত্যাদি Orthodox পর্য্যায়ের সাহিত্যই হক, আর সারী, জারী, মুর্শিদা, ভাটিয়াল, বাউল প্রভৃতি গ্রাম্য পর্য্যায়ের সাহিত্যই হক, সবই প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ গান। এমন কি, মঙ্গলকাব্য, চৈতন্য চরিত এবং পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা পর্য্যন্ত আসরে গাইবার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল। তাই বলা যেতে পারে যে বৌদ্ধ গান ও দোঁহার আমল থেকে সুরু করে একেবারে ঈশ্বর গুপ্ত পর্য্যন্ত, আট ন'শ বৎসর ধরে বাংলা সাহিত্যে শুধু গানেরই একাধিপত্য চলে এসেছে। আর এই সব গান বৌদ্ধ, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বিভিন্ন ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রেরণা থেকে জন্মেছে।

শিক্ষিত এবং অভিজাত সমাজের বাইরে যে অলিখিত সাহিত্য শাখাটি চিরদিনই থেকেছে উপেক্ষিত, তার ভেতর এই উপ-ধর্ম্মের

উপদ্রব নেই এবং সেই জন্যেই তা তথাকথিত শিষ্ট সাহিত্য থেকে অনেক দিকেই স্বতন্ত্র হয়ে পড়েছে। আগেই বলেছি, নিধুবাবু, শ্রীধর কথক, রাম বসু, হরু ঠাকুর ইত্যাদির হাত দিয়ে লৌকিক প্রেমসঙ্গীতের সূচনা হয়েছিল, কিন্তু তাঁদের রচনাও প্রচলিত সাহিত্যিক প্রসিদ্ধিকে এক হিসাবে অতিক্রম করে যেতে পারেনি—তাই প্রেমসঙ্গীতে তাঁরা কৃষ্ণ-লীলা-সঙ্গীতের ছককেই অনুসরণ করেছেন্। বিষয় ও বিন্যাস কোন দিকেই তাই তাঁদের গানে পূর্ণ প্রাণের অজস্রতা দেখা যায় না। কিন্তু তথাকথিত আভিজাত্য ও কেতাব-কৌলীন্যের আড়ালে নিরক্ষর পল্লীবাসীর প্রাণ থেকে যে গান উৎসারিত হয়েছে, তাতে নেই উপ-ধর্ম্মের বালাই, নেই অভ্যস্ত ঐতিহ্যের ওপর অন্ধভাবে দাগা বুলাবার চেষ্টা। বাস্তব সংসারের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার অনুভূতিগুলিকে সরল অকপট ভাষায় তাঁরা ব্যক্ত করে গেছেন, ঔজ্জ্বল্যে, আন্তরিকতায়, আর প্রকাশের সাবলীলতায় যা বাংলা সাহিত্যে অতুলনীয়।

ময়মনসিংহ গীতিকা, ছেলে ভুলানো ছড়া, বারব্রতের ছড়া, বাউল গান ইত্যাদির আলোচনাকালেই আমরা দেখিয়েছি যে শিক্ষিত সমাজের বাইরে, অনভিজাত অকুলীনদের আসরে জন্মানো সাহিত্যে যে অনায়াস স্বচ্ছতার ও অবাধ রসার্দ্রতার বিকাশ হয়েছে, বহু বিখ্যাত মঙ্গলকাব্যে বা বৈষ্ণব গানে বা শ্যামা সঙ্গীতে তার অর্দ্ধেকও হতে পারেনি। এর কারণটাও অবশ্য স্পষ্ট। এদেশে শিক্ষিত সমাজ বলতে যাঁদের বোঝাতো, তাঁরা ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ন্যায় ও পুরাণেতিহাসের প্রাচীর দিয়ে দৃষ্টিকে এমন ভাবেই আটকে রেখেছিলেন যে অন্ধ আচার-অনুষ্ঠান ও জীর্ণ সংস্কারের মুখোস খুলে সাদা চোখে জীবনের দিকে তাকানোই তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কিন্তু এ বালাই যাঁদের ছিল না, সেই সরল-বুদ্ধি গ্রাম্যকবিরা জীবনের সজীব সুরার আস্বাদ

পেয়েছিলেন, তাই তাঁরা যখন সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন, তখন আপনা থেকেই তা বর্ণাশ্রমিকতার আঁটুনি এড়িয়ে গেছে। (তাঁরা যে সাহিত্য রচনা করছেন, এ ধারণাই হয়ত তাঁদের ছিল না।)

চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, রামপ্রসাদ, কমলা কান্ত, দাশুরায়, মধুকান, বা হরু ঠাকুরের গানে রসের উৎকর্ষ বা অলঙ্কারের বৈশিষ্ট্য নেই, এমন কথা আমি বলিনি। আমি বলছি যে এঁদের রচনার বিষয়বস্তুতে যেমন এক-একটি ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রোপাগ্যাণ্ডা প্রচ্ছন্ন আছে, তেমনি বিন্যাসরীতিতেও আছে এক এক শ্রেণীর গতানুগতিকতা—আর এই পল্লী-সঙ্গীতগুলি হল এক একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সৃষ্টি, সরাসরি হৃদয়ের সঙ্গে এদের সম্বন্ধ, কোন প্রচলিত মতবাদ বা ঐতিহ্যের অন্তর্ভুক্ত হিসাবে এদের অস্তিত্ব নয়। ধরুন এই গানটি—

বন্ধু তুমি প্রেম না বাড়াইও,
এই না প্রেমের কিবা স্বাদ বন্ধু,
কাল না গোঁয়াইও।
বন্ধু হে প্রথম অঙ্কুরকাল সোঙরিয়া কান্দি,
বল গেল, বুদ্ধি গেল, মায়া-জালে বন্দী।
মায়া জাল, বিষম জাল, ছাড়াইতে না পারি,
চটকের বক যেন বন্দী হইয়া মরি!
বন্ধু রে।

নয়ত—

যা রে কুকিলা তুই,
আমার পরাণ গেছে যে দেশে,
অমন করে জ্বালাতন
করিস না রে আর এসে

নয়ত—

সুন্দরী ভালা নায়র পাঠাইলাম।
তারে পাসরিয়া রৈলি মোরে
পাষাণে বান্ধিয়া তোর প্রাণ।
সাধুরে তোর দেশে আর না যাইমু,
খালের জল আর না খাইমু,
ভাঙা ঘরে না দিমু নয়ান!
সুন্দরী গো নয়া দীঘি কাটাইছি,
নয়া ঘর বানাইছি,
ঘরের কোণে তরী-তরকারির বাগান।

ঠিক এম্নি সুন্দর—

দুখ কইও নিঠুরের কাণে,
পরাণ সইরে!
সই গো সই,
যে কালের পীরিতি কৈলাম ভরা নদীর মুখে,
ছাড়বো না ছাড়বো না বলে হাত দিল বুকে!
সই গো সই,
যখন পীরিতি কৈলাম, তুমি আমি জানি,
এখন কেনে সে সব কথা লোকের মুখে শুনি।
দুখ কইও রে!

আর এক টুকরো উদ্ধৃত করেই আমি উদ্ধৃতির পালা শেষ করবো—

কি দুখে যে মন জ্বলে, বলবো তা কেমনে?
বোবার যেন স্বপন দেখা, হয়না প্রকাশ,
থাকে গোপনে।

বলা বাহুল্য, আমি শুধু প্রেম-সঙ্গীতেই আমার আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি। যে অংশগুলো আমি উদ্ধৃত করেছি, পল্লীসঙ্গীতের উৎকৃষ্টতম নিদর্শন বলে সেগুলোকে কখনই মনে করতে পারি না। বাংলার বিভিন্ন জেলায় এর চেয়ে অনেক বেশী ধারালো, সারালো ও জোরালো গান আমি শুনেছি। হাতের কাছে ছিল বলে এগুলো দিয়েই উপস্থিত কাজ চালিয়ে নিলাম। মাঝি-মাল্লাদের, চাষীবাসীদের, পীর-ফকির দরবেশদের, গ্রাম্য মহিলাদের মধ্যে কত বিচিত্র ধরণের গান প্রচলিত আছে—মুর্শিদা গান, ভাটিয়াল গান, গম্ভীরা গান, জাগ গান, হাপু গান, নানা নামের ও নানা ধরণের পল্লী-সঙ্গীত আছে, যার অতি সামান্যই সংগৃহীত ও সম্পাদিত হয়ে শিক্ষিত সমাজের হাতে পৌঁছেছে।

এই গানগুলোর আলোচনা থেকে একটা জিনিষ আমার চোখে স্পষ্ট হয়েছে। বাংলার Orthodox সাহিত্য প্রধানতঃ হিন্দুর সৃষ্টি, কিন্তু পল্লীসাহিত্য হিন্দু-মুসলমান উভয়ের দানেই সমৃদ্ধ এবং সব চেয়ে বড় কথা, তার ভেতর প্রায় কোথাওই সাম্প্রদায়িকতার রূপ নেই, যা আছে অভিজাত সাহিত্যে। জারী গান ও মুর্শিদা গান মুসলমানের, আর নাল গান, গম্ভীরা গান, ঘেঁটু গান হিন্দুর—কিন্তু দুয়ের ভেতর কোথাও বিভেদের রেখাটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। আর মাণিকপীরের গানে বা বাউল গানে ত দুয়ের সমন্বয় চেষ্টাই হয়েছে বার বার। এদিক থেকেও শিক্ষিত সমাজের চেয়ে নিরক্ষর সমাজের দৃষ্টির প্রসন্নতা অনেক বেশী ছিল বলেই মনে করা যেতে পারে।

· সব শেষে আর একটা কথা। প্রাচীন বাংলায় ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীতের চর্চ্চা সম্পন্ন সমাজে হয়ত ছিল—কিন্তু দেশের জনমন নিজেকে প্রকাশ করেছিল ক্ল্যাসিক্যাল গানের কড়াকড়ি এড়িয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব গানে। কীর্ত্তন গান, রামপ্রসাদী গান, বাউল বা ভাটিয়াল গান কোন ধার-করা রাগ-রাগিনী বা সুর-তালের আশ্রয় নেয় নি, এরা উৎসারিত হয়েছে আপন নিজস্ব সুর নিয়ে। একদা রাগ-সঙ্গীতের পাণ্ডারা এই সব দিশি সুরের নামে নাক সিঁটকাতেন—কিন্তু দীর্ঘ দিনের উপেক্ষা ও অনাদরের উজান ঠেলে আজ যে এরা আবার ভদ্রসমাজে এগিয়ে এসেছে, এতেই বোঝা যায়, এদের ভেতর সত্যিকার বস্তু ছিল।

[২]

পল্লী-সঙ্গীতের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়েছি যে সুর-বিন্যাস ও রচনা রীতি, দু'দিক থেকেই বাঙালীর মন ক্ল্যাসিক্যাল কড়াকড়িকে এড়িয়ে গেছে। বিধিবদ্ধ রাগ-শাস্ত্র এবং রস-শাস্ত্রের নিরিখ দিয়ে তাই এ সব রচনার বিচার হতে পারে না—এজন্যে দরকার, সহজ বিচার-বুদ্ধির ও স্বচ্ছ দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুসরণ করা। কিন্তু আমি আগেই বলেছি যে এদেশের শিক্ষিত সমাজ কেতাবকৌলীন্যকে এত বড় করে দেখতেন যে বাঁধা ছকের বাইরে যা পড়তো, তাকে তাঁরা গ্রহণীয় বলে ত মনে করতেনই না, অনেক ক্ষেত্রেই ভাবতেন উপেক্ষণীয় বলে। এই মৌলিক কারণেই পল্লী-সঙ্গীত সেদিন উন্নত সমাজের আশ্রয় পায় নি—তারপর ইংরেজী শিক্ষার প্রবর্ত্তন ও নাগরিকতার ক্রমবিস্তার যত হতে লাগলো, ততই শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে, উন্নতে-অন্ত্যজে তফাতের গণ্ডীটা হয়ে চললো দুরতিক্রম্য। অবশেষে দুয়ের মাঝখানে পড়ে গেল একটা

স্থায়ী অপরিচয়ের পর্দ্দা। তাঁর ফলেই এই বহুবিস্তৃত সাহিত্য শাখাটি গ্রামাঞ্চলে পড়ে রইলো—বিস্মৃতি ও উপেক্ষার ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে লোপ হতে আরম্ভ করলো।

আজকের দিনে রেকর্ডে, রেডিওতে পল্লী-সঙ্গীত নাম দিয়ে এক শ্রেণীর গান গাওয়া হয়ে থাকে—সাময়িক পত্রেও পল্লী-সঙ্গীত বলে এক জাতের রচনা নিয়ে আলোচনামূলক প্রবন্ধ লেখা হয়ে থাকে। পরীক্ষা করে দেখলেই বোঝা যায়, এগুলো নকল, Archaic ভাষায় লেখা রাবীন্দ্রিক গান, অনুবাদ করে নিলেই এদের ভেতরকার কৃত্রিম কঙ্কালটি প্রকাশ পেয়ে যায়। এই শ্রেণীর গানকে প্রাচীন সংগ্রহ বলে চালানো এবং নিরীহ পাঠক-পাঠিকাকে ঠকানো ইদানীং পূর্ণোদ্যমেই চলছে। আশ্চর্য্যের বিষয়, বিচক্ষণ ব্যক্তিরাও এই ভাঁওতায় ভুল করে বসছেন। তথাকথিত বাউল সঙ্গীত, পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা বা পল্লী-সঙ্গীত খাস কলকাতায় বসেই তৈরী হয় এবং তার ওপর নির্ভর করে পণ্ডিতী গবেষণাও হয় প্রচুর। অথচ সত্যিকার পল্লী-সঙ্গীত সংগ্রহ করার দিকে কারুরই নজর নেই—না সাহিত্যিকদের, না গবেষকদের!

কিন্তু পল্লী-সঙ্গীতের আলোচনা এইখানেই শেষ করলাম। ইংরেজী আমলে বাংলা গানে যে নূতন দৃষ্টি ও ভাব-বিপর্য্যয়ের বন্যা এলো, এবার তার আলোচনা করা যাক। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রভাবে এসে বাঙালীর জীবনে ও মননশীলতায় যে তুমুল ওলট পালট ঘটে গেল, তার বিক্ষোভ যখন শান্ত হল, তখন দেখা গেল, দেশের চিন্তাধারায় এসেছে কয়েকটি নূতন চেতনা—এর প্রথম হল, ধর্ম্ম ব্যাপারে বুদ্ধিবিশুদ্ধি, দ্বিতীয় হল, দেশাত্মবোধ এবং তৃতীয় হল, সামাজিক দাবী-দাওয়ার সহজ প্রকাশ। এই আবহাওয়া থেকে যে সাহিত্য জন্ম নিলে, তাতে এই তিনের রূপই পরিস্ফুট। এই তিন দৃষ্টির

পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিয়ে বাঙালীর সৃজনীশক্তি এযুগে এমন একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করলো, যাতে প্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে তার যোগসূত্রই গেল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে।

আধুনিক বাংলা গান তাই স্বভাবধর্ম্মেই প্রাচীন গান থেকে বিষয়, বিন্যাস এবং সুর, তিনদিক থেকেই সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে পড়লো। এই পার্থক্যের প্রথম পরিচয় পাই ব্রাহ্ম-সঙ্গীতে। পৌত্তলিকতা ও উপ-ধর্ম্ম প্রপীড়িত বাংলার সাহিত্যে ভগবৎ সঙ্গীত নূতন জিনিষ নয়—কিন্তু ভগবৎ স্বরূপকে উপলব্ধি করার যে নূতন দৃষ্টি দেশে এলো ব্রাহ্মধর্ম্ম থেকে, ব্রাহ্ম-সঙ্গীত ও প্রবন্ধ সাহিত্যে তাকেই পাওয়া গেল নূতন করে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম ব্রাহ্ম-সঙ্গীত রচনা করে, বাংলা গানের স্রোতকে এই দিকে ফিরিয়েছিলেন। রামমোহন রায়ের গানের আমি মোটেই অনুরাগী নই, কারণ তার ভেতর কাব্যিক সুষমা, ভাবিক গরিমা, কোন কিছু নেই—নিছক নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকথাকে তিনি রূঢ় বৈদান্তিক ভাষায় ছন্দোবদ্ধ করেছেন। যেমন—

একদিন হবে যদি অবশ্য মরণ।
এত দম্ভ অহঙ্কার করো কি কারণ।
এই যে মানব দেহ,
যারে এত কর স্নেহ,
ভস্মসার হবে তার মস্তক চরণ॥

কিম্বা-

মন রে মনে করে, শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে কথা কইবে কিন্তু তুমি রৈবে নিরুত্তর।

ইত্যাদি রচনা রসিক মনের পক্ষে নিতান্তই গুরুপাক। এ সব সঙ্গীত

মনে কোন বৈরাগ্য ভাব বা রসাবেশ জাগায় না—বরং এই সুলভ. পাদ্রীয়ানায় মন উত্যক্তই হয়ে উঠে। সৌভাগ্যের বিষয়, ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দ (দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ ইত্যাদি), চিরঞ্জীব শর্ম্মা, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখ কবিরা পরবর্ত্তী কালে রামমোহন সৃষ্ট এই তত্ত্বসঙ্গীতের কঙ্কালে কাব্যিক রস-রক্ত সংযোজনা করে তাকে সজীব করে তুললেন। সত্যিকার ব্রাহ্ম-সঙ্গীতের জন্ম এঁদের সময় থেকে এবং এঁদের পরও খ্যাত-অখ্যাত বহু কবি ব্রাহ্ম সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। প্রসিদ্ধ 'ব্রাহ্ম-সঙ্গীত' বইয়ে এইসব গান সংগৃহীত হয়েছে, কৌতূহলী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। 'সমাজে' এসব গান গাওয়া হয়ে থাকে, সমাজের বাইরে যাঁরা ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের ওপর খুসী নন, তাঁরাও এই গানগুলি সসম্মানেই গ্রহণ করে থাকেন।

'এই বিশ্ব মাঝে যেখানে যা সাজে', 'মন চলো নিজ নিকেতনে,' 'অন্তর দেবতা তিনি', 'গাওরে তাঁহার গুণগান', 'তুমি আমাদের পিতা' প্রভৃতি গান বাল্যকালে আমরাও গেয়েছি এবং এগুলো যে কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মার্কা-মারা গান, সে কথা ভুলেও মনে হয় নি! বৈষ্ণব সঙ্গীতে, শ্যামা সঙ্গীতে আমরা ঈশ্বর-প্রীতির ভাববিহ্বল দিকটি পেয়েছি পূর্ণভাবে—কিন্তু একটা অভাব বরাবরই অনুভব করেছি, তা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীতে বুদ্ধি-বিশুদ্ধির অনুপস্থিতি। ব্রাহ্মসঙ্গীতে সেই দিকটির পূরণ হল। কিন্তু সাহিত্যিক সম্পদে এরা প্রাচীন সঙ্গীত থেকে অনেক বেশী পশ্চাৎবর্ত্তী রইলো, তার কারণ বোধ হয় এই যে, রচয়িতারা যত বড় ব্রাহ্ম ছিলেন, তত বড় কবি ছিলেন না। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবে সেই অসম্পূর্ণতা দূর হল। তাঁর হাত দিয়ে যে ব্রাহ্ম সঙ্গীত এলো, তা প্রথমতঃ সঙ্গীত, তারপর ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা।

গীতাঞ্জলি, গীতালী, গীতিমাল্য ইত্যাদি গানের বইয়ে রবীন্দ্রনাথের

ব্রাহ্মসঙ্গীত সঙ্কলিত হয়েছে। কিন্তু একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্মসঙ্গীতে বৈদান্তিক তত্ত্বমুখিতার সঙ্গেই বৈষ্ণবীয় রাগাত্মিকা ভাব এবং বাউলীয় ঔদাসীন্যের মিশ্রণ হয়েছে, তাঁর গান তাই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসায় পর্য্যবসিত হতে পারে নি। তাকে লৌকিক প্রেম-সঙ্গীত বা প্রকৃতি-সঙ্গীতরূপে নিতেও তাই অনেক সময় বাধা হয় না। ব্রাহ্মের জ্ঞান-পন্থা এবং পৌত্তলিকের ভক্তি-পন্থা, দুয়ের যোগসাধন করে রবীন্দ্রনাথ বাংলা গানে যে নূতন ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করলেন, তার জাতি বৈচিত্র্য বোঝানোর জন্যে একটি মাত্র দৃষ্টান্ত দোব—

বেলা যে যায় আমার সাঁঝ বেলাতে,
তোমার গানের সুরে সুর মেলাতে।
একতারাটির একটি তারে,
গানের বেদন বইতে নারে,
তোমার সাথে বারে বারে,
হার মেনেছি আমি ঐ খেলাতে।

[৩]

স্বদেশীয়ানা বাংলা সাহিত্যে এসেছিল ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে এবং মাইকেল, রঙ্গলাল, বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রমুখ বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যকরা প্রধানতঃ দেশপ্রেমকেই তাঁদের সাহিত্য-সৃষ্টির লক্ষ্যরূপে নিয়েছিলেন, একথা আগেই বলেছি। সেই সঙ্গে একথাও বলেছি যে বাংলার ইতিহাস তখনো দেশবাসীর সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, তাই মারাঠা, রাজপুত প্রভৃতি জাতের ইতিহাসকে আশ্রয় করে সেদিন বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতা প্রকাশ পেয়েছিল এবং তা গানের ভেতর দিয়ে নয়। শুধু বঙ্কিম লিখেছিলেন বন্দেমাতরম গান এবং তার সাহায্যে বাংলা ও বাঙালীর স্বাতন্ত্র্য এবং মর্য্যাদাকে ভাষা দিয়েছিলেন।

হিমালয়বাহিত পলি মৃত্তিকায় গঠিত শস্যশ্যামলা সুজলা সুফলা বাংলা দেশের ওপর হিমালয় দুহিতা অন্নদাত্রী জগন্মাতা দুর্গার রূপক আরোপ করে, বঙ্কিম এই গান রচনা করেছিলেন—সুতরাং এ গান হিন্দু-বাঙালীর গান, তাতে আর সন্দেহ নেই। রাজনৈতিক কারণে পরে বন্দেমাতরম সর্ব্বভারতীয় জাতীয়-সঙ্গীত হয়েছে এবং জাতি, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় নিরপেক্ষভাবে সকলের কাছ থেকেই এর প্রতি বশ্যতা দাবী করা হয়েছে, এ নিয়ে আমার বলার কিছুই নেই। কিন্তু সে অনেক পরের কথা। ইতিমধ্যে বঙ্কিম যুগের শেষাশেষি হিন্দুমেলার উদ্যোগ হয় এবং তার উদ্দীপনা থেকে বাংলায় স্বদেশী গানের একটা ঢেউ আসে।

এদিকেও ঠাকুর ভ্রাতৃবৃন্দের নামই সর্ব্বাগ্রে স্মরণীয়। সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুরের—

মিলে সব ভারত সন্তান,
এক তান মন প্রাণ,
গাওরে ভারতের যশোগান।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের,

না জাগিলে সব ভারত ললনা,
এ ভারত আর জাগে না, জাগে না।

'সরোজিনী' নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের,

জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা···

সেদিন বাঙালীর অসাড় চিত্তে জাগরণী সঞ্চার করেছিল। কবি মনোমোহন বসুর 'দিনের দিন হয়ে দীন', কবি গোবিন্দ রায়ের 'কত কাল পরে ভারত রে', শিবনাথ শাস্ত্রীর 'চাহিনা সভ্যতা চাষা হয়ে

থাকি' ইত্যাদি গানও এই সময়ের। আনন্দচন্দ্র মিত্র, দীনেশ চরণ বসু, দ্বারিকানাথ গাঙ্গুলী—সেদিনকার প্রায় সমস্ত কবিই হিন্দুমেলার প্রভাবে দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছিলেন।

এই সমস্ত গানের দু'একটি ছাড়া (যেমন, 'কত কাল পরে' বা 'মিলে সব ভারত সন্তান') অধিকাংশ রচনাই সাহিত্যের দিক থেকে অপাংক্তেয়। একটা সাধারণ রাষ্ট্রিক চেতনা এবং আত্মমর্য্যাদাবোধের প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই পাওয়া যায় না এদের ভেতর। অবশ্য এর দুটো স্পষ্ট কারণ পাই। প্রথমতঃ এইসব গানের রচয়িতারা কেউই সত্যিকার বড় কবি ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ দেশের আবহাওয়ায় সেদিন সত্যিকার দেশাত্মবোধের উদ্দীপনাও ছিল না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রেরণা থেকে অস্বচ্ছভাবে এসেছিল একটা স্বাধীনতার স্পৃহা—অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তীকালের সাহিত্য সেই প্রেরণার ফলে দেশের সত্য এবং কল্পিত ইতিহাসের ভেতর দিয়ে আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজেছিল। সেই আমাদের সাহিত্যে প্রথম দেশপ্রেমের সূচনা। তারি জের চলে এসেছে রবীন্দ্রনাথের ঠিক আগে পর্য্যন্ত।

স্বদেশী আন্দোলনের যুগে দেশে হঠাৎ যে রাষ্ট্র-আন্দোলন দেখা দিল, তারি প্রেরণায় সাহিত্যেও এলো এক নূতন উদ্দীপনা। যে চেতনা ছিল অস্ফুট, নীরস ইতিহাসের পাতায় আবদ্ধ, বাস্তব জীবনের সঙ্ঘাতে তা উঠলো সজীব হয়ে এবং বাংলার চতুঃসীমা ছাড়িয়ে তা সর্ব্বভারতে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়লো। সে আন্দোলন ফলের দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছে, কিন্তু আমাদের মনের মাটিকে তা বিশেষভাবেই উর্ব্বর করে দিয়ে গেছে। নাটকে-উপন্যাসে, কাব্যে-গানে, বাংলা ভাষায় সেদিন যে নূতন সৃষ্টির জোয়ার এলো, তার অনেকখানিই হয়ত সাময়িক এবং সময়াতিক্রমের পরে তার রং অনেকটাই হয়ত ফিকে

হয়ে গেছে, তবু আমাদের দেশাত্মবোধের ভেতর সেইদিনই প্রথম এসেছে বাস্তবতার স্পর্শ।

এই আমলের সাহিত্যিক প্রচেষ্টার অন্যান্য দিক নিয়ে আমি আগেই আলোচনা করেছি—এবার দেখাবো গানের দিকটা। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্তের প্রসিদ্ধ গানগুলির জন্ম এই সময়ে। এক বন্দেমাতরম ছাড়া আমাদের দেশে স্বদেশী-সঙ্গীত বলতে যে সমস্ত গানকে বুঝি, তার সবই এই তিন কবির লেখা। এঁদের পেছনে অবশ্য অগণ্য কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন, তাঁরাও দেশপ্রেমাত্মক গান লিখেছিলেন অনেক—যেমন কালীপ্রসন্ন কাব্য বিশারদ, অশ্বিনীকুমার দত্ত ইত্যাদি এবং তাঁদের গান জনসমাজে ব্যাপ্তও হয়েছিল যথেষ্ট, কিন্তু সাধারণ স্বদেশী প্রোপাগ্যাণ্ডার স্তর ছাড়িয়ে তার একটিও সাহিত্যের কোঠায় ওঠে নি, যা হয়েছে এই তিন জনের, বিশেষতঃ প্রথম দু'জনের বেলায়। কাব্য-বিশারদের—

বন্দে মাতরম বলে,
যায় যাবে যাক প্রাণ চলে।
বেত মেরে কি মা ভুলাবি,
আমি কি মার সেই ছেলে?
দেখে রক্তারক্তি বাড়বে শক্তি,
কে পালাবে মা ফেলে?

কিংবা অশ্বিনী দত্তের—

তব দ্বারদেশে এসেছে ভিখারী
দেহ কৃপা করি কি দিবে তাহায়,
স্বদেশ সেবক এ সব যাচক,
তুষ্ট হবে তব সুমিষ্ট কথায়।

ইত্যাদি গান গানই, সাহিত্য নয়।

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে দেশের শোভা-সৌন্দর্য্য, তার ধর্ম্ম, আচার ও সংস্কৃতির মহিমান্বিত রূপ অসামান্য কাব্যিক সুষমায় প্রকাশ পেয়েছে—ভাষার ঐশ্বর্য্যে, অলঙ্কারের প্রাচুর্য্যে, সুরের বৈচিত্র্যে এই সব গান বাংলা ভাষার চিরস্থায়ী সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবন মনোমোহিনী', 'দেশ দেশ নন্দিত করি', 'জনগণ-মনো-অধিনায়ক জয় হে' বা দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা', 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে', 'বঙ্গ আমার জননী আমার' প্রভৃতি গান শোনেননি, গাননি বা পড়েননি, এমন বাঙালীই কেউ আছেন কিনা সন্দেহ! দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী গানে এই সঙ্গে আছে মাঝে মাঝে পৌরুষের প্রদীপ্ত হুঙ্কার, রবীন্দ্রনাথে তার স্থানে আছে প্রশান্তির প্রোজ্জ্বল মহিমা। কিন্তু এই দু'জন অসামান্য কবির কেউই দেশের প্রত্যক্ষ অবস্থার দিকে সাদা চোখে তাকান নি। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের—

ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ,
ওমা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমি ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম যেন, এই দেশেতে মরি।

এবং রবীন্দ্রনাথের—

আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো,
সেই আলোতে নয়ন রেখে মুদবো নয়ন শেষে।

প্রভৃতি গানে একই দৃষ্টি-ভঙ্গীর অনুসরণ দেখতে পাই। স্বাস্থ্যহীন, অন্নহীন, দীনদরিদ্র বাঙালীর প্রত্যক্ষ অবস্থা থেকে এই অন্তিম প্রার্থনা উৎসারিত হয় কিনা সন্দেহ! অবশ্য আমাদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল দু'জনেই হলেন অভিজাত সমাজের

কবি—দীন দুঃখীদের সঙ্গে তাঁদের সত্যিকার কোন সংস্রব বা যোগ ছিল না।

দু'জন কবির রচনাতেই জাতীয় জাগরণের উদাত্ত আহ্বান আছে—রবীন্দ্রনাথের 'সময় হয়েছে নিকট এবার বাঁধন ছিঁড়িতে হবে', 'আগে চল আগে চল ভাই' বা দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের 'মেবার পাহাড়', 'জাগো পুরনারী' ইত্যাদি গান কম উল্লেখযোগ্য নয়, যদিও অবশ্য এ দেশপ্রেম পুরাণো সামন্ততন্ত্র ঘেঁষা এবং দীনহীন নগণ্য জনসাধারণের সঙ্গে এর নাড়ীর যোগ অল্প। এদিক থেকে রজনীকান্ত দেশবাসীর অনেক কাছের মানুষ—দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে ছিল তাঁর প্রখর দৃষ্টি এবং দেশের দীনদুঃখীদের সঙ্গে এক হয়েই তিনি পরাধীনতার দুঃখকে ভাষা দিয়েছেন—

নেহাৎ গরীব আমরা, আমরা নেহাৎ ছোট,
তবু ত্রিশ কোটি ভাইবোন জেগে ওঠো!

নয়ত,

ও চাষী ভাই, ও তাঁতী ভাই, আজকে সুপ্রভাত ··

দুঃখের বিনয় রজনীকান্তের দৃষ্টি এবং দরদ ছিল যতটা গভীর কবিত্ব ছিল তার চেয়ে অনেক কম, তাই তাঁর এই সব গান নিতান্তই বিবৃতির আকার ধরেছে, কাব্যের সুষমা লাভ করতে পারে নি। তা সত্ত্বেও প্রকৃত দেশাত্মবোধের গান হিসাবে, এ সমস্ত রচনাকে উপেক্ষা করা যায় না, কারণ পরবর্তী কালের সমাজ ও সংস্কৃতিতে এদের প্রভাব অনেক দিক থেকেই কাজ করেছে।

ব্রাহ্ম সঙ্গীত ও স্বদেশী গানের আলোচনা আমরা শেষ করেছি এবং যে সমস্ত কবি এই দুই পর্য্যায়ের গান রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, তাঁদের রচনার অল্প স্বল্প নিদর্শনও তুলে দিয়েছি। কিন্তু এইখানেই বলে

রাখা দরকার যে ব্রাহ্ম সঙ্গীত বা স্বদেশী সঙ্গীত বা এই শ্রেণীর অন্যান্য গানে অনেকটা উদ্দেশ্য মূলক রচনারই দলে পড়ে। বড় প্রতিভার হাতে বিশেষত্ব লাভ করলেও, সত্যিকার স্থগভীর রস যা চিরদিনের উপভোগের বস্তু, তা এই সব গানে অনেক জায়গাতেই জমে উঠতে পারেনি। সমসাময়িকতার ছাপ এবং মামুলি ছকের কাঠামো এই সব গানকে অনেক স্থানেই খোঁড়া রেখেছে। কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় আধুনিক গান এই উদ্দেশ্যমূলক রচনার স্তরকে অতিক্রম করে প্রাণধর্ম্মের প্রেরণায় স্থমহান হয়েই উঠেছে।

[৪]

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্ত এই তিন জন প্রসিদ্ধ গীতকারের মধ্যে প্রথম দু'জনের গানের বিষয়, রস ও স্থরের যে নানামুখী বৈচিত্র্য দেখা যায়, বাংলা গানের ইতিহাসে তার তুলনা হয় না। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গান এবং দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদিও জনসমাজে সব চেয়ে বেশী আদৃত এবং এই দু'জন শ্রেষ্ঠ কবির সত্যিকার শক্তির বিকাশও হয়েছে যদিও এই দুই লাইনে—তবু উভয়ের অন্যান্য পর্য্যায়ের গানগুলিরও সাহিত্যিক উৎকর্ষ কম নয়। রবীন্দ্রনাথের ধর্ম্মসঙ্গীত নিয়ে আগেই আলোচনা করেছি। প্রেম সঙ্গীত সম্বন্ধেও দু-চার কথা বলা দরকার। কিন্তু এই খানে বলে রাখি যে কবির ধর্ম্ম-সঙ্গীত আর প্রেম-সঙ্গীতের মাঝখানে কোন সীমারেখা টানা যায় না—ভগবৎ ভক্তি এবং মানবিক প্রেমানুভূতি তাঁর গানে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে এক হয়ে গেছে। প্রকৃতির নানা অবস্থান্তর নিয়ে তাঁর যে সমস্ত গান, রস-বৈচিত্র্যের দিক থেকে সেগুলিও অনন্যসাধারণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি-সঙ্গীতও এক হিসাবে তাঁর ধর্ম্ম এবং প্রেম সঙ্গীতেরই শ্রেণীভুক্ত—কারণ প্রকৃতির

বিভিন্ন অবস্থান্তরের ভেতর দিয়ে তিনি যে অনির্ব্বচনীয় সুন্দরের, লোকাতীত অরূপের লীলাকে রূপ দিয়েছেন এবং তার সঙ্গে মানবাত্মার যে মহান যোগসূত্রটি উদ্ঘাটিত করেছেন, তা একই দৃষ্টির অনুপূরক। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রেমসঙ্গীতও চমৎকার এবং রবীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে তার স্পষ্ট পার্থক্য এই যে তার আবেদন সর্ব্বত্র ব্যক্তিক। 'এ-জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি' প্রভৃতি গান দ্রষ্টব্য।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান সত্যিই অসামান্য। তার শব্দযোজনার কায়দা, বিষয়-সমাবেশের নূতনত্ব, সর্ব্বোপরি প্রকাশভঙ্গীর অনায়াস স্বচ্ছতা যেমন লক্ষ্যনীয়, তার অন্তর্নিহিত অনাবিল ও অনাক্রমণাত্মক কৌতুক প্রবণতাও তেমি উপভোগ্য। হাসির নামে ভাঁড়ামি অথবা ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের সম্ভ্রম হানি না করেও যে নিছক হাস্য রস সৃষ্টি করা যায়, এই গানগুলিই তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। 'নন্দলাল,' 'আমরা বিলাত ফেরতা ক'ভাই,' 'আমরা Reformed Hindus', 'তারেই বলে প্রেম,' 'আধুনিক রাধাকৃষ্ণ' ইত্যাদি গানের যে কোনটা নিয়ে আলোচনা করেই দেখানো যেতে পারে। এই সব গানের লক্ষ্যস্থল যাঁরা, তাঁরা এগুলি উপভোগ করেছেন এই জন্যে যে কবি বিদ্রূপই করেছেন, আক্রমণ করেন নি, উপহাসই করেছেন, অপমান করেন নি। তাঁর মনোধর্ম্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই অবাঙালী সুলভ ঔদার্য্যই তাঁকে আমাদের কাছে এতখানি শ্রদ্ধার্হ করে রেখেছে। সেই—

নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ,
স্বদেশের তরে যে করেই হক, রাখিবে সে জীবন।

নয়ত—

দেখো হতে পার্ত্তাম আমি একটা মস্ত বড় বীর,
কিন্তু গোলাগুলির শব্দে কেমন মাথা রয় না স্থির!

নয়—

তারেই বলে প্রেম,
যখন থাকে না ফিউচারের চিন্তা, থাকেনাক সেম !

কে না পড়েছেন, কার না ভালো লেগেছে ? অসঙ্কোচে বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যে এরা নূতন এবং চিরদিনই নূতন থাকবে। এদের তুলনা পাওয়া যায় শুধু ইংরেজী সামাজিক গানগুলিতে।

রজনীকান্ত কবি হিসাবে রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র স্তরের নীচেয় পড়েন, কিন্তু তাঁর রচনায় মাঝে মাঝে যে সুনিবিড় আর্ত্তি ও আকুল আন্তরিকতা পাই, তা এই দুই প্রখ্যাত কবিতে পাই নে। অবশ্য আন্তরিকতাই কাব্য-প্রতিভার একমাত্র মাপকাঠি নয়, তবু তা উপেক্ষারও জিনিষ নয়।

প্রাণের পথ বয়ে গিয়েছে সে গো,
চরণ চির রেখা আঁকিয়া যে গো।

কিংবা—

ফুটিতে পারিত গো, ফুটিল না সে,
মরমে মরে গেল, মুকুলে ঝরে গেল,
বুক ভরা আশা সমাধি পাশে···

হৃদয়গ্রাহী রচনার আদর্শ হিসাবে আজো সমাদরে গৃহীত হবার যোগ্য। ভক্তিমূলক গানে রজনীকান্ত খাঁটি বাঙালীয়ানার অনুসরণ করেছিলেন, যেমন করেছিলেন স্বদেশী গানে। কিন্তু এই অপরিশুদ্ধ বাঙালীয়ানার আতিশয্যে সে সমস্ত গান অনেক স্থলেই রসের জাত খুইয়ে বিবৃতিতে দাঁড়িয়েছে। যথা—

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছো গর্ব্ব করিতে চূর !
যশ, অর্থ, মান, স্বাস্থ্য, সকলি করেছো দূর !

ভাবিতাম আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ,
তাই কি দয়াল ব্যাধি দিলে মোরে, বেদনা দিলে প্রচুর ?

আর রজনীকান্তের হাসির গান—আমার মতে সেগুলো একেবারেই অচল, দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যর্থ নকল ছাড়া আর কিছুই নয় !

মোটের ওপর এই তিন জন কবিই বাংলা গানকে আধুনিকতার ভিত্তিতে গড়ে তুলেছেন। পরস্পরের ভেতর শক্তির তারতম্য যাই থাক, তিন জনই সেই জন্যে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। (থিয়েটারের ভেতর দিয়ে রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীশচন্দ্র ঘোষ, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যা-বিনোদ প্রমুখ নাট্যকারের বহু গানও এঁদের সমকালে দেশের চারি দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু সে সমস্ত রচনা নিয়ে আমি এই সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে কোন আলোচনা করবো না। নাট্যালয়ের বাইরে দেশের সাহিত্যিক রুচির ওপর এই সব গানের প্রভাব কোন দিনই বিশেষ কার্য্যকরী হয়েছে কিনা সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে।) এই তিন জন কবির মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রচুরভাবে এবং রবীন্দ্রনাথ আংশিক ভাবে পাশ্চাত্য সুর বাংলা গানে এনেছেন—নিজস্ব বাংলা গানের একটানা স্নিগ্ধতার ভেতর আরোহ-অবরোহের বৈচিত্র্য এনে এঁরাই প্রথম তাকে বলীয়ান করেছেন। রবীন্দ্রনাথ আবার কীর্ত্তন এবং বাউলের মিশেল দিয়েছেন। আধুনিক গানের যে মিশ্রসুর আজ এত সমাদর পাচ্ছে, তার সৃষ্টি প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ রবীন্দ্রনাথেরই হাতে।

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, আধুনিক সঙ্গীতকারদের মধ্যে প্রধান তিনজনের রচনা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি। বলা বাহুল্য, এঁদের রচনার সাহিত্যিক দিকেই আমি আলোচনা সীমাবদ্ধ রেখেছি—সাঙ্গীতিক দিক সম্বন্ধে আলোচনা আমার প্রয়োজনের বহির্ভূ

ধারার সাহিত্যের ইতিহাসে তার সার্থকতাও কিছু আছে কিনা সন্দেহ। এই তিন জনই প্রকৃতপক্ষে আধুনিক বাংলা গানের প্রবর্ত্তক এবং এক হিসাবে এঁরাই এখনো পর্য্যন্ত বাংলা ভাষার সর্ব্বজন সমাদৃত গীতকার। এঁদের পরে সম্পূর্ণাঙ্গ সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে নাম করতে হয় স্বর্গীয় কবি অতুলপ্রসাদের, যিনি রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রজনীকান্তের মতো একই সঙ্গে গীতস্রষ্টা এবং গায়করূপেও প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

অতুলপ্রসাদের গান সেদিন পর্য্যন্ত বাংলার চতুর্দ্দিকে সাগ্রহ অনুরাগে গীত হয়েছে। তাঁর 'দোলে দোলে ফুল,' 'যদি তোর হৃদ-যমুনা,' 'মিছে তুই ভাবিস ওরে,' 'ওগো সাথী মম সাথী,' 'নিদ নাহি আঁখি পাতে' ইত্যাদি গান ছোট-বড় সকলেরই মুখে শোনা গেছে এবং কৌতুকের বিষয়, অনেক ক্ষেত্রেই এগুলি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলে চলে গেছে। বলাই নিষ্প্রয়োজন যে রবীন্দ্রোত্তর যুগের সমস্ত কবির মতো অতুলপ্রসাদের গানেরও পদ-বিন্যাস এবং শব্দ-যোজনার ওপর রবীন্দ্রনাথের অনতিক্রমনীয় প্রভাব দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্র-সঙ্গীতের প্রাণ-ধর্ম্ম যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছেন, তাঁরা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন যে এই সমস্ত গানে শুধু রবীন্দ্রনাথের কথা ও সুরকেই অনুসরণ করা হয়েছে, স্বকীয় অনুভূতির অনুরঞ্জনে কবি সে অনুসরণকে বেশীর ভাগ স্থলেই সৃষ্টির কোঠায় উন্নীত করতে পারেন নি। তাই অতুলপ্রসাদের অধিকাংশ গানই রজনীকান্তের গানের মতো, সুর থেকে বিচ্ছিন্ন হলে কাব্যিক দিক থেকে প্রায় অপাংক্তেয় হয়ে দাঁড়ায়, যা হয় না রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের গান।

[৪]

অবশ্য বিশুদ্ধ সাঙ্গীতিক দিক থেকে দেখলে, গানের 'কথা' হল সুরের বাহন, সুরটাই লক্ষ্য, কথা তার উপলক্ষ্য মাত্র। কিন্তু বাংলা

গানে বাণীকে লাউ-এর বোঁটার মতো ধরে আনার উপকরণ মাত্র মনে করা হয়নি কোন দিনই। প্রাচীন হক, আর আধুনিক হক, বাংলা গীত-ভাণ্ডারের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যেগুলো, 'কথার' দিক থেকে তাদের শিল্পীক উৎকর্ষ ন্যূন ত নয়ই, বরং সর্ব্বত্রই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এইজন্যেই বাংলা ভাষায় হয়ত খাঁটি রাগ-সঙ্গীত গড়ে উঠেনি, কিন্তু এতেই বাংলা গান তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পেরেছে—সে সে-কালেও, এ-কালেও। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ-কালে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল ছাড়া এই দুর্লভ স্বাতন্ত্র্যের ছাপ খুব কম রচয়িতার গানেই পাওয়া যায়। কাজেই অতুলপ্রসাদের গান সাহিত্যিক বিচারে প্রথম স্তরে স্থান পায়না বলে কোন ক্ষোভ করে লাভ নেই।

মোটামুটি ভাবে অতুলপ্রসাদের গানে মনোহরণের বস্তু কম নেই, কতক গুলি বিষয়ে তাঁর বিশিষ্টতাও সহজেই চোখে পড়ে। তাঁর গানের ভাষা স্নিগ্ধ, ভঙ্গী পেলব, আবেদন ব্যক্তিক—ব্যঞ্জনায় নিগূঢ়তা বা আঙ্গিকে অসামান্যতা কোথাও না থাকলেও, সর্ব্বত্রই বেশ একটি সহজ সাবলীলতা দেখা যায়, যা এক-একটা বিশেষ মেজাজের মুখে বেশ উপভোগ্য। এই কমনীয়তাটুকু খুব বড় জাতের না হলেও, এর বৈশিষ্ট্য উপেক্ষণীয় নয়। যেমন—

গগনে বাদল, নয়নে বাদল,
বাদলে পরাণ ছাইয়া,
এসো হে আমার বাদলের বঁধু,
চাতকিনী আছে চাহিয়া।
এ জীবন ভার, হয়েছে অসহ,
সঁপিব তোমারি হাতে!
নিদ নাহি আঁখি পাতে।

সমসাময়িক কবিদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায় এবং কাজি নজরুল ইসলাম গান লিখে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। উভয়ের, বিশেষতঃ নজরুলের গান বাংলা দেশের তরুণ-মনে অল্পদিন আগেও কল্লোল তুলেছিল। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের গানে চটুল শব্দ ও লঘু সুরের অনায়াস লীলা লক্ষ্যনীয়, কিন্তু তাঁর গান হাল্কা আবহাওয়ার উর্দ্ধে বড়-একটা ওঠে না—সেই জন্যেই তাতে বৈচিত্র্যের অভাব। তাছাড়া, তাঁর শব্দ-প্রয়োগে কতকগুলো mannerism দেখা যায়, যা রচনার অব্যাহত স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিকূল। হেমেন্দ্রকুমারের যে সমস্ত গান দেশের অন্তরে স্থান পেয়েছে, তা এতই সুপরিচিত যে তা থেকে কোন অংশ উদ্ধৃত করা অনাবশ্যক। 'কাজরী ধারার গুঞ্জনীতে,' 'যূথিকার শুভ্র বুকে', 'চরণ ধরে বারণ করি' ইত্যাদি গান দেশের সব ছেলে-মেয়েরই হয়ত মুখস্থ আছে।

নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রোত্তর যুগের বিশিষ্টতম গীতকার কিনা তা নিয়ে তর্কের অবসর থাকতে পারে। কিন্তু তাঁর গীত-সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং বিশিষ্টতা কারুরই দৃষ্টি এড়ায় না। বাংলা গানের সনাতন কারুণ্যের একঘেঁয়েমি নজরুলের হাতেই সম্ভবতঃ সুস্পষ্টভাবে আঘাত খায়। তাঁর আগে,

উর্দ্ধ গগনে বাজে মাদল, নিম্নে উতলা ধরণীতল,
অরুণ প্রাতের তরুণ দল, চল রে চল রে চল!

অথবা—

দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুঁসিয়ার!

শ্রেণীর ওজোগুণ বিশিষ্ট গান আমরা খুব কমই পেয়েছি। বাঙালী সামরিক জাত নয়, তার সাহিত্যে সত্যিকার শৌর্য্য তাই কোন দিনই

তেমন করে প্রকাশ পায় নি। নজরুল সেই বলিষ্ঠ পৌরুষকে বাংলা গানের আসরে প্রথমে এনেছেন—আবার গজল গানের লীলায়িত কোমলতাও তাঁরি একক সৃষ্টি।

আমারে চোখ ইসারায় ডাক দিলে হায়,
কে গো দরদী,
খুলে দাও রঙমহলার তিমির দুয়ার,
ডাকিলে যদি!

তাঁর আগেকার মুসলমান বাঙালী যে সাহিত্য রচনা করেছেন, তা হিন্দু সংস্কৃতিকেই অনুসরণ করেছে পূর্ণভাবে। ইসলামিক শব্দ-যোজনা করে, নজরুল ইসলামিক সংস্কৃতির back groundএ যে সমস্ত গজল রচনা করেছেন, তার অপূর্ব্বতা সেইজন্যে সকলকেই মুগ্ধ করেছে।



তৃতীয় অধ্যায়

নাটক

[প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক ছিল না। ইংরেজ আমলে, ইংরাজী নাটকের আদর্শেই বাংলা ভাষায় নাটক লেখা সুরু হল। আধুনিক পর্ব্বের প্রথম পায়োনিয়ার ঈশ্বর গুপ্ত এদিকেও অল্প একটু হাত চালিয়েছিলেন, কিন্তু সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। তাঁরপর নাটকে রামনারায়ণ তর্করত্ন লিখলেন 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব'। এইটি হল বাংলা ভাষায় প্রথম নাটক। এঁর পর মাইকেল, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, মনোমোহন বসু একাদিক্রমে ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ও সামাজিক নাটক লিখে বাংলা নাট্য সাহিত্যের ভিত্তি পাকা করলেন। এঁদের মধ্যে দীনবন্ধুই হলেন সতিজাতের নাট্যকার, যাঁর অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র প্রশস্ত, অনুভূতি সূক্ষ্ম এবং রসসৃষ্টির জ্ঞান সজাগ। তাঁর আগের বা সমকালের লেখকেরা নাটক লিখতেন, হয় কোন মহৎচরিত্রের আদর্শ দেখাবার জন্যে, নয় কোন দেশাচারের ক্রুটি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্যে। তাই তাঁদের নাট্য-দৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল কতকগুলি নির্দ্দিষ্ট টাইপ ও নির্দ্ধারিত নীতিতে। এই বাঁধাবাঁধির হাত এড়িয়ে দীনবন্ধু বিস্তৃততর জীবনের দিকে তাকালেন—দোষে-গুণে ভালোয় মন্দয় যে জীবন নিত্য প্রবাহিত, তা থেকেই তিনি আহরণ করলেন সৃষ্টির মাল-মশলা! দীনবন্ধুর পর দেশে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হল এবং নাট্যাভিনয় চলতে লাগলো ব্যবসা হিসাবে। এই সময় যাঁরা নাট্যকার রূপে দেখা দিলেন, তাঁদের নাম বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এই পর্য্যায়ের অন্তর্গত। এঁদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র পৌরাণিক এবং ক্ষীরোদ প্রসাদ ও দ্বিজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক নাটকে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অমৃতলালের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সামাজিক প্রহসনে। গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ প্রমুখ কবির নাটক রঙ্গমঞ্চে ভালোই জমে, কিন্তু সাহিত্য হিসাবে তাদের নানাবিধ অসঙ্গতি এবং অপূর্ণতা সাধারণ পাঠকেরও নজর এড়ায় না। রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যে আভিনায়িক গুণের অভাব, কিন্তু কাব্যিক সুষমায় সেগুলি

অনবদ্য। এঁদের পর বাংলা নাট্য-সাহিত্যের ধারা ক্রমশঃ মরে এসেছে। এখনকার রুচিতে সামাজিক নাটকের চাহিদা বেশী, কিন্তু নাট্যালয়গুলিতে আজো চলছে পুরাণেতিহাসেরই প্রতিপত্তি। সমসাময়িক কবিরা কেউ কেউ সামাজিক নাটকে হাত দিয়েছেন অবশ্য, কিন্তু পূর্ণাঙ্গ সাহিত্য এখনো গড়ে ওঠে নি।]

[১]

বাংলাদেশে নাটক এবং নাট্যালয় দুয়েরই জন্ম ইংরেজ আমলে। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে নাটক নেই। এদেশের টোলে সংস্কৃত কাব্য-নাটক পড়ানো হত—সংস্কৃত কাব্যের প্রভাব বাঙালী কবিদের ওপর দেখা যায়, কিন্তু নাটক এদেশের লেখকদের মনে কোন ছাপ ফেলেনি। এদেশে অভিনয়ের আসর জমতো মঙ্গল গান, পাঁচালী, কীর্ত্তন, এবং কথকতা দিয়ে। একজন গায়ক বা কথক পৌরাণিক কোন কাহিনী গদ্যে, পদ্যে ও গানে বিবৃত করে যেতেন—দোহারেরা মৃদঙ্গ ও মন্দিরা সহযোগে তার সঙ্গে করতেন সঙ্গত। আর ছিল কবি ও তরজা। তাতে কোন পালা অভিনয় হত না, হত দু'জন মূল গায়েনের মধ্যে বুদ্ধির ধার পরীক্ষা করার নাম করে কবিতায় উতোর কাটাকাটি। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে বৈষ্ণব কবিতা, মঙ্গলকাব্য, কবির গান, এক কথায় যা আমাদের সাহিত্যিক পুঁজি, তার কোনটাই প্রথমে সাহিত্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে লেখা হয় নি, হয়েছে আসরে গাইবার জন্যে। প্রাচীন বাংলা কবিতা মাত্রেরই আরম্ভে একটা করে 'ধ্রু' বা এমনি একটা কিছু লেখা থাকে, এ তাদের আদিম গীত-রূপেরই পরিচায়ক। এমন কি, পরবর্ত্তীকালে আবিষ্কৃত 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা'রও জন্ম পালা-গানের জন্যে।

এই সমস্ত পালার ভেতর দিয়ে দেশকে ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-অনুষ্ঠান যেমন শেখানো হত, তেমনি আনন্দ, বেদনা, প্রীতি, ভক্তি, হাসি-

তামাসার খোরাকও জোগানো হত। অর্থাৎ এও ছিল এক ধরণের অভিনয়ই, বলা যেতে পারে একক অভিনয়। সে-কালের নাট্যরুচি এতেই তৃপ্ত হত। প্রাচীন বাংলা সংস্কৃতির ষোল-আনাই ছিল উপ-ধর্ম্মের অধিকারভুক্ত, 'পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকা' ছাড়া এই সব পালা-গানের কোথাও তাই ধর্ম্ম-সংস্রবহীন সত্যিকার মানুষ নেই। এতে যে মানুষের আমরা সাক্ষাৎ পাই, তার জন্ম তথাকথিত দেবদেবীর মহিমা প্রচারের বরাত নিয়ে। মানুষের মনোধর্ম্মের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংসারের সজ্ঘাত থেকে যে দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, সেই নাটকীয় দ্বন্দ্ব এদের ভেতর দিয়ে রূপায়িত হয়নি। এরা রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, দৈব-দৌরাত্ম্যের মুখে পরিত্যক্ত অসহায় যন্ত্র মাত্র! এই ছকবাঁধা উপ-ধর্ম্মের বাইরে অনভিজাত সমাজের অসংস্কৃত মনের ফসল বলেই হয়ত পূর্ব্ববঙ্গ গীতিকায় আশ্চর্য্যজনক ভাবে এই দ্বন্দ্ব পরিস্ফুট হয়েছে। সত্যিকার জীবন-সজ্ঘাত (এবং সে সজ্ঘাত নিত্যকার ব্যাপারকে আশ্রয় করে) তাদের ভেতর এমন একটা স্পষ্ট মানবিকতা সঞ্চার করেছে, যার তুলনা বাংলা সাহিত্যেই বেশী নেই। কিন্তু এই সাহিত্য যথেষ্ট প্রাচীন কিনা সন্দেহ এবং সে সন্দেহের কারণও এই। অন্ততঃ এই পর্য্যায়ের সাহিত্য যে প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করেনি, তা মঙ্গলকাব্য, পাঁচালী বা কীর্ত্তনাঙ্গের রচনাগুলি পড়লেই বেশ বোঝা যায়।

এর পর এলো যাত্রা। আজ যদিও মনে করা হয় যে যাত্রা জিনিষটা বহু প্রাচীন, কিন্তু আসলে তা নয়। যাত্রাও একালেরই জিনিষ। সহরে থিয়েটার যখন আস্তে আস্তে মাথা তুলছে, গ্রামে তখনই বা তার অল্প আগেই যাত্রা দেখা দিয়েছে। গোপাল উড়ের 'বিদ্যাসুন্দর' গানই বোধ হয় প্রাচীনতম যাত্রার নিদর্শন। 'কমলে

কামিনী', 'উষা-হরণ' আর যে সমস্ত পুরাণো পালা ছিল, তা সম্ভবতঃ ওরই সমসাময়িক এবং আকারে নাটক হলেও, প্রকারে সেই মঙ্গল-কাব্যেরই অনুবৃত্তি। কিন্তু এ সমস্ত বই ছাপা হয়নি। অধিকারীদের খাতায় এরা লেখা থাকতো এবং পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি রূপে হস্তান্তরিত হয়ে চলতো। এই সব যাত্রাগানের একটি মাত্র পালা ছাপা হয়েছিল, সে হল তারাচাঁদ শিকদারের 'ভদ্রার্জ্জুন' নাটক। বাংলা ভাষার এই প্রথম নাটক। এই বই মফঃস্বলে কোথাও অভিনীত হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু কলকাতার তদানীন্তন রঙ্গমঞ্চে এর স্থান হয়নি। সহুরে রঙ্গমঞ্চের সর্ব্বপ্রথম নাটক হল রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব'। আশ্চর্য্যের বিষয়, ভগবৎ মহিমাত্মক পৌরাণিক আখ্যান ছেড়ে, সামাজিক সমস্যা নিয়ে এই বইটি লেখা হয়েছিল!

টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' যেমন বাংলা ভাষার প্রথম উপন্যাস, 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব' তেমনি প্রথম নাটক এবং দুয়েরই অবলম্বন সমসাময়িক জীবন। কিন্তু টেকচাঁদ প্রথম-ইংরেজী-শেখার নেশায় উদভ্রান্ত 'ইয়ং বেঙ্গল'কে বিদ্রূপ করেছিলেন, আর রামনারায়ণ করেছিলেন প্রাচীনপন্থী হিন্দুদের গোঁড়ামিকে বিদ্রূপ। তদানীন্তন কুলীন সমাজে বহু-বিবাহের উৎপাতে কি ধরণের কদাচার সব প্রবেশ করেছিল, তাই দেখানোর জন্যেই এই বই লেখা এবং সে লেখায় যথেষ্ট মুন্সিয়ানা আছে। একটি বিবাহ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ বহু বর্ষ পূর্ব্বে এক কুমারীর পাণিগ্রহণ করেছিলেন। দারিদ্র্যের দায়ে অনেককাল পরে, প্রণামী নেবার প্রয়োজনে সেই পত্নীর সন্ধানে তিনি শ্বশুরবাড়ী আসছেন—পথে পুকুরঘাটে এক বর্ষীয়সী মহিলাকে দেখলেন—তাঁকে মাতৃ-সম্বোধন করে শ্বশুর-ভবনের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। পরে, শ্বশুরবাড়ী এসে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন যে ঐ মহিলাই তাঁর একদা-

বিবাহিতা পত্নী! মোটের ওপর কাহিনীটি এই—এর ভেতর ফলার মহিমা আছে, ধর্ম্মাধর্ম্মের বিবাদ আছে, তদানীন্তন সামাজিক রীতি-নীতির অনেক রকম কৌতুকপ্রদ চিত্র আছে—সব শুদ্ধ জড়িয়ে পড়তে ভালোই লাগে। বিদ্যাসাগরী আবহাওয়ায় ঘরোয়া কথ্যভাষার ব্যবহারও এর একটি লক্ষ্যণীয় গুণ। চরিত্রের ক্রমপরিণতি বা চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত বা ঘটনার আবর্ত্তে জীবনের অভাবনীয় রূপান্তর ইত্যাদি উচ্চাঙ্গের নাটকীয় বৈশিষ্ট্য অবশ্য কিছুই এতে নেই। এ একটি হাল্কা প্রহসন, এবং এই প্রহসন লেখায় তর্করত্ন বেশ কৃতিত্বই দেখিয়েছেন! 'রুক্মিণী হরণ' এবং 'নব নাটক' বলে তাঁর আরো দু'খানি নাটক আছে। সে দু'খানি 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্বে'র তুলনায় নিতান্তই কাঁচা লেখা।

[২]

তর্করত্নের অল্প পরে মাইকেল। মাইকেল সর্ব্বপ্রথম নাট্যকার রূপেই বাংলা সাহিত্যে দেখা দিয়াছিলেন এবং ঐতিহাসিক নাটক, বিয়োগান্তক নাটক, ভদ্রজাতের প্রহসন, সবই বাংলা ভাষায় প্রবর্ত্তিত করেছেন তিনি। সুপণ্ডিত মাইকেল গ্রীক, রোমান, ইংরেজী, ফরাসী, জার্ম্মাণ এবং সংস্কৃত নাট্য সাহিত্য মন্থন করেছিলেন। দেশ-বিদেশের টেকনিক ও আদর্শের সঙ্গে তাঁর ছিল সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয়। তার ফলে বাংলা নাটকে তিনি নূতন জিনিষ অনেকই এনেছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, নাট্য-সাহিত্যে তিনি প্রাণ-সঞ্চার করতে পারেন নি। পাত্র-পাত্রীর কথাবার্ত্তার ভেতর দিয়ে একটা গল্প গড়ে গেলেই বা বাইরে ঘটনার ঘনঘটা সৃষ্টি করে, অভিনয় জমাতে পারলেই যে নাটক হয় না, একথা মাইকেল অবশ্যই জানতেন। কিন্তু মাইকেলের কবি-

দৃষ্টিতে সেই তীক্ষ্ণ অন্তর্মুখিতা ছিল না, যা বাইরের ঘটনাকে আশ্রয় করে মানুষের হৃদয়-রহস্য পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারে। তাই কাব্যেই হক, আর নাটকেই হক, তাঁর আবেদন কোনদিনই মর্ম্মাভিমুখী হতে পারেনি। কাব্যে শব্দ-গাম্ভীর্য্য এবং উপমা-চাতুর্য্য দিয়ে তিনি যাহক মানিয়ে নিয়েছেন, কিন্তু নাটকে তা বিসদৃশ হয়ে উঠেছে। কোন চরিত্রই জীবন্ত হয়নি, সবাই হয়েছে পুতুল নাচের পুতুলদের মতো সাজানো-গোজানো, চলৎশক্তি-সম্পন্ন, কিন্তু প্রাণহীন। শর্ম্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, কৃষ্ণকুমারী, তিনেরই অবস্থা এক।

এর ওপর নাটকে মাইকেলের ভাষাও অত্যন্ত খোঁড়া। বাংলা গদ্য এমনিই তিনি ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন নি, তার ওপর আবার এই বইগুলিতে তিনি চালিয়েছিলেন চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সঙ্গেই দীর্ঘ সমাস-সন্ধি সম্বলিত তথাকথিত বিদ্যাসাগরী ভাষা যা, কথাবার্ত্তার ক্ষেত্রে একেবারেই অচল! দীর্ঘ বক্তৃতা, অনাবশ্যক প্রাকৃতিক বর্ণনা, অর্থহীন উচ্ছ্বাস, এই বইগুলোর প্রতিটি ছত্র এমনি ভারাক্রান্ত করে রেখেছে যে আজ এদের চেষ্টা করেও পড়া কঠিন। কিন্তু মাইকেলের প্রহসন দুটি চমৎকার। একটিতে হিন্দুয়ানির নামাবলী-ঢাকা চরিত্রহীন গ্রাম্য জমিদারের এবং অপরটিতে সংস্কৃতির গিল্টি-করা বয়াটে ইয়ং বেঙ্গলের চরিত্র চিত্রিত হয়েছে। ঘটনার অভিনবত্বে, ভাষার কায়দায়, সর্ব্বোপরি সত্যকার জীবন-চিত্রণে এই দুটি বইয়ে যে নিপুণতা প্রকাশ পেয়েছে, তা দীনবন্ধুকে মনে করিয়ে দেয়। মনে হয়, পাণ্ডিত্য এবং কেতাব-কৌলীন্যের মোহ একটু কম থাকলে, মাইকেল ভালো নাটকই লিখতে পারতেন। কিন্তু স্বভাবসুলভ শিক্ষাভিমান তাঁর সব রচনার মতো নাট্যরচনারও সর্ব্বনাশ করেছে।

দীনবন্ধু শিক্ষিত বিশেষ ছিলেন না, কিন্তু জীবনে অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র তাঁর ছিল অনেক বড়। সরকারী চাকরির খাতিরে তাঁকে নানাস্থানে বেড়াতে হয়েছে, ছোট বড় নানা স্তরের লোকের সঙ্গে মিশতে হয়েছে—এবং যেহেতু তাঁর প্রকৃতিতে মাইকেলের মতো শিক্ষাভিমান এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মতো জাত্যভিমান ছিল না, সেই জন্যে তিনি সমাজ-জীবনের নিম্নতম স্তরের সঙ্গেও অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশতে পেরেছিলেন। এই প্রত্যক্ষ সংস্রব তাঁকে দিয়েছিল সৃষ্টির প্রেরণা এবং এখান থেকেই তিনি আহরণ করেছিলেন তাঁর রচনার উপকরণ। এক দিকে বঙ্কিম যখন রাজা-বাদশাদের, বীরদের, সন্ন্যাসীদের মহিমান্বিত কাহিনী নিয়ে উপন্যাস লিখছেন, আর মাইকেল লিখছেন দেবদেবীদের এবং তাঁদেরই সমকক্ষ নরনারীদের জীবন নিয়ে কাব্য, দীনবন্ধু সেই দিনে কি করে নিরন্ন চাষার দুঃখে বিগলিত হয়ে 'নীল দর্পণ' লিখলেন (উভয়েরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে) ভেবে সত্যিই অবাক হতে হয়! আজকে কোমর বেঁধে গণ-সাহিত্য সৃষ্টি করার রেওয়াজ হয়েছে। কিন্তু যেদিন আবহাওয়ায় তার বাষ্পটুকুও ছিল না, সেদিন উদার মনুষ্যত্বের প্রতি এই সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে তাকানোর প্রেরণা এলো কোথা থেকে? এর মূলে ছিল দীনবন্ধুর মন এবং দৃষ্টির সহজ প্রসন্নতা, যা বিলাতী শিক্ষার বা বর্ণাশ্রমিক আভিজাত্যের অহঙ্কারে আচ্ছন্ন হয়নি, সত্যকার জীবন ও তার বেদনা থেকে যার জন্ম।

'নীল দর্পণ' সমাজহিতে যা করেছে, তার মূল্য সমধিক হলেও সাম্প্রতিক। সাহিত্য হিসাবেও নীলদর্পণে অসঙ্গতির অভাব নেই। (প্রকাশ্য-রঙ্গমঞ্চে নারী-নির্য্যাতন, উৎপীড়িত গৃহস্থের আত্মহত্যা, কুলমহিলার সুদীর্ঘ প্রেমপত্র পাঠ প্রভৃতি বহু জিনিষই এতে আছে, যা নাটকীয় সংস্থান জ্ঞানের প্রতিকূল, তা ছাড়া এর আখ্যানাংশেও

যথেষ্ট ধারাবাহিকতা এবং চারিত্রিক পারম্পর্য্য নেই।) তা সত্ত্বেও 'নীল দর্পণে' সত্যিকার জীবন আছে, তার বেদনা আছে, যা বঙ্কিম-মাইকেলে অপ্রত্যাশিত। কিন্তু দীনবন্ধুর এই বস্তুতান্ত্রিকতা অধিকতর খ্যাতিমান সমসাময়িকদ্বয়ের আদর্শবাদের তলায় চাপা পড়ে যায়। পরবর্ত্তী সাহিত্যে তাই তাঁর প্রভাব পড়ে নি।

আগেই বলেছি দীনবন্ধু কোমর-বাঁধা বামপন্থী ছিলেন না, তিনি ছিলেন বাস্তববাদী, তাই তিনি যখন সম্পন্ন গৃহস্থদের নিয়ে লিখেছেন, তখনো তাঁর সেই দরদী দৃষ্টিই দেখা যায়, যা দেখা যায় নিরন্ন কৃষকের জীবন-চিত্রণে। জীবনকে তার স্বাভাবিক আবেষ্টনী থেকে তিনি সংগ্রহ করতেন এবং সেই সাধারণের ভেতরই যেখানে তিনি যেটুকু অসাধারণ পেতেন, তাকে ফুটিয়ে তুলতেন নিপুণ শিল্পীর মতো। এই দৃষ্টি-নৈপুণ্যের গুণেই প্রপাগ্যাণ্ডা-প্রধান হয়েও 'নীল দর্পণ' এত আন্তরিক হতে পেরেছে, আপাতভাবে প্রহসন হয়েও 'সধবার একাদশী' এমন সত্যি জাতের নাটক হতে পেরেছে।

'সধবার একাদশী' নিয়ে পুস্তকান্তরে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি, কাজেই আর পুনরুক্তি করবো না। শুধু এইটুকু বলে রাখা দরকার যে, এই বইয়ের সূচনায় তদানীন্তন রুচি অনুযায়ী ইয়ং বেঙ্গলকে নিয়ে ঠাট্টা করবার জন্যেই দীনবন্ধু কলম ধরেছিলেন, কিন্তু তাঁর অজ্ঞাতসারেই তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলো জীবন্ত হয়ে, তাঁর মমতার ওপর চড়াও করে বসেছে। যে নিমে দত্তকে তিনি উপহাস করবার জন্যেই আসরে নামিয়েছিলেন, সেই শিক্ষিত এবং আদর্শ-বিপর্য্যয়ে উদ্‌ভ্রান্ত ইয়ং বেঙ্গলের ট্র্যাজেডীটাই শেষ পর্য্যন্ত এই বইয়ে মহান হয়ে উঠেছে। অটল, তার রক্ষিতা কাঞ্চন এবং খোদ নিমে দত্ত ইংরেজীয়ানার নামে যে সর্ব্বনাশের আগুন জ্বালিয়ে তুললো, তাতে অন্তঃপুরের শালীনতার

সঞ্চয়টুকু পর্য্যন্ত একদিন পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। বাইরে হাস্য-পরিহাস, মদ্যপান এবং কবিতার আবৃত্তি দিয়ে এই ট্র্যাজেডিটা দীনবন্ধু চেপে রেখেছেন। কিন্তু এই অন্তর্গূঢ়তাই 'সধবার একাদশী'কে দিয়েছে সেই অসামান্যতা, যা এর পূর্ব্বের বা পরের আর কোন বাংলা নাটকেই সুলভ নয়।

শোনা যায়, মাইকেল মধুসূদনকে ক্যারিকেচিওর করেই দীনবন্ধু নিমে দত্তকে গড়েছিলেন। মাইকেলের ব্যক্তি-জীবন দীনবন্ধুর কতটা লক্ষ্য ছিল তা বলতে পারি না, তবে মাইকেলের 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনটি যে 'সধবার একাদশী'র প্রেরণা জুগিয়েছিল, এ নিঃসন্দেহ। সেখানেও ইয়ং বেঙ্গল নববাবু, তার রক্ষিতা পয়োধরী এবং একটি শিক্ষিত মোসাহেব নিষ্ঠাবান পিতার নৈতিক অনুশাসনকে উপেক্ষা করে বেয়াড়া পথে পা বাড়িয়েছে। 'জ্ঞান-তরঙ্গিণী' সভার নাম করে মদ্যপান এবং লাম্পট্যলীলার যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে। দীনবন্ধুর আখ্যানাংশও প্রায় তাই, কিন্তু উভয়ে বিন্যাসের কি তফাৎ! মাইকেল বাইরে থেকে গল্পটা সাজিয়ে গেছেন মাত্র, আর দীনবন্ধু বাইরের গল্পকে আশ্রয় করে চলে গেছেন অন্তর-লোকে, যেখানে সমবেদনার সকরুণ মহিমায় ব্যভিচারও হয়ে উঠেছে মহনীয়! এই নাট্য-নৈপুণ্যকে নিঃসঙ্কোচে মলেয়ারের সমপর্য্যায়ভুক্ত বলতে পারি। কিন্তু বাংলা লেখাকে বাঙালী পাঠক এত চড়া দাম দিতে কি প্রস্তুত হবেন?

'বিয়ে পাগলা বুড়ো'তে বগী-বিন্দীর লড়াই, 'জামাই বারিকে' জামাই গোষ্ঠীর খোঁয়াড়ে মাণিক পীরের গান, 'নবীন তপস্বিনী'তে হোঁদল কুঁতকুঁতের (এই চরিত্রটি Merry Wives of Windsor থেকে নেয়া। বোধ হয় এই একমাত্র চরিত্র, যা দীনবন্ধু বই থেকে

আহরণ করেছেন) অভিসার, অবশ্যই উপভোগ্য। কিন্তু সমগ্রভাবে এই বইগুলো তেমন উৎরায় নি। তাছাড়া, প্রথম দু'খানি বই ভদ্র-রুচির বিচারে স্থানে স্থানে আপত্তিকর। অবশ্য দীনবন্ধুর প্রসঙ্গে রুচির প্রশ্ন বরাবরই আছে। এদিক থেকে তিনি সত্যিই ছিলেন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য। কিন্তু মনে রাখতে হবে, তাঁর অবলম্বিত চরিত্র ও তাদের কার্য্য-কলাপ নিখুঁতভাবে আঁকতে হলে, অশ্লীলতাকে ষোল-আনা এড়াবারও উপায় ছিল না। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে দীনবন্ধু মতবাদপীড়িত পাদ্রী ছিলেন না, তিনি ছিলেন দরদী ভদ্রলোক!

[৩]

দীনবন্ধুর অল্প পরে এবং গিরিশ ঘোষ প্রমুখ নাট্যকারের অল্প আগে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মনোমোহন বসু কয়েকখানি নাটক লিখেছিলেন। সেই সব নাটক তখনকার দিনে সমাদৃতও হয়েছিল। এইখানে বলে রাখা দরকার যে, তখনো দেশে প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় নি বা নাট্যাভিনয়কে ব্যবসাতেও রূপান্তরিত করা হয় নি। কাজেই রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল এবং দীনবন্ধুর সমস্ত নাটকই অভিনীত হয়েছিল ঘরোয়া ষ্টেজে। পাথুরেঘাটায়, আরো কোথায় কোথায় যেন তখনকার ধনীদের বাড়ীতে বাঁধা-ষ্টেজ ছিল। জোড়া-সাঁকোর ঠাকুরবাড়ীরও ছিল একটা নিজস্ব ষ্টেজ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী,' 'অলীক প্রকাশ' ইত্যাদির অভিনয় সম্ভবতঃ তাতেই প্রথম হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনা 'বাল্মিকী-প্রতিভা'ও ঠাকুরবাড়ীর ঘরোয়া ষ্টেজেই অভিনীত হয়েছিল। গিরিশ ঘোষের উদ্যোগে বাংলা দেশে প্রথম পাব্লিক ষ্টেজ স্থাপিত হল এবং নাট্যাভিনয় ব্যবসা হিসাবে সুরু হল। বলা বাহুল্য, রঙ্গমঞ্চের প্রসার

হলে, নাটকেরও চাহিদা বাড়ে। তাই প্রকাশ্য রঙ্গমঞ্চের জন্ম হবার পর, ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই বাংলা নাটক হু হু করে বিস্তার লাভ করলো। রাজকৃষ্ণ রায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, বাংলা দেশে যাঁরা নাট্যকার রূপে প্রসিদ্ধ, তাঁদের সকলেরই আবির্ভাব এর পর থেকে। কিন্তু এঁদের সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রম,' 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী' প্রভৃতি নাটক রচনার দিকে থেকে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' বা দীনবন্ধুর 'কমলে কামিনী'র সমগোত্রীয়। নাটকীয় বৈশিষ্ট্য তাদের কিছুই নেই, অবশ্য প্রথম আমলের ঐতিহাসিক নাটক হিসাবে কিছু ঐতিহাসিক মূল্য তাদের আছে। সরোজিনী নাটকের 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ' গানটির এক সময় বিশেষ খ্যাতি ছিল। (যদিও শোনা যায়, গানটি রবীন্দ্রনাথের লেখা।) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'অলীক প্রকাশ' বইটি কিন্তু ওরই মধ্যে বেশ উজ্জ্বল। ব্রাহ্ম আবহাওয়ায় তৈরী বলে, এই বইয়েই প্রথম শিশ্নোদর ঘটিত রসিকতার—যা আমাদের মৃত্তিকার সনাতন ফসল—স্থানে বিশুদ্ধ সমাজসম্মত রীতির হাসি দেখা দেয়। সে হিসাবে 'অলীক প্রকাশ' বাংলা কমিক-নাট্যের ইতিহাসে একটি Land-mark—রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা,' 'শেষরক্ষা' বা 'চিরকুমার সভা'র সুযোগ্য অগ্রদূত। তাছাড়া, ইয়ং বেঙ্গল বা ওল্ড বেঙ্গল বা এমনি কোন একটা নির্দ্দিষ্ট টাইপ ছেড়ে, সর্ব্বসাধারণের জীবন থেকে আহরণ করে, কৌতুক হাস্যের উপকরণ সংগ্রহ করার ব্যাপারেও এই বইটি পরবর্ত্তী লেখকদের যথেষ্ট প্রেরণা দিয়েছে। স্বর্গীয় প্রিয়নাথ সেনের প্রশংসায় অত্যুক্তি আছে ঠিকই, কিন্তু 'অলীক প্রকাশ' বই যে সুখপাঠ্য এবং সুলিখিত তা নিঃসন্দেহ।

মনোমোহন বসুর 'সতী' নাটক বা 'হরিশ্চন্দ্র' নাটক সম্ভবতঃ হিন্দু মেলার যুগে লেখা, অর্থাৎ গিরিশচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলালের আবির্ভাবের আগে। বইগুলি অপাঠ্য এবং এদের আলোচনাও আপাততঃ নিষ্প্রয়োজন। সতী নাটকের একটা গান 'দিনের দিন হয়ে দীন' একদা বাংলা দেশে বিশেষ প্রচার লাভ করেছিল। শুনেছি, এই গানের জন্যেই নাকি ঐ নাটকের অভিনয় সরকার থেকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর আধুনিক পলিটিক্স চালিয়ে, কবি সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু যে কারণে মুকুন্দ দাসের যাত্রা আমার ভালো লাগতো না, সেই কারণেই এই নাটকও আমার অসহ্য ঠেকেছে। 'পদ্মমালা'র মতো চমৎকার বই যাঁর হাত থেকে বেরিয়েছে, নাটকে তাঁর কলম এত ভোঁতা হল কি করে, সেটা অবশ্যই ভাববার কথা! উপেন্দ্রনাথ দাসের 'শরৎ-সরোজিনী' এবং 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' নামে আর দু'খানা নাটকেরও এই সময় চল ছিল। রচনার দিক থেকে এ দুটি বইও নিতান্তই বৈশিষ্ট্যহীন।

[৪]

এর পর বাংলা নাট্য-সাহিত্যের আধুনিক অধ্যায় এবং এই অধ্যায়ের প্রথমেই পড়েন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র এদেশে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের সেক্সপীয়ার এবং বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চের গ্যারিক বলে সম্মানিত হয়ে থাকেন। তাঁর নামে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়েছে। তাঁর নামে পার্ক হয়েছে—তাতে তাঁর মর্ম্মর মূর্ত্তি স্থাপিত হয়েছে। ইংরেজী ও বাংলায় তাঁর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে অনেকগুলি বইও লেখা হয়েছে। যে দেশে মধুসূদন, বঙ্কিম, দীনবন্ধুকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না দিলে চেনার সুযোগ নেই, সে দেশে

এতখানি শ্রদ্ধা ও সমাদর লাভ, আর যাই হক ভাগ্যের কথা। কিন্তু এতখানি দেশজোড়া খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠার মাঝখানে যাঁর আসন, তাঁর লেখা যে সত্যিই এতটার যোগ্য নয়, এ কথা অপ্রিয় হলেও, না বলে উপায় নেই। এক এক করে গিরিশচন্দ্রের পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রায় সমস্ত নাটকই পড়েছি। কোনখানার কোন জায়গাই ভালো লাগেনি এমন নয়। 'জনা'য় প্রবীরের মৃত্যুর পর উন্মাদিনী জনার বিদ্রোহ, 'পাণ্ডব-গৌরবে' কৃষ্ণের সঙ্গে ভীমের ভক্তি-দ্বন্দ্ব, 'বিল্বমঙ্গলে' চিন্তামণির বৈরাগ্য, এম্নি টুকরো টাকরা অনেক দৃশ্যই বেশ লেগেছে—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নাটক বলতে যা বোঝায়, গিরিশচন্দ্রে তা কোথাও পাইনি।

তাঁর চরিত্রগুলো রক্ত-মাংসের মানুষ নয়, জীবন-দ্বন্দ্বে তাদের কোন রূপান্তর হয় না, তারা লাফায় ঝাঁপায়, কাঁদে কাটে, যুদ্ধ করে—কোনটাই কোন অবশ্যম্ভাবিতার নির্দ্দেশ দেয় না। আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের, ঔচিত্যের সঙ্গে সম্ভাব্যতার সঙ্ঘর্ষ থেকে যে দ্বন্দ্ব তরঙ্গিত হয়ে ওঠে এবং সেই তরঙ্গের আবর্ত্তনে বিভিন্ন চরিত্র নানা খণ্ড অভিব্যক্তির ভেতর দিয়ে যে এক অখণ্ড পরিণতিতে গিয়ে পৌছায়, তাই হল নাটকের প্রাণ-বস্তু। এ জন্যে নাটকে যে সমস্ত মুখ্য এবং গৌণ চরিত্রের অবতারণা করতে হয়, তাদের প্রত্যেকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাদের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়ে ভাবী পরিণতির বীজটিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার হয়। বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত এই প্রচ্ছন্ন বীজটিকে যখন পল্লবিত করে তোলে, তখন আপাতদৃষ্টিতে বিভিন্ন চরিত্রের বিভিন্নমুখী কার্য্য-কলাপের ধারা সেই এক এবং অদ্বিতীয় কেন্দ্রে এসেই মেলা প্রয়োজন। সেক্সপীয়ার, মলেয়ার, গ্যেটে, শিলার, ভিক্টোর হুগো,

ইবসেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের যে কোন একজনের রচনা নিয়ে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, এই হল বনিয়াদী নাটকের কুল-লক্ষণ। গিরিশচন্দ্রের নাটকে নাট্যবস্তুর এই প্রাণ-শক্তি কোথাও নেই, তাঁর সৃষ্ট কোন চরিত্রেই তাই নেই বিন্দুমাত্র অনিবার্য্যতার পরিচয়। তাদের জন্ম গল্পের ফরমাসে। তারাই গল্পকে তৈরি করে না, গল্পই তাদের সৃষ্টি করে। 'পাণ্ডব গৌরব,' 'জনা,' 'সীতার বনবাস', 'বিল্বমঙ্গল', 'শঙ্করাচার্য্য', 'বুদ্ধদেব', 'করমেতিবাই', 'রাণা প্রতাপ', 'অশোক', যে কোন বই থেকেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে।

তবু ঐতিহাসিক এবং পৌরাণিক নাটকের এই অন্তঃসারহীনতা বক্তৃতার বা ঘটনার ঘনঘটায় কতকটা ঢাকা পড়েছে। অন্ততঃ অভিনয়ে তারা জমে ভালোই! কিন্তু সামাজিক নাটকে এই ত্রুটি যে কতখানি মারাত্মক হয়েছে, 'প্রফুল্ল' এবং 'বলিদানে'র পাঠক তা নিশ্চয় লক্ষ্য করে থাকবেন।

বিপদ হয়েছে পদে পদে সেক্সপীয়ারকে অনুসরণ করায়। সেক্সপীয়ার যখন নাট্য-সাম্রাজ্যের শাহান শাহা, তখন তাঁর টেকনিক নিতেই হবে, আবার হিন্দু ধর্ম্মানুমোদিত অলৌকিকতা, আস্তিক্য বুদ্ধি এবং ভক্তি-প্রবণতার মর্য্যাদাও রক্ষা করতে হবে। তাই দুয়েই মিশিয়ে এই জগা-খিচুড়ী বানানো ছাড়া আর উপায় কি? কিন্তু সেক্সপীয়ারের যেখানে সত্যিকার শক্তি, তা ত আর নকলে আয়ত্ত হয় না, তাঁর দোষগুলিকেই নকল করা সহজ। গিরিশচন্দ্র তাই করেছেন। ফলে তাঁর নাটকেও সেক্সপীয়ারোচিত খুন-খারাবত, আত্মহত্যা, উন্মত্ততা, ব্যভিচার, বজ্জাতির ছড়াছড়ি হয়েছে, কিন্তু সেক্সপীয়ারের মতো অসামান্য কবিত্বের এক বিন্দুও প্রকটিত হয় নি কোন জায়গায়। অর্থাৎ সোজা করে বললে, এই বলতে হয় যে গিরিশচন্দ্রের দৃষ্টি অত্যন্ত স্থূল, তা

মর্ম্ম পর্য্যন্ত পৌঁছায় না। নাটকের মতো একই সঙ্গে subjective ও objective রচনার পক্ষে তা সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

গিরিশচন্দ্রের ছন্দ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে যে বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তাও অর্থহীন এই জন্যে যে নাটকে ভাঙা-চোরা অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথাবার্ত্তা চালানোর প্রবর্ত্তন গিরিশচন্দ্র করেননি, করেছেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মাইকেলই। পদ্মাবতী নাটকে দেখুন—

আমি কলি
কে না কাঁপে প্রতাপে আমার? ইত্যাদি।

গিরিশচন্দ্রের অনুবাদিত নাটক 'ম্যাকবেথ', গীতিনাট্য 'আবুহোসেন' এবং ঐতিহাসিক নাটক 'কালাপাহাড়' আমার মতে তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা। নাট্য রচনায় তাঁর যদি কিছু কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়ে থাকে ত এই তিনখানি বইয়ে। কিন্তু এইটুকুর জন্যেই কি তাঁকে আমরা বাংলার সেক্সপীয়ার বলবো?

দ্বিজেন্দ্রলাল গিরিশচন্দ্রের চেয়ে অনেক বড় লেখক। শব্দশিল্পী হিসাবে তাঁর জুড়ী লেখক বাংলা ভাষাতেই দু'তিন জনের বেশী জন্মেছেন কি না সন্দেহ। চলতি ক্রিয়াপদ ও সর্ব্বনামের সংযোগে ধ্বনিবহুল অলঙ্কৃত গদ্য প্রবর্ত্তন করে, তিনি বাংলা ভাষার প্রকাশ-শক্তিকে যে যথেষ্ট বাড়িয়ে দিয়েছেন, এ কথা সকলেই স্বীকার করবেন। বিচিত্র ধরণের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ প্রয়োগে, উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও যমকের ব্যবহারে তাঁর রচনার ঐশ্বর্য্য শিল্প-রসিক মাত্রকেই মুগ্ধ করবে। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য যদি কিছু থাকে ত সে এই শব্দ-শিল্পে।

যে অবাস্তবতা ও অন্তশ্চেতনাহীন বহির্মুখিতা গিরিশ ঘোষের নাটকগুলোকে অগভীর এবং অমনস্তাত্ত্বিক করেছে, দ্বিজেন্দ্রলালের

নাটক তা থেকেও রক্ষা পেয়েছে এইজন্যে যে দ্বিজেন্দ্রলালের দৃষ্টি অন্তর্মুখী। ভাষার অবকাশ পথে তাঁর নাট্য-বস্তুর মর্ম্ম পর্য্যন্ত যাওয়া যায়, অবচেতনার পরস্পর-বিরোধী ভাব ও বৃত্তির সঙ্ঘাত যে কি করে বহির্ঘটনায় রূপায়িত হচ্ছে, তা বোঝা যায়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালেও একটি বিপদ আছে। দ্বিজেন্দ্রলালের মনোধর্ম্ম এত বেশী আত্মকেন্দ্রিক যে সমস্ত চরিত্রের ভেতর দিয়েই কবির ব্যক্তি-রূপটিই ফুটে ওঠে, কোন চরিত্রই স্ব স্ব স্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় না। কাজেই তাদের মধ্যে একের সঙ্গে অন্যের এবং সকলের সঙ্গে সকলের ভাবিক সঙ্ঘাত থেকে নাটকের কথাবস্তু যে সমস্ত পরিণতির সম্মুখীন হয়, তাও সত্যসম্মত পথে হয় না।

নাটকে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব হল প্রচ্ছন্ন। তিনি থাকেন পশ্চাৎপটে এবং সেখান থেকে প্রত্যেকটি চরিত্রকে তার নিজস্ব উপাদান নিয়ে আপন প্রাণ-বেগে ফুটে উঠবার প্রেরণা দেন। মানুষের সঙ্গে মানুষের মানসিক সংস্থানে যে বৈষম্য, তাই হল ব্যক্তি-দ্বন্দ্বের মূল। সুতরাং সেই দ্বন্দ্বকে কেন্দ্র করে শিল্প সৃষ্টি করতে হলে, মানুষের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রশ্নটা বাদ দিলে চলে না। দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য ইচ্ছা করে এটা করেননি। তাঁর lyric মন নাটকীয় আত্মসঙ্কোচনকে স্বভাবধর্ম্মেই আয়ত্ত করতে অপারগ হয়েছে। এই জন্যে দ্বিজেন্দ্রলালের কোন নাটকই যথার্থ নাটক হতে পারেনি। তাঁর সর্ব্বোৎকৃষ্ট তিনখানা বই ধরুন, 'শাজাহান', 'চন্দ্রগুপ্ত', আর 'পাষাণী।' ভাষা বিন্যাসের দিক থেকে এই তিনখানি বইয়ের জুড়ী লেখা বাংলা ভাষাতেই কম আছে, কিন্তু এরা কি সত্যিজাতের নাটক? আলেকজেণ্ডার যে ভাষায় ভারতের শোভা-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করছেন, চাণক্য সেই ভাষাতেই করছেন মাতৃ-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন, দারা যে ভাষায় অত্যাচারিত মানবতার বাণী ঘোষণা করছেন,

শাজাহান সেই ভাষাতেই করছেন আপনার বন্দী-দশা নিয়ে বিলাপ, ইন্দ্র যে ভাষায় করছেন অহল্যাকে প্রলুব্ধ, গৌতম সেই ভাষাতেই বলছেন তাঁর জন্যে ক্ষমামিশ্রিত বেদনার স্বস্তি-বাচন! অর্থাৎ সব ক'টি চরিত্রকে অভিভূত করেই প্রকটিত হচ্ছে একটি মাত্র ব্যক্তির অন্তশ্চেতনা এবং সে ব্যক্তিটি স্বয়ং কবি। তিনখানি বইয়েই বহির্ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে কবি যে পরিণতিতে এসেছেন, তা চরিত্র-গুলির স্বাভাবিক প্রবণতা ও স্বধর্ম্ম অনুসারে হয়নি, হয়েছে কবির একক মনোধর্ম্মের প্রভাবে। এই মহৎ দোষেই অতখানি ভাষা সম্পদ নিয়েও কবি কোনটাতেই অবিমিশ্র সাফল্য লাভ করতে পারেন নি।

ভাষা বিন্যাসে দ্বিজেন্দ্রলালের নূতনত্বের আমি প্রশংসা করেছি। (ক্রিয়া পদকে বাক্যের আগে বসিয়ে বা নিষ্প্রাণ পদার্থে মানবত্ব আরোপ করে, নূতন ধরণের বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ সৃষ্টি করে, ভাষায় নূতন বেগ সঞ্চার করা, আজ খুব সহজ মনে হলেও, সেদিন সত্যিই খুব সহজ ছিল না।) কিন্তু এই নূতনত্বের মোহেই দ্বিজেন্দ্রলাল কতকগুলি ম্যানারিজমের আবর্ত্তে পড়েছিলেন, যার প্রভাব তাঁর সামাজিক নাটকের সর্ব্বনাশ করেছে। 'পরপারে' নাটকে শান্তার মুখে 'অলস হিংসার মতো', 'মূর্ত্তিমান মৃত্যুর মতো' ধরণের কথা শুনলে সত্যিই হাসি পায়! ঐতিহাসিক বা পৌরাণিক নাটকে পাত্রপাত্রীরা আমাদের কাছ থেকে অনেক দূরে অবস্থিত। তাই তাদের কার্য্য-কলাপ ও কথাবার্ত্তায় অবাস্তবতা বা অতি-রোমান্টিকতা থাকলে, সব সময় সেটা অসহনীয় ঠেকে না। কিন্তু সামাজিক নাটকে এ টেকনিক একেবারেই চলে না। গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', দ্বিজেন্দ্র লালের 'পরপারে', শুধু টেকনিক নির্ব্বাচনের দোষেই সুসাহিত্য হতে পারেনি। (দ্বিজেন্দ্রলাল প্রধানতঃ গদ্যেই নাটক লিখেছেন। 'সীতা',

এবং 'পাষাণী' কেবল অমিত্রাক্ষর পদ্যে লেখা। 'পাষাণী'তে তিনি যে পূর্ণ-পর্ব্বের অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেছেন রাজকৃষ্ণ রায়ের 'লৌহ কারাগারে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রাণী'তেও তাই ব্যবহৃত হয়েছে। মাইকেল, কালীসিংহ বা গিরিশ ঘোষের ভাঙা ছন্দ এঁরা নেন নি।)

[৫]

রাজকৃষ্ণ রায়, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এক সময়ে রঙ্গমঞ্চের প্রিয় লেখক ছিলেন। ভালো লেখা এঁদের তিন জনেরই কিছু কিছু আছে। বিশেষ করে রাজকৃষ্ণ রায়ের। পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক অসংখ্য নাটক তিনি লিখেছিলেন এবং তার ভেতর ভালো নাটকও আছে কয়েকখানি। কিন্তু অতি-লিখনের ফলে এবং অপ-লিখনের আতিশয্যে তাঁর ভালো বইগুলোও চাপা পড়ে গেছে। 'লৌহ কারাগার' নাটকের আগেই উল্লেখ করেছি। এ ছাড়া 'অনলে-বিজলী', 'বনবীর', 'ঋষ্যশৃঙ্গ' ইত্যাদি নাটক বেশ সুলিখিত এবং সুখপাঠ্য। কয়েকখানি প্রহসনও তাঁর বেশ ঝরঝরে। 'পাঁচ ঝাঁটা', 'ষোল বছরের পেত্নী' এম্নি আরো কি-কি বই সব ছেলেবেলায় পড়েছিলাম। তাঁর ভাষায় আছে প্রসাদ গুণ, রচনায় আছে স্বচ্ছতা, ঘটনা-বিন্যাসে আছে প্রচুর হাসি-কান্নার উপকরণ। গভীরতা অবশ্য নেই। পপ্যুলার লেখকের কারই বা তা থাকে? মনে হয়, লেখার বেগ আর একটু কম এবং বিস্তার আর একটু বেশী থাকলে, তিনি সত্যিকার বড় লেখকই হতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাঁর জীবন ও সাহিত্য ঘটনা-চক্রে হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি অপচিত প্রতিভার ইতিহাস, তাই অকৃতজ্ঞ দেশ এত বড় সাহিত্য-কর্ম্মীকে ভুলে গেছে!

অমৃতলালের 'হরিশ্চন্দ্র', 'যাজ্ঞসেনী' ইত্যাদি পৌরাণিক নাটক বা 'হীরক-চূর্ণ' ঐতিহাসিক নাটক গিরিশ-প্রভাবান্বিত এবং সাহিত্য হিসাবে প্রায় অচল। সিরীয়াস সামাজিক নাটক 'তরুবালা'ও তথৈবচ। অবশ্য অমৃতলালের খ্যাতি এজন্যে নয়। বাংলা দেশে তিনি রঙ্গ-রচয়িতারূপেই পারিচিত এবং প্রহসন রচনায় সত্যিই তাঁর বেশ কৃতিত্ব দেখা যায়। 'কৃপণের ধন', 'সাবাশ আটাশ', 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে', 'তাজ্জব ব্যাপার', প্রত্যেকটি বই-ই অব্যাহত আনন্দে পড়ে যাওয়া যায়। মাঝে মাঝে মনকে নাড়া দেবার মতো জিনিষও পাওয়া যায় প্রচুর। 'কৃপণের ধন' এবং 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' অবশ্য মলেয়ারের ছায়া নিয়ে লেখা, কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। পরের বিষয়বস্তুকে নিজের করে নিতে পারেন তিনিই, যাঁর নেবার শক্তি আছে। কিন্তু অমৃতলালের প্রহসনের বিরুদ্ধে দুটো মোটা অভিযোগ আছে—প্রথমতঃ, তাঁর প্রহসনগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় বড় বেশী সাম্প্রতিক—সমসাময়িক কোন ঘটনা বা কোন লোককে ক্যারিকেচিওর করবার জন্যে সেগুলি লেখা। সময়াতিক্রান্ত হয়ে যাবার পর তাদের আর কোন আবেদন নেই বলেই সার্থকতাও নেই। 'সাবাশ আটাশ', 'দ্বন্দ্বে মাতনম', 'তাজ্জব ব্যাপার' সবই এই শ্রেণীভুক্ত। অবশ্য প্রহসন, প্যারডি, স্যাটায়ার ইত্যাদির ধর্ম্মই এই। কিন্তু সামসাময়িক আবেষ্টনী থেকে আহরণ করেও, সেই সাম্প্রতিক উপকরণকে চিরন্তন রসে অভিষিক্ত করা যায় এবং সেই ভাবেই করতে হয় সাহিত্য। নইলে মলেয়ারের 'বুর্জ্জোয়া,' 'ডাক্তার' বা 'কৃপণ' আজও বিমুগ্ধ বিস্ময়ে পড়ি কি জন্যে? 'সধবার একাদশী'ই বা ভালো লাগে কন? অমৃতলালের প্রহসন গুলোয় এই চিরন্তন রসের স্পর্শ নেই। আজ তার বেশীর ভাগই বাসি হয়ে গেছে। দ্বিতীয়তঃ,

অমৃতলালের রসিকতা মোটা ধরণের। বাংলা মৃত্তিকার সনাতন সংস্কার যা, রসনা ও শিশ্ন নিয়ে রসিকতা, তিনি তার উর্দ্ধে উঠতে পেরেছেন কদাচিৎ। দীনবন্ধুতেও এ জিনিষ আছে, কিন্তু দীনবন্ধুর রচনার যে স্রোতস্বিনী গতি, তার মুখে এরা আবর্জ্জনা সৃষ্টি করে দাঁড়াতে পারে নি, যা পেরেছে অমৃতলালে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা স্বীকার্য্য যে অমৃতলাল মানব-চরিত্রের নানা উদ্ভটপণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন এবং সেই পরিচয়কে ফুটিয়ে তোলার প্রতিভাও তাঁর ছিল।

ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' বা 'প্রতাপাদিত্যে' দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটকগুলির ঔজ্জ্বল্য নেই, অথচ তাঁর ত্রুটিগুলো আছে পূর্ণ মাত্রায়। শিশির ভাদুড়ীর অভিনয়-নৈপুণ্যে আলমগীর বাংলা দেশে বহু করতালি লাভ করলেও, সাহিত্য হিসাবে এর বা প্রতাপাদিত্যের বিশেষ কোন মূল্য দিতেই আমি প্রস্তুত নই। ক্ষীরোদপ্রসাদ পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, দেশ-বিদেশের সাহিত্যও পড়েছিলেন অনেক, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, তাঁর স্বরচিত সাহিত্যে তার কোন ছাপ নেই! (অবশ্য এ নিয়ে দুঃখ করতে পারি না। 'কালিদাস ও ভবভূতি' বইয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকের প্রাণ-বস্তু বোঝাতে সমস্ত পৃথিবীর নাট্য-সাহিত্য নিয়ে তুলনায় যে সমালোচনা করেছেন, তাতে নাট্যজ্ঞান এবং মনীষার চূড়ান্ত পরিচয়ই পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর স্বরচিত নাটকও তাঁর পাণ্ডিত্যের অনুরূপ হয় নি।) ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলিবাবা' গীতিনাট্য বোধ হয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে সব চেয়ে বেশী অভিনীত বইয়ের অন্যতম। কিন্তু এই বইয়ে গিরিশচন্দ্রের 'আবুহোসেন' নাটকের কাঠামোকে এমন ভাবেই নকল করা হয়েছে যে কবিকে এজন্যে পৃথক করে করতালি দেওয়া যায় না।

যাই হক, এই তিনজন লেখক দিয়েই আধুনিক নাটকের পালা

শেষ হল। শুধু বাকি রইলেন রবীন্দ্রনাথ, যাঁর নাট্য-সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আমি প্রবন্ধান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। তবু বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এই ধারাবাহিক আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেয়া যায় না, কারণ নাটক রচনা রবীন্দ্রনাথের অসামান্য প্রতিভার একটি গৌণ দিক মাত্র হলেও, তার বৈচিত্র্য এবং সম্পদ বড় কম নয়, বাংলা সাহিত্যের ক্রম-পরিণতির ওপরও তাদের প্রভাব অসামান্য। রবীন্দ্রনাথ যত নাটক লিখেছেন, তাকে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। কাব্য নাট্য 'রাজা ও রাণী', দ্বন্দ্ব-নাট্য 'বিসর্জ্জন', রঙ্গ নাট্য 'চিরকুমার সভা', 'গোড়ায় গলদ' (শেষ রক্ষা), 'বৈকুণ্ঠের খাতা', রূপক নাট্য 'রক্তকরবী', 'অচলায়তন', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা'। 'বিদায় অভিশাপ', 'কর্ণকুন্তী-সংবাদ', 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাট্যাকার কবিতা এবং 'মায়ার খেলা' প্রভৃতি লিরিক-নাট্য আসলে কাব্য সাহিত্যের অন্তর্গত। কাজেই এগুলোকে আর নাটক পর্য্যায়ভুক্ত করে নিয়ে আলোচনা করার প্রয়োজন নেই।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-সাহিত্যের বিস্তৃতি এবং বৈচিত্র্যের কথা আগেই বলেছি। এতদিন পর্য্যন্ত আমাদের নাটক প্রধানতঃ তিনটি বিশেষ ধারা অবলম্বন করে লেখা হত—পৌরাণিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে কোন ভক্তি বা নীতিমূলক আদর্শ দেখানো, নয়ত ঐতিহাসিক কাহিনীর ভেতর দিয়ে দেশাত্মবোধ প্রচার, নয়ত সামাজিক আখ্যায়িকার ভেতর দিয়ে কোন দেশাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন, কিংবা তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। পৌরাণিকে গিরিশচন্দ্র, ঐতিহাসিকে দ্বিজেন্দ্রলাল, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং সামাজিকে দীনবন্ধু, রাজকৃষ্ণ, অমৃতলালের লেখনী সব চেয়ে বেশী খেলেছে। রবীন্দ্রনাথই প্রথমে ছক-বাঁধা উদ্দেশ্যের বাইরে এনে নিছক সাহিত্য রসাশ্রিত নাটক

প্রবর্ত্তন করলেন। তাই চিত্রাঙ্গদায় তিনি পৌরাণিক এবং বিসর্জ্জনে ঐতিহাসিক কাহিনী নিলেও, উভয়ত্রই দৃষ্টি রেখেছেন প্রধানতঃ ভাব-ব্যঞ্জনার প্রতি। চিরন্তন সত্যের দেশ, কাল ও পাত্র নিরপেক্ষ যে আবেদন রবীন্দ্র সাহিত্যের প্রাণ-বস্তু বলে বিবেচিত হয়, রবীন্দ্রনাথের নাটকেও তারই খেলা দেখা যায়। এমন কি, সামাজিক নাটকেও তাঁর অবলম্বিত পদ্ধতি এই। তাও সমাজ প্রচলিত কোন সমস্যা বা টাইপকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে নি, মানুষের যে সমস্ত খেয়াল, বুদ্ধি-বৈকল্য বা বোকামি চিরকালের, তার ওপরই তাদের প্রতিষ্ঠা।

রাজা ও রাণী, চিত্রাঙ্গদা, বিসর্জ্জন, গোড়ায় গলদ, চিরকুমার সভা, বৈকুণ্ঠের খাতা—এই ছ'খানি বই যাঁরা মনোযোগ দিয়ে পড়েছেন, তাঁরাই লক্ষ্য করেছেন যে, এদের চরিত্রগুলো কোন বিশেষ দেশের বা সময়ের নয়, বিশেষ কোন নীতি, মত বা আদর্শেরও তারা বাহন নয়। তারা বিশ্ব-মানবের প্রতিনিধি এবং চিরন্তন রসের অভিষেকেই তারা জীবন্ত। কিন্তু ঠিক এই জন্যেই রচনাংশে রবীন্দ্রনাথের নাটক অপরূপতা লাভ করলেও, নাটক হিসাবে তা উৎরায় নি। পরস্পর-বিরোধী ভাবের প্রতীক রূপে কতকগুলি লৌকিক চরিত্র খাড়া করে, তাদের মধ্যে দিয়ে এক-একটা নিরুপাধিক তত্ত্বকে রূপায়িত করাই হল কবির লক্ষ্য এবং এই লক্ষ্যের অনুপূরক হিসাবেই তাঁর নাটকে আসে নানা শ্রেণীর নর-নারী, যারা কেউই বাস্তব স্ত্রী-পুরুষ নয়, এক-একটি মানবায়িত ভাব। এই নৈর্ব্যক্তিকতার ফলে তাঁর কোন নাটকই বস্তু-সংসারের প্রতিরূপ হতে পারে নি। রূপক-নাট্যে এই Abstraction এত বেশী প্রাধান্য নিয়েছে যে সেগুলোর ব্যঞ্জনা পর্য্যন্ত অনেক সময় পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে না। (বলা বাহুল্য যে গ্রীক ট্রাজেডীতেও তাত্ত্বিকতা আছে, মেটারলিঙ্কের

রূপক-নাট্যেও বাস্তবের রং অত্যন্ত ফিকে এবং রবীন্দ্রনাথের দ্বন্দ্ব-নাট্যে গ্রীক ট্রাজেডীর ও রূপক-নাট্যে মেটারলিঙ্কের প্রভাব সুস্পষ্ট।) নাটকে Objectivityর এই অভাব রবীন্দ্রনাথের কবি-ধর্ম্মের অব্যক্তিক ভাবমুখিতারই আর একটি পর্য্যায়। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথই বাংলা ভাষার একমাত্র লেখক, যাঁর নাটক রঙ্গমঞ্চের বাইরে একক অধ্যয়নে উপভোগ্য। আর সমস্ত বড় বড় নামই মঞ্চ-সমারোহের মুখাপেক্ষী।

(লেখিকাদের মধ্যে স্বর্গীয় স্বর্ণকুমারী দেবী অনেকগুলি নাটক, গীতিনাট্য এবং রঙ্গ-নাটিকা লিখেছিলেন। তার কিছু কিছু অভিনীতও হয়েছিল। রচনার দিক থেকে সে সব নাটকে খুব উঁচু জাতের কোন বৈশিষ্ট্য না থাকলেও, মহিলাদের মধ্যে প্রথম নাটক লিখিয়ে বলেই তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। তাঁর 'দেব কৌতুক নাট্য' প্রভৃতি বই কৌতূহলী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন।)

[৬]

মঞ্চ-সাফল্যের দিক থেকে আর যে সব নাটকের নাম সর্ব্বদাই শোনা যায়—যেমন 'বিজিয়া' (মনোমোহন রায়), 'শিশর কুমারী' (বরদাপ্রসন্ন দাশগুপ্ত), 'বঙ্গে বর্গী' (নিশিকান্ত বসু), 'পৃথ্বিরাজ' (মনোমোহন গোস্বামী), 'মোগল-পাঠান' (সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'ক্ষত্রবীর' (ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), 'দেবলাদেবী' (নিশিকান্ত বসু), 'কর্ণার্জ্জুন' (অপরেশ মুখোপাধ্যায়), 'রাতকানা' (নির্ম্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায়) ইত্যাদি—সেগুলো সাহিত্যের এলাকাভুক্ত নয়। দ্বিজেন্দ্রলাল, গিরিশচন্দ্র বা ক্ষীরোদপ্রসাদের অনুকরণে লেখা অসাহিত্যিক এবং অসার্থক সেই সব রচনা শুধু অভিনয়ের জাঁক-জমকে বাজার মাৎ

করে থাকে। মন্দের ভালো হিসাবে এই বইগুলোর উল্লেখ করলাম, এই জন্যে যে বাংলা নাট্য-সাহিত্যের এইখানেই সমাপ্তি। সমসাময়িক কালের সাহিত্যিকরা কেউ আর উল্লেখযোগ্য নাটক লেখেন নি। সিনেমার অতি-প্রসার হেতু রঙ্গমঞ্চের কদর কমেছে বলেই হক, আর ঐতিহাসিক-পৌরাণিক কাহিনী এ-কালে চলে না, অথচ সামাজিক নাটক লেখার মতো যথেষ্ট আধুনিক ষ্টেজও আমাদের নয় বলেই হক, একালে নাটক লেখাটা সাহিত্যিকদের হাত থেকে থিয়েটার কর্ত্তাদের হাতে চলে গেছে। তাঁরা ভাড়াটে লেখক দিয়ে পৌরাণিক কাহিনী নাটকে রূপান্তরিত করিয়ে নিয়ে, কোন রকমে ব্যবসা বাঁচিয়ে রেখেছেন।

আধুনিককালের অধিকাংশ বাঙালী লেখকই বিশ্বসাহিত্যের অনুশীলন করে থাকেন, অথচ আশ্চর্য্যের বিষয়, ইবসেন, বেয়ার্ণসন, মেটারলিঙ্ক, বার্ণাড শ, গ্যালসওয়ার্দ্দি, উইজেন ওনিল, আন্দ্রিভ, জুডারম্যান, হাউংম্যান, ট্রলার—একালের বহু খ্যাতনামা লেখক সমস্যামূলক নাটকে যে অসামান্যতা দেখিয়েছেন, পুরাতন রোমান্টিক নাটকের উচ্ছেদ করে, তার স্থানে বলিষ্ঠ বাস্তবতার ভিত্তিতে লেখা যে নূতন সামাজিক নাটক প্রবর্ত্তন করেছেন, তা আমাদের সাহিত্যিকদের আদৌ অনুপ্রাণিত করে নি। একাঙ্ক নাটক নামক যে বিশেষ শ্রেণীর 'সাহিত্যিক নাটক' একান্তভাবে একালেরই সৃষ্টি, বাংলায় তা আজো বিশেষ করে লেখাই হয় নি। আমাদের সাহিত্য গল্পে আজ বিশ্বের অপরাপর সাহিত্যের প্রায় সমকক্ষ হয়েছে, কবিতাতে বহু আগেই তা হয়েছে, কিন্তু নাটক এবং প্রবন্ধ আমাদের নেই বললেই চলে। প্রবন্ধের কথা এখন থাক। নাটক (এবং সামাজিক নাটক) কেন আমাদের দেশে লেখা হয় না? বলা হয়, আমাদের জীবনে নাটকের উপকরণ কম, কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরন্ন

কেরাণী, শিক্ষিত বেকার, বয়স্থা কুমারী, উৎপীড়িত বিধবা অধ্যুষিত, জাতিভেদ, হিন্দু-মুসলমান বিরোধ এবং অর্থ নৈতিক বিপর্য্যয়ে বিব্রত মধ্যবিত্তসমাজেই প্রচুর নাটকের উপকরণ আছে। এর নীচের স্তরে ত আছেই। শক্তিশালী নাট্যকার নেই, তাই এরা এখনো এমন ভাবে উপেক্ষিত।

সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে জ্যোতিবাচস্পতির 'নিবেদিতা', রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের 'মানময়ী গার্ল স্কুল', শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'ঝড়ের রাতে' রঙ্গমঞ্চে সমাদৃত হয়েছে। কিন্তু সমাজ-জীবনের গভীর কোন সমস্যাই এই সব বইয়ে রূপ পায় নি—এরা সৌখীন সমাজের মনোরঞ্জনের প্রয়োজনে লেখা এবং সেদিক থেকে বেশ সুখপাঠ্য। মন্মথ রায়, শিবরাম চক্রবর্ত্তী, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ইত্যাদি যে সমস্ত একাঙ্ক নাটক লিখেছিলেন, তার মধ্যে একমাত্র শিবরামের রচনাতেই যুগ-সমস্যার কিছু কিছু আভাষ পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু সেও এত অল্প যে চোখে পড়বার মতো নয়। স্বদেশী-আন্দোলনের দিনে আমাদের দেশে একবার নাট্য রচনার হিড়িক এসেছিল— সেদিন লেখা হয়েছিল ঐতিহাসিক নাটক। আজকে এই রাষ্ট্র ও সমাজ-বিপ্লবের দিনেও রঙ্গমঞ্চকে সাহিত্যিকরা রীতিমতো ভাবেই কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু যে জন্যেই হক, তা হয়নি, তাই বাংলা নাটক আস্তে আস্তে আজ মরতে বসেছে।

চতুর্থ অধ্যায়

গদ্য

[বাংলা গদ্য একান্ত ভাবেই এ যুগের সৃষ্টি। শ্রীরামপুরের খৃষ্টান মিশনারীরা এবং তাঁদের সহযোগী বাঙালী পণ্ডিতরা যখন গদ্য ভাষায় পুস্তক ও সাময়িক পত্রিকা প্রচার করতে সুরু করেন, তখনো দেশে চলছে পদ্য রচনার একাধিপত্য। দেশের লোককে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল করে তুলে, সেই তৈরি জমির ওপর খৃষ্ট ধর্ম্মের বীজ বপনই ছিল পাদ্রীদের লক্ষ্য। কিন্তু দেশের সাহিত্য তা থেকে আশ্চর্য্য ভাবে আত্মপ্রসারের প্রেরণা লাভ করলো এবং বাংলা গদ্য হু হু করে এগিয়ে চললো। এঁদের রচিত বই-পুঁথির আজ অবশ্য সাহিত্যিক মূল্য কিছুই নেই, কিন্তু এঁদের আদর্শেই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত পরবর্ত্তী সময়ে সুষ্ঠুতর গদ্য লিখতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরী বাংলার পাশাপাশি ছিল আর একটি বাংলা—সে হল চলতি বা খাস বাংলা। পাদ্রী আমল থেকেই সেটি নিঃশব্দ পদসঞ্চারে চলে আসছিল, কিন্তু সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সমাজের চোখে তা জলাচরণীয় বলে বিবেচিত হয়নি। বিদ্যাসাগর ঘরোয়া বাংলার phrase, idiom, নাম-ধাতু ইত্যাদিকে সংস্কৃতে অনুবাদ করে, একটি ধ্বনিমুখর ষ্টাইল গড়ে নিয়েছিলেন—যার নাম বিদ্যাসাগরী ষ্টাইল। আর এই ঘরোয়া ষ্টাইলের নাম হল হুতোমী ষ্টাইল, কারণ কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম পেঁচার নক্সা' বইয়েই এই ষ্টাইলের সত্যিকার উৎকর্ষ দেখা যায়। টেকচাঁদের বা ভবানী চরণের উপন্যাস বা রামনারায়ণের নাটক প্রধানতঃ হুতোমী বাংলায় লেখা—এবং অক্ষয় দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার সবাই বিদ্যাসাগরী বাংলার অনুগামী। বঙ্কিমে এসে এই পরস্পর-বিচ্ছিন্ন দুটি ধারায় মিল হল। শুধু তাই নয়, সমাজ সংস্কার, ধর্ম্মপ্রচার এবং শিক্ষা বিতরণের প্রাত্যহিক উদ্দেশ্য ছেড়ে, রসসৃষ্টির বৃহত্তর আদর্শ নিয়ে সাহিত্য রচনা সুরু হল। ঔপন্যাসিক ও প্রবন্ধকার রূপে বঙ্কিম একাই বাংলা গদ্যকে বহুদূর এগিয়ে দিলেন। তাঁর অনুগামী চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, অক্ষয়চন্দ্র সরকার ইত্যাদিও এদিক থেকে তাঁকে প্রচুর সহায়তা

করেন। ঈশ্বর গুপ্ত দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সমালোচনা সাহিত্য সুরু হয়েছিল—রাজেন্দ্র লাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু ইত্যাদির হাতে তা খানিকটা উদ্দীপনা পায়। বঙ্কিম যুগে এসে সমালোচনা-সাহিত্য একটি নিজস্ব মর্য্যাদা লাভ করলো। অক্ষয় সরকারকে আজকের হিসাবেও বড় সমালোচকই বলা যায়। বঙ্কিম যুগ থেকেই বাংলা ভাষায় দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, জীবন-চরিত ইত্যাদি রচনারও রেওয়াজ বেড়ে চললো। তারপর রবীন্দ্রনাথ—যিনি বিষয়কে গৌণ এবং ভঙ্গীকে মুখ্য রূপে গ্রহণ করে, বাংলা গদ্যকে ষোল আনা সাহিত্য পদবাচ্য করে তুললেন। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যকে মোটামুটি তিনটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—সমালোচনা-প্রধান, সাংবাদিকতা-প্রধান এবং শিল্প-প্রধান। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণী-বিভাগ বোঝাবার পক্ষে সুবিধাজনক হলেও, আসলে খাঁটি নয়, কারণ রবীন্দ্রনাথ এমন কিছুই লেখেন নি, সাহিত্যাংশে যার বিশেষত্ব নেই। রবীন্দ্রনাথ একই সঙ্গে ধ্বনিমুখর ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গী এবং ব্যঞ্জনা গভীর কথ্য ভঙ্গীকে গদ্যের বাহন রূপে ব্যবহার করেছেন। তাঁরপর থেকে আজ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য মূলতঃ তাঁর আদর্শেই রচিত হচ্ছে। জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, দীনেশচন্দ্র সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাংলা গদ্যের বিশিষ্ট লেখক যাঁরা, তাঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর রবীন্দ্র-রীতির কাছে ঋণী। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে একমাত্র চৌধুরী (বীরবল) তাঁর নিজস্ব রচনা ভঙ্গীর জন্যে যশস্বী হয়েছেন। তাঁর অনুগামী লেখকবর্গ এবং আজকের সমুদয় কথা-সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার যে যথাসাধ্য রবীন্দ্র-প্রভাব মুক্ত গদ্য রচনার দিকে অবহিত হয়েছেন, এ তাঁরই প্রভাব। কিন্তু এখনো পর্য্যন্ত এ প্রচেষ্টা পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্তর অতিক্রম করে, সত্যিকার প্রাণবন্ত অথচ অভিনব সাহিত্যিক কৌলীন্য অর্জন করতে পারে নি।]

[১]

বৌদ্ধ গান ও দোঁহা থেকে রামপ্রসাদ পর্য্যন্ত, বাংলা সাহিত্যে শুধু কবিতা এবং গানেরই একাধিপত্য চলে এসেছে। নীতিকথা, ধর্ম্মতত্ত্ব, উপাখ্যান, জীবনী, ইতিহাস, সবই লেখা হয়েছে পদ্যে।

ঘরোয়া চিঠি-পত্রে বা দলিল-দস্তাবেজে একটা গদ্যের চল অবশ্যই ছিল, কিন্তু সাহিত্যে তার স্বীকৃতি ছিল না। সহজিয়াদের পুঁথি-পত্রে ছিটে-ফোঁটা যে গদ্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে, তা মেরুদণ্ডহীন এবং বক্তব্য বিষয় পরিস্ফুট করার পক্ষে নিতান্তই অপটু। এই গদ্য তৈরী হল ইংরেজ আমলে। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা হবে বলে, বাংলা ভাষার উন্নয়নে মন দেন। দেশের লোকের দৃষ্টি ও চিন্তার প্রসার না হলে, তারা খৃষ্ট-ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করবে না, অতএব তাদের আগে মানুষ করে তোলা দরকার মনে করেই, তাঁরা প্রথমে সে কাজে হাত দিলেন। বাংলা ভাষার ব্যাকরণ, অভিধান, সংবাদপত্র, সবই দেখা দিল তাঁদের হাত দিয়ে। এ ছাড়া পণ্ডিত নিযুক্ত করে, তাঁরা ইতিহাস, বিজ্ঞান ও উপকথা বিষয়ক বহু বইও বাংলায় লেখাতে সুরু করলেন। বাংলা ছাপাখানারও জন্ম তাঁদেরই হাতে।

মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী প্রমুখ তৎকালে প্রসিদ্ধ বাঙ্গালী পণ্ডিতরা এবং তাঁদের সমসাময়িক কেরী, মার্শাম্যান, হালহেড, লসন প্রমুখ ইংরেজ পাদ্রী বাংলা গদ্যের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপন করলেন। সেই ভিত্তির ওপরই পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য-সৌধ গড়ে উঠলো। এই আমলের রচনার নিদর্শন, 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত', 'প্রতাপাদিত্য চরিত', 'কথোপকথন', 'তোতার ইতিহাস', 'পুরুষ পরীক্ষা', 'পশ্বাবলী', 'প্রবোধচন্দ্রিকা' প্রভৃতি বইয়ে বা 'সমাচার দর্পণ', 'সংবাদ কৌমুদী', 'তিমির নাশক' প্রভৃতি সংবাদপত্রের ফাইলে, পাওয়া যায়। এদের রচনা-ধারা লক্ষ্য করলে একটা জিনিষ চোখে পড়ে। দিশি ইডিয়ম সম্পন্ন সরল কথাভঙ্গী এবং দাঁত কিড়িমিড়ি-করা অনুস্বার-বিসর্গ-বর্জ্জিত সংস্কৃত ভঙ্গী, অর্থাৎ ঘরোয়া বাংলা ও পণ্ডিতী বাংলা

পাশাপাশি চ'লেছে। কেরীর 'কথোপকথনে' বা 'সমাচার দর্পণ' ও 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতিতে প্রকাশিত 'প্রেরিত পত্রগুলি'তে কথাভঙ্গীর এবং বিদ্যালঙ্কার, বসু, চক্রবর্ত্তী, এমন কি রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্তের রচনায় পণ্ডিতী বাংলার নিদর্শন পাওয়া যায়। দীর্ঘ দিন এই দুটি আদর্শ পরস্পর পাল্লা দিয়ে চলেছিল। 'নববাবু বিলাস', 'আলালের ঘরের দুলাল', 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা', 'কুলীন-কুল-সর্ব্বস্ব', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', এমন কি 'সধবার একাদশী' পর্য্যন্ত প্রথম এবং রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, তারাশঙ্কর তর্করত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার পর্য্যন্ত দ্বিতীয় ধারার সমমাত্রিক গতি লক্ষ্য করা যায়। বঙ্কিমে এসে দু'য়ে একটা আপোষ হয়।

রামমোহনকে অনেকে বাংলা গদ্যের জনক বলে থাকেন। বিদ্যাসাগরকে প্রায় সকলেই তা বলে থাকে না। বস্তুতঃ এক দিনে বাংলা গদ্য জন্মায় নি, একজনও এর জনক নন। অবশ্য রামমোহন মিশনারী তথা পণ্ডিতী বাংলা এবং চলতি বাংলার সরীসৃপ শরীরে একটি ঋজুতা ও দার্ঢ্য এনেছিলেন। দুরূহ বৈদান্তিক আলোচনায় এবং সতীদাহ নিবারণের প্রচার কার্য্যে রামমোহন যে বলিষ্ঠ গদ্যের প্রবর্ত্তন করেছিলেন, তা তাঁর নিজেরই সৃষ্টি। তাঁর সমসাময়িক ভাষা থেকে তিনি বিশেষ কিছুই সাহায্য পান নি। তখনকার কোমর-ভাঙা গদ্যে জীবনী-শক্তির অভাব ছিল এতই বেশী যে রামমোহনকে তাঁর প্রবর্ত্তিত গদ্য কেমন করে পড়তে হবে, তার নির্দ্দেশ পর্য্যন্ত দিতে হয়েছিল। কিন্তু রামমোহন শব্দ-শিল্পী ছিলেন না, যা ছিলেন বিদ্যাসাগর। তাই বিদ্যাসাগরই সর্ব্ব প্রথম বাংলা রচনা-রীতিতে একটি শিল্পরূপ দিতে পারলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরই হন, বা রামমোহনই হন, বাংলা গদ্যকে কেউই প্রাণবন্ত করতে পারেন

নি। বিদ্যাসাগর 'বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাবে' যেমন সহজ পৌরুষ, এবং 'কথামালায়' যেমন অনলঙ্কৃত সারল্যের পরিচয় দিয়েছেন, 'শকুন্তলায়,' 'সীতার বনবাসে' তেমনি সতেজ ও ধ্বনিমুখর শব্দ-সুষমার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরী বাংলার প্রধান দোষ তার ষ্টাইলে গতিশীলতার অভাব। বাংলা ভাষার আসল প্রাণ যেখানে, তার ফ্রেজ, ইডিয়ম, নাম ধাতু, বিদ্যাসাগর তার সুযোগ না নিয়ে, তারই অনুরূপ করে সংস্কৃতমূলক শব্দ-পর্য্যায় তৈরি করে নেন। এই যে আনুবাদিক পদ্ধতি, এর দোষেই বিদ্যাসাগরী বাংলা কি ষ্টাইলে, কি ফর্ম্মে, আদৌ স্বতস্ফূর্ত্ত হয়নি। তা অলঙ্কারাঢ্য, কিন্তু নিস্তেজ ও শ্লথগতি। তাতে ভাষার প্রাণ-রূপ পূর্ণতা পায় নি, যদিও দেহটা বলিষ্ঠতা অর্জ্জন করেছে প্রচুর।

রামমোহন-মৃত্যুঞ্জয়ের সমসাময়িক ভবানী চরণ এবং অল্প পরের হুতোমে যে গদ্য-রীতি পাই, তা অনেক বেশী প্রাণবন্ত। তাঁরা যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা ঢের সিধে এবং স্বচ্ছ হয়েছে এই জন্যে যে তাঁদেরকে কোন ধার-করা কাঠামোর ভেতর দিয়ে ভাব প্রকাশ করতে হয়নি। ঘরোয়া শব্দ, দেশি ফ্রেজ-ইডিয়ম, খাস বাংলা ক্রিয়া ও ক্রিয়া-বিশেষণ ইত্যাদির সংযোজনায় তাঁদের বাংলা অনায়াসেই মাথা খাড়া করে দাঁড়াতে পেরেছে। একেবারে আজকের চলতি বাংলার পাশে ফেললেও, এঁদের, বিশেষ করে হুতোমের প্রকাশ-ভঙ্গীটা খুব পুরানো মনে হয় না। শ্ল্যাং জিনিষটা পরিবর্ত্তনশীল, তাই সেদিনের শ্ল্যাংগুলো অবশ্য আজ বদলে গেছে। কিন্তু ভাবের ধারণা-শক্তি বাড়লেও, তার প্রকাশের রীতি আজও প্রায় একই আছে। অর্থাৎ হুতোমী বাংলাটা আমাদের খুব কাছের জিনিষ এবং আমাদের আজকের বাংলায় তার বৈজিক রক্ত স্পষ্টই টের পাওয়া যায়। কিন্তু

পাদ্রী আমল থেকে হুতোমী আমলের গোড়া পর্য্যন্ত, ভাষা-গঠনই চলেছে, সাহিত্য-বস্তু বিশেষ কিছুই জন্মায় নি।

সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করলেন বঙ্কিম। বঙ্কিমী বাংলায় বিদ্যাসাগরী এবং হুতোম-আলালী বাংলার মেল-বন্ধন হয়েছিল বটে, তবে বঙ্কিমেরও নজরটা ছিল প্রধানতঃ পণ্ডিতী বাংলার দিকেই। তাঁর দলবর্ত্তীদের মধ্যে চন্দ্রশেখর মুখুজ্যে, চন্দ্রনাথ বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রমেশচন্দ্র দত্ত, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, সবাই বঙ্কিমী আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং রচনা-রীতিতে বঙ্কিমেরই অনুগামী। এঁরাই বাংলা গদ্যকে আঁতুড়-ঘর থেকে লোকালয়ে নিয়ে এলেন এবং কেবল মাত্র বেঁচে থাকার অক্ষমতা ঘুচিয়ে, তাকে রীতিমতো কেজো করে তুললেন। বাংলা গদ্যের সত্যিকার ইতিহাস সুরু এইখান থেকেই।

বঙ্কিমী গদ্যের কর্ম্ম-শক্তি অনস্বীকার্য্য হলেও, তার বিরুদ্ধে আমার সব চেয়ে বড় অভিযোগ এই যে তা ষোল-আনা সাহিত্য-মুখী নয়। তত্ত্ববিচার, মত প্রচার এবং উচ্ছ্বাসের আতিশয্যে তা অতিশয় ভারাক্রান্ত। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার আবেদনও সাম্প্রতিক। তাই শিল্প হিসাবেও তাকে খুসী মনে আজ বরদাস্ত করা যায় না। বিদ্যাসাগরী বাংলা প্রসঙ্গে যে কৃত্রিমতার কথা বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলাতেও তারই আর একটা রূপ দেখা যায়। বলা বাহুল্য, হুতোমী বাংলাকে জলাচরণীয় বলে গ্রহণ করার বুদ্ধি তখনো জাগ্রত হয় নি। ওটা আদি থেকেই যেন জারজ সন্তানের মতো অভিজাত বাংলার গা ঘেঁষে চলেছে, তার খাস দরবারে আমল পায় নি। অথচ আগেই বলেছি, বাংলা ভাষার সত্যিকার শক্তি ও সম্পদ ছিল ওতেই। অযথা পাণ্ডিত্যের মোহে এই সহজ সম্পদকে উপেক্ষা করে, ওঁরা ভাষার প্রাণ-বিস্তারকে খর্ব্বই করেছিলেন।

[২]

শিক্ষা, সংস্কার ও প্রচার কার্য্যের জন্যই বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য লেখা সুরু হয়, একথা আগেই বলেছি। দীর্ঘদিন বাংলা গদ্য এই নিয়েই ছিল। পাদ্রী আমলের বইয়ে বা সংবাদপত্রে জনসাধারণের মানসিক উৎকর্ষ সাধনের প্রাথমিক চেষ্টা হয়েছিল এবং সে চেষ্টা নানামুখী। কিন্তু সাহিত্য স্থষ্টির জন্যেও যে গদ্য লেখা যেতে পারে, এ কথা সে যুগে কারুর মাথায় আসেনি। রামমোহন রায়ও সতীদাহ নিবারণ, ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম প্রচার, বৈদান্তিক তত্ত্ববিচার, বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ রচনা ইত্যাদির জন্যেই গদ্য লিখেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত 'প্রভাকরে' গদ্যে সাহিত্য সমালোচনা করেছেন, কিন্তু নিজে সাহিত্য করেন নি। হয়ত করতেই পারেন নি।

বাংলা গদ্যই তখনো ভালো করে গড়ে ওঠেনি। কোন রকমে কষ্টে-স্থষ্টে বক্তব্য বিষয় পাঠকের গোচরে আনতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে। যে অবাধ স্বচ্ছতায় সাহিত্য স্থষ্টি সম্ভবপর, ভাষায় তা ছিল না বলেই অবশ্য সাহিত্য হয় নি। বিদ্যাসাগরে এবং অক্ষয় দত্তে এসে বাংলা গদ্য একটা জাত পেলো, কিন্তু জন-শিক্ষা ও প্রচারের সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য ছাড়িয়ে, তখনো তা রস স্থষ্টির পথে পা বাড়াতে পারেনি। বিধবা বিবাহ প্রচার, বহু বিবাহ নিরোধ, ছাত্র পাঠ্য উপখ্যান রচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে বিদ্যাসাগর এবং প্রাণীবিজ্ঞান, সৌরবিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত আলোচনা ইত্যাদির ভেতর দিয়ে অক্ষয় দত্ত, বাংলা গদ্যের প্রকাশ-ভঙ্গী ও ধারণা-শক্তি অনেকটা সাবলীল করে আনলেন। কিন্তু বস্তু বা বিষয়নিরপেক্ষ ভাবে রসাত্মক স্থষ্টি তাঁদের হাত দিয়ে হল না। 'শকুন্তলা', 'সীতার বনবাস', 'ভ্রান্তি-বিলাস' বা 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার', 'ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়', বই হিসাবে হয়ত

ভালোই, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের এলাকার বাইরে এদের সাহিত্যিক মূল্য সমধিক কিনা সন্দেহ।

কিন্তু এই অভিজাত বাংলার পিছু ধরে, উপেক্ষা ও অবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে' অত্যন্ত ক্ষীণভাবে একটা সাহিত্য আদি থেকেই গড়ে উঠেছিল। সমাচার পত্রিকায় 'সূতা-কাটুনির পত্র' বা মাহেশের রথে তৎকালীন বাবুদের 'বিলাসের বিবরণ', বা এই জাতের আর যে সমস্ত টুকরো টাকরা লেখা, তখনকার পণ্ডিতেরা বাঁ হাত দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন, তার ভেতরই বাংলা গদ্যের প্রাথমিক সাহিত্যরূপ কতকটা পাওয়া যায়। এই রূপটা আলালে, হুতোমে, নববাবু বিলাসে, আরো খানিকটা স্পষ্টতা-লাভ করলো। বিদ্যাসাগর চক্রের 'কাদম্বরী,' 'টেলিমেকস,' 'রামের রাজ্যাভিষেক,' 'রোমাবতী' প্রভৃতি সংস্কৃতানুগ কাহিনীর পাশে, এই ব্যঙ্গ রচনাগুলোকে রেখে যদি তুলনা করা যায়, তাহলেই বোঝা যাবে, এরা কত বেশী জীবন্ত ও উজ্জ্বল! লোক-শিক্ষা বা জাতি-গঠনের মহৎ ব্রত নিয়ে লেখা নয় বলেই' হয়ত এরা এত অনায়াস স্বচ্ছ এবং এমন প্রাণবন্ত হতে পেরেছে। কিন্তু এদের রচয়িতারাও সম্ভবতঃ এই জাতের লেখাকে খুব শ্রদ্ধার চোখে দেখেননি, তাই হুতোম রচয়িতা কালী সিংহ নিজেই বিদ্যাসাগরী ভাষায় মহাভারত লিখেছেন।

বঙ্কিমে এসেও বাংলা গদ্যের এই শিক্ষকতার রূপটাই রয়ে গেল মুখ্যভাবে, কিন্তু গৌণভাবে একটা সাহিত্য রূপও সসম্মানে স্বীকৃত হল। বঙ্কিমের 'বিবিধ প্রবন্ধ', 'বিজ্ঞান রহস্য', 'সাম্য' প্রভৃতিতে বা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'আচার প্রবন্ধে', 'পারিবারিক প্রবন্ধে', বা রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির প্রবন্ধে, এই শিক্ষকতা রূপটাই ষোল-আনা জায়গা জুড়ে থেকেছে। সেদিন এদের

প্রয়োজন ছিল ঠিকই, কিন্তু আজ এরা অনুসন্ধিৎসুর কৌতূহল উদ্রেক করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারে না। সে সময় চলে গেছে। কিন্তু এরই পাশাপাশি বঙ্কিমের 'কমলাকান্ত' বা 'লোক রহস্য', চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'উদ্ভ্রান্ত প্রেম', চন্দ্রনাথ বসুর 'ত্রিধারা', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'নিভৃত চিন্তা', 'নিশীথ চিন্তা', অক্ষয় সরকারের 'সনাতনী', রাজনারায়ণ বসুর 'সেকাল ও একাল' ইত্যাদি বইও রচিত হয়েছিল, যার লক্ষ্য ছিল লোক-শিক্ষা নয়, জাতি গঠন নয়, সমাজ সংস্কার নয়, নিছক রস-পরিবেশন।

অবশ্য প্রবন্ধ-সাহিত্য বলতে আজ আমরা যা বুঝি, এইসব রচনায় তার প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হলেও, এরাও সর্ব্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ সাহিত্যের পর্য্যায়ভূক্ত হতে পারে না। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের 'সেই মুখখানি' বা কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ঐহিক অমরতা' প্রভৃতি রচনা অত্যন্ত খেলো জাতের ভাবোচ্ছ্বাসে পূর্ণ—তাঁদের ভাষা শ্লথ, ভঙ্গী অগোছালো, উক্তিও অনাবশ্যক আড়ম্বর বিশিষ্ট, অথচ অন্তঃসারশূন্য। যে শিশুসুলভ আতিশয্যে ওঁরা আসর জমাতে চেয়েছিলেন, তা আজ সাহিত্যের পক্ষে শুধু বর্জ্জনীয়ই নয়, দোষণীয় বলে বিবেচিত হয়। সহজ, সোজা, অথচ সকৌশল প্রকাশ-ভঙ্গী—সেই প্রকাশ-ভঙ্গীর অন্তর্লগ্ন লঘু ভাব-ব্যঞ্জনা ও সরস লিপিচাতুর্য্য, যা আত্মকেন্দ্রিক রচনার (Personal Essay) প্রাণ—তা এইসব প্রবন্ধে অলভ্য। চন্দ্রনাথ বসুর 'একটি পাখী', 'পল্লীবাসের সুখ দুঃখ' বা রাজনারায়ণ বসুর সেকালের গুরু মহাশয় বা সাহেবসুবার চিত্র, এদের চেয়ে অনেক বেশী সুখপাঠ্য। সাহিত্য-হিসাবে এদের বৈশিষ্ট্য আজো অনেকটুকুই স্বীকার করা যায়, যেমন করা যায় কমলাকান্তের বা লোক রহস্যের অনেকগুলো রচনার। অক্ষয় সরকারের 'পিতাপুত্র'ও এই পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত, যদিও এর ভেতর

অসার বিবৃতির অংশও নিতান্ত কম নেই। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পালামৌ' এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার বাল্য কথা ও বোম্বাই প্রবাস' বইয়ের কথাও এখানে ভুললে চলবে না। এ দুটি বই, বিশেতঃ সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ' ত ব্যক্তিক রচনার আদর্শ বলেই গণ্য হতে পারে। বঙ্কিম-যুগের কোন লেখকই, এমন কি স্বয়ং বঙ্কিমও, লেখার ধারে এর কাছাকাছি ঘেঁযতে পারেন কিনা সন্দেহ! (ব্যক্তিগত ভাবে সঞ্জীব ছিলেন বঙ্কিমের মেজদা, যেমন সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন রবীন্দ্রনাথের মেজদা।)

অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, অনভিজাত ও জলানাচরণীয় রূপেই যে সাহিত্য-ধারা গোড়াতে জন্ম নিয়েছিল—সেই নববাবু, নববিবি, হুতোম ইত্যাদিই কমলাকান্তে, মুচিরাম গুড়ে, লোক-রহস্যে বা সেকেলে আখঞ্জী সাহেবের চিত্রে (সেকাল ও একাল) রূপান্তর লাভ করেছে এবং এই আমলের গদ্য সাহিত্যের যা আজো পড়া যায় বা পড়ে উপভোগ করা যায়, তা বাংলা ভাষার ঘরোয়া ইডিয়াম, ফ্রেজ এবং বাংলা দেশের প্রাত্যহিক জীবনকে আশ্রয় করেই তৈরি হয়েছে। যে শ্রেণীর প্রবন্ধ-সাহিত্যের কথা আমরা বলছি, তা লেখা হতে পারে এই অপ্রয়াস সহজ রীতির অনুসরণ করলেই, যা পাণ্ডিত্য ও প্রচারক বুদ্ধিসম্পন্ন বাঙালী লেখকদের কাছে চিরদিনই অবিশ্বাসের বিষয় থেকে গেছে।

অবশ্য ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, পুরাবৃত্ত, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতির যথেষ্ট মূল্য আছে এবং যাঁরা এই সব গুরু বিষয় নিয়ে বই-পত্র লিখেছেন বা লিখছেন, তাঁরা কেউই উপেক্ষার নন। দেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতির, রাজনীতি ও সমাজতত্ত্বের দিক থেকে, তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। কিন্তু বিপদ এই যে, এই সমস্ত জিনিষকে সাহিত্যের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলা হয়। এরা সাহিত্য নয়, আদৌ নয়। রস-সন্ধানী

পাঠকের কাছে এদের দাবী অত্যন্ত কম। এই দাবী মিটলো রবীন্দ্র যুগে, যার পর থেকে যে কোন লেখকের লেখাই একটা বিশেষ স্তরের নীচে নামে না।

[৩]

বিষয় জিনিষটা হচ্ছে সাহিত্যের ক্ষেত্রে দেহের মতো। দেহ বড় সন্দেহ নেই, কিন্তু যে প্রাণ-শক্তির জোরে এই দেহটা জীবন্ত ও ক্রিয়াশীল, তার অভাব হলে, দেহের কিছুই কদর থাকে না। তখন তাকে সরিয়েই ফেলতে হয়। রচনার সম্বন্ধেও বিষয়-বস্তু হচ্ছে জড় উপাদান মাত্র—সেই উপাদানকে জীবন্ত করে ভঙ্গী। ভঙ্গীহীন বস্তুপুঞ্জ তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাদুঘরে সমাদর পেতে পারে, সাহিত্যের প্রবাহমান প্রাণ-ধারা থেকে তার যোগসূত্র হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন। এই ভঙ্গী জিনিষটা যে কি, তা এক কথায় বোঝানো সহজ নয়। তবে এটা ঠিক যে অলঙ্কার, উপমা, শব্দ-চাতুর্য্য বা ধ্বনি-মাধুর্য্যই ভঙ্গীর সব কিছু নয়। বরং এগুলো মোটেই কিছু নয়। এগুলোও বিষয়-বস্তুর মতোই সাহিত্যের বহিরঙ্গের জিনিষ। ভঙ্গীর আসল মূল্য হচ্ছে, প্রাণপ্রেরণায়।

জড় বস্তু মাত্রেরই একটা করে পার্থিব চেহারা আছে, যা স্বাভাবিক সংজ্ঞাসম্পন্ন ব্যক্তি মাত্রেরই কাছে এক। কিন্তু এই বিশ্বজনীন পদার্থকে যখন আমি দেখি এবং আমার সেই দেখাকে অন্যের দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলতে যাই, তখন তার এই অভ্যস্ত রূপটা যায় বদলে এবং তার ওপর এসে পড়ে আমার ব্যক্তি-মনের চিন্তা ও অনুভূতির রং। এগুলো একান্তই আমার এবং আমার বলেই, আমার দৃষ্টি ও আমার সৃষ্টি অন্যের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। এই স্বাতন্ত্র্যই হচ্ছে প্রাণ-পদার্থ, যা নিষ্প্রাণ বিষয়কে সাহিত্যের পদে উন্নীত করে। এই প্রাণ-ধর্ম্ম থেকে বিশ্লিষ্ট

করে, বিষয় সন্নিবিষ্ট করলেও এক শ্রেণীর রচনা হয়, তার প্রয়োজনও আছে, কিন্তু তা সাহিত্য নয়। অর্থাৎ সোজা করে বললে বলতে হয়, রচনা দু'রকমের-এক, বস্তুমুখী (Objective), আর, অন্তরমুখী (Subjective)। এই শেষ পর্য্যায়ের রচনাই হচ্ছে সাহিত্য।

আমাদের দেশে গদ্য রচনার বাহুল্য আছে, কিন্তু গদ্য-সাহিত্যের অভাব। আদি থেকে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্য্যন্ত, বাংলা ভাষায় বস্তুরই একাধিপত্য চলে এসেছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামরাম বসু, রাজীব লোচন চক্রবর্ত্তী, রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত পর্য্যন্ত যে গদ্য লেখা হয়েছে, তার কথা ছেড়েই দিই। তাদের বিষয় অকিঞ্চিৎকর, ভাষা হাস্যোদ্দীপক, ভঙ্গী অচল। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদিতে এসে, বিষয় এবং ভাষার আভিজাত্য লক্ষ্য করা যায়—কিন্তু অন্তরের রেশ তখনো অনেক দূরে। বঙ্কিমের এবং তাঁর পারিষদবর্গের লেখাতেই প্রথম ভাঙা ভাঙা ভাবে প্রাণের সুর শোনা গেল। কিন্তু এঁরাও প্রধানতঃ বস্তুকেই দিয়েছেন মর্য্যাদা, বস্তু-সত্ত্বাকে ছাপিয়ে ব্যক্তি-মনের অনুরঞ্জনে তাঁদের রচনাবলীও তাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই সাহিত্য পদবাচ্য হয়ে উঠতে পারে নি।

এইখানে একটা ভুল বোঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে। পাদ্রী আমল থেকে প্রাক-বঙ্কিম আমল পর্য্যন্ত, বাংলা গদ্যে যে শ্রেণীর অক্ষম বস্তুমুখিতা দেখা যায়, বঙ্কিম আমলের গদ্য অবশ্য তা থেকে অনেক ওপরে। কিন্তু এঁদের বিরুদ্ধেও আমার অভিযোগ এই যে এঁরা লিখতে বসে, প্রধানতঃ প্রত্যক্ষ প্রয়োজনের দিকটার ওপরই চোখ রেখেছেন, সাম্প্রতিক প্রয়োজনের গণ্ডীর বাইরে তাদের রচনার রং তাই অত্যন্ত ফিঁকে।

'বীবরের বাসস্থান' বা 'জীব বিষয়ে পরমেশ্বরের সৃষ্টি কৌশল' ইত্যাদি যে শ্রেণীর প্রবন্ধ 'চারুপাঠে' আমরা পড়েছি, 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'উত্তর চরিত', 'শকুন্তলা তত্ত্ব', 'সাবিত্রী তত্ত্ব', 'শ্মশান', 'ঐহিক অমরতা' ইত্যাদি সেই জাতেরই রচনা। তফাতের মধ্যে, এদের আঙ্গিক সৌষ্ঠব উন্নততর। কিন্তু বিষয়-সমাবেশ ও তত্ত্ব-প্রতিষ্ঠা এদেরও লক্ষ্য এবং সেদিক থেকে এরাও সমান সাহিত্যগরিমাভ্রষ্ট। আর একটা কথা। প্রবন্ধে জ্ঞাতব্য তথ্য জড়ো করা, অথবা রূপকের সাহায্যে কোন তত্ত্বের নির্দ্দেশ দেওয়া, কিংবা কোন অবস্থাবিশেষের অনুকূলে-প্রতিকূলে প্রচার চালানো, মূলতঃ একই কথা। বঙ্কিম-যুগে ও বিদ্যাসাগর-যুগে, এদিকে থেকে কিছুমাত্র গরমিল নেই। তাই এই দুই পর্য্যায়কেই সাহিত্য হিসাবে নীচের কোঠায় নামিয়ে দিতে হয়।

কিন্তু এই দুই পর্য্যায়ের ওপর দেশের নিষ্ঠা এমন অবিচলিত রয়েছে কেন, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। পারে কেন, উঠবেই। বলা বাহুল্য, প্রাকৃতজনের বিচারে রচনার শব্দগত কারিকুরি, বিষয়গত প্রয়োজনীয়তা, বড়জোর ভাবগত গুরুত্বই সর্ব্বাগ্রে বিচার্য্য। তাঁরা স্থূল ভাবে দেখেন, বোঝেনও স্থূল ভাবে—সূক্ষ্মের দিকে তাঁদের নজর চলে না, তাই বস্তুকে অতিক্রম করে, যে আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতির স্পর্শে সাহিত্য জন্মায়, তা তাঁরা ধরতে পারেন না। তাদের মন জিজ্ঞাসু, উপভোগপ্রবণ নয়। এই শ্রেণীর লোকই একদা রটিয়েছিলেন যে রবীন্দ্র-সাহিত্য অবোধ্য—অস্বচ্ছ চিন্তার ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন। আসলে রবীন্দ্রনাথের রচনায় (আমরা এখানে গদ্যের কথাই বলছি) তথ্য, তত্ত্ব, মত, মন্তব্য, সবই আছে—কিন্তু সব কিছুর ওপর একটা জিনিষ আছে, যা তাঁর আগে কারুর লেখাতেই পাওয়া যায় নি। তা হচ্ছে, তাঁর স্বকীয় দৃষ্টির রশ্মি দিয়ে রঙীন করে দেখা এবং দেখানো। শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, সাহিত্য, সর্ব্ব

বিষয়েই কবি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন—সেই সব বিতর্কমূলক (স্বদেশী সমাজ, শিক্ষার বাহন, শকুন্তলা, কাব্যের উপেক্ষিতা, রাজা-প্রজা ইত্যাদি) প্রবন্ধেই হক, আর (মেঘদূত, পায়ে-চলার পথ, শ্রাবণ সন্ধ্যা, কেকাধ্বনি ইত্যাদি) রসাত্মক প্রবন্ধেই হক, বড় কথা বিষয়টা নয়, প্রতিপাদ্য তত্ত্বটা নয়, এদের আসল মূল্য হচ্ছে, কবির দৃষ্টি ও প্রকাশ-ভঙ্গীর নিজস্বতায়। এইজন্যেই এরা সাহিত্য। 'ছিন্নপত্র' এবং 'লিপিকার' কথা ত বলাই বাহুল্য।

রবীন্দ্র-সহযোগিদের মধ্যে দীনেন্দ্র রায়ের পল্লীচিত্রগুলিতে, জগদীশচন্দ্র বসু বা রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বা বলেন্দ্র ঠাকুরের কয়েকটি প্রবন্ধে, স্বামী বিবেকানন্দের দু'একখানি চিঠিতে, অরবিন্দ ঘোষের 'কারাকাহিনী'তে, জলধর সেনের 'হিমালয়ে'ও এই সাহিত্যিক গুণের অল্পস্বল্প পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার দিক থেকে এঁরা সবাই রবীন্দ্রানুগামী, দৃষ্টির দিক থেকে ত বটেই। কাজেই সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে এঁদের আমরা পৃথক করে কোন তারিপ করতে পারি না। এই সময়ের অপরাপর লেখক, যেমন অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, প্রিয়নাথ সেন, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদিও কিছু কিছু সাহিত্যলক্ষণাক্রান্ত প্রবন্ধ রচনা করেছেন—যদিও তাঁদের রচনার ওপর বঙ্কিমী বাংলার প্রভাব একটু বেশী মাত্রায় দেখা যায়।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলায় আর একমাত্র লেখক হচ্ছেন প্রমথ চৌধুরী, যিনি বাংলা গদ্যকে একটা নূতন মোড় ধরিয়ে দিয়েছেন এবং পরবর্ত্তী হয়েও, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই বাংলা কথ্য ষ্টাইলের সঙ্গে বিদ্যাসাগরী, বঙ্কিমী, এমন কি রবীন্দ্রী ষ্টাইলের তুলনা করে দেখাতে চেষ্টা করেছি

যে বাংলা ভাষায় সত্যিকার জ্ঞান নিবদ্ধ রয়েছে প্রথমোক্ত পর্ব্বে। প্রমথ চৌধুরী এটা অনুভব করলেন এবং সেই জন্যেই নূতন করে তিনি বাংলা গদ্য-ধারাকে আবার হুতোমী ধারার সঙ্গে সংযুক্ত করে দিলেন। বাংলা গদ্য এতদিনে তার সত্যিকার শক্তি-কেন্দ্রের সন্ধান পেলো এবং কৃত্রিম ভাষার বেড়াজাল কাটিয়ে, অবাধ মুক্তির পথে পা বাড়ালো। আজকের বাংলা গদ্য চলছে এই পথেই। হুতোম ও বীরবলের সময়ের মাঝখানে যে বৃহৎ গদ্য পর্য্যায়টি রয়ে গেছে, তার মূল্য আজ যতটা ঐতিহাসিক, ততটা সাহিত্যিক নয়, কারণ সাহিত্যের প্রধান অবলম্বন যে ভাষা, তা-ই এতে অসম্পূর্ণ এবং অগঠিত।

কিন্তু প্রমথ চৌধুরী যতটা শক্তিতে ভাষা সংস্কার করেছেন, ততটা শক্তিতে সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারেন নি। যদিও দুটো বড় কাজ তিনি করেছেন, বাংলা গদ্যকে বস্তু ও বিষয়ের ভার থেকে মুক্ত করে, হাল্কা পায়ে চলবার প্রেরণা দিয়েছেন, আর রবীন্দ্র-সাহিত্যের নৈর্ব্যক্তিকতা পরিহার করে, একান্ত ব্যক্তিমুখিতার প্রবর্ত্তন করেছেন। এরপর ব্যক্তিক রচনা (Personal Essay) জন্মানো শুধু স্বাভাবিকই নয়, উচিত। কিন্তু এখনো আমাদের প্রবন্ধ-সাহিত্য সংবাদপত্র এবং পাঠ্য পুস্তকের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারলো না, এটা সত্যিই দুঃখের কথা।

[৪]

রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য নিয়ে ইতিপূর্ব্বে আমি বিস্তৃত আলোচনা করেছি, এখানে তার আর পুনরুক্তি করবো না। বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীন ক্রম-বিকাশ বোঝাতে হলে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য রচনা সম্বন্ধে যে কথাগুলো না বললে নয়, শুধু তাই আমি এখানে বলতে চেষ্টা করবো।

রবীন্দ্র-পূর্ব্ববর্ত্তী গদ্য রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে আমি দেখিয়েছি যে তাতে শিক্ষা ও সংস্কারের উদ্দেশ্যকে রসসৃষ্টির চেয়ে বড় বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাই সেই ভূরি পরিমাণ রচনা সাম্প্রতিক প্রয়োজন মেটানোর পর, স্বভাবধর্ম্মেই নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছে। শৈশবাবস্থায় সাহিত্যের পক্ষে এটা অবশ্য অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথেই প্রথম আমরা বাংলা গদ্যের সেই বাল্যাবস্থায় চড়াই অতিক্রম করে, তার পূর্ণ যৌবনের শস্যসমৃদ্ধ সমতল ভূমির অজস্রতার মধ্যে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এখন থেকে যা আমাদের গদ্য, তার একটা মাপকাঠি নির্ণয় সহজ। কারণ যে কোন চলনসই লেখকের লেখাও এখন থেকে একটা বিশেষ স্তরের নীচেয় নামে না—ভাষার ধারণা-শক্তি ও প্রকাশ-ভঙ্গীর এম্নি একটা উন্নত ষ্ট্যাণ্ডার্ড রবীন্দ্রনাথের হাত দিয়ে বাঁধা হয়ে গেছে।

রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে শক্তিমান গদ্য লেখক অনেকই ছিলেন, তাঁদের রচনার বৈশিষ্ট্যও নিতান্ত কম নয়। তবু গত পঞ্চাশ বৎসরের বাংলা গদ্য সাহিত্য প্রধানতঃ দাঁড়িয়ে আছে রবীন্দ্রনাথকে আশ্রয় করেই, আর তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে অতি বড় শক্তিমান যিনি, তিনিও রবীন্দ্রনাথের এই অসামান্য প্রভাবকে একেবারে এড়িয়ে যেতে পারেন নি। অক্ষয় মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ চন্দ, নিখিলনাথ রায় প্রভৃতির ঐতিহাসিক রচনা, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, বিপিনচন্দ্র পাল, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক রচনা, স্বামী বিবেকানন্দের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ক রচনা, প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতির সাহিত্য-সংক্রান্ত আলোচনা, জলধর সেনের ভ্রমণ কাহিনী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, যতীন্দ্রমোহন সিংহ ইত্যাদির লেখনী-চিত্র, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে সম্মানের সঙ্গে

গৃহীত এবং স্বীকৃত হয়েছে। এই সমস্ত রচনায় কোন-না-কোন আকারে রবীন্দ্রনাথের রচনাভঙ্গীর প্রভাব দেখা যাবেই। বলা বাহুল্য, এঁরা জ্ঞানতঃ অনেকেই ছিলেন বঙ্কিমের অনুগামী এবং কেউ কেউ রবীন্দ্র-বিদ্বেষী। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের অতি-মানুষী প্রতিভার সর্ব্বগ্রাসী আক্রমণ থেকে এঁরা কেউই রক্ষা পাননি, অজ্ঞাতসারেই এঁরা কবির রচনা-রীতির পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। যদিও তা সত্ত্বেও তাঁদের স্বকীয়তা এবং বৈশিষ্ট্যও কোন ক্ষেত্রেই চাপা পড়ে যায় নি।

এ থেকেই এ কথাই দাঁড়ায় যে আধুনিক বাংলা সাহিত্য বলতে আমরা যে বিশেষ পর্য্যায়টিকে বুঝি, তার গদ্য এবং পদ্য উভয় দিকেই, বিশেষতঃ গদ্যে, রবীন্দ্রনাথই একমাত্র লেখক, যাঁর সহস্র রশ্মির কোন একটাকে বা দুটোকে অবলম্বন করেই অপরাপর জ্যোতিষ্কেরা ঔজ্জ্বল্য লাভ করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, রবীন্দ্রনাথের কাব্য সাহিত্য তাঁর গদ্য সাহিত্যকে অনেকটা আড়াল করে ফেলেছে। এমন কি অনেকে তাঁকে খুব বিশিষ্ট শ্রেণীর গদ্য লেখক বলে জানেনও না। কিন্তু একটু বিচার-বুদ্ধি খাটিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে যে গল্প, উপন্যাস, ভ্রমণ, জীবনী, ব্যক্তিক রচনা, চিত্র, বিচার-বিতর্ক সর্ব্ব শ্রেণীর রচনায় সমান সিদ্ধহস্ত রবীন্দ্রনাথ, একাই বাংলা গদ্যকে একশো বছর এগিয়ে দিয়েছেন —পরবর্ত্তীয়দের জন্যে আরো একশো বছর এগিয়ে যাবার মতো ভাষার সঞ্চয় জমা করে রেখেছেন তাঁর রচনাবলীর ভেতর। উপযুক্ত পরিমাণ চর্চ্চা ও প্রচারের অভাবে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য যথোচিত মর্য্যাদা লাভ করেনি, দেশের সাহিত্যের পক্ষে সে বড় কম লজ্জার কথা নয়।

আগেই বলেছি যে রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য নিয়ে ধারাবাহিক আলোচনা আমি করবো না। তা করার প্রয়োজনও উপস্থিত নেই। শুধু রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য এবং সমসাময়িকদের ওপর

তার অনতিক্রমনীয় প্রভাবের দিকে আমি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রামমোহন, বিদ্যাসাগর এবং বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য সম্বন্ধে আলোচনা কালে আমি দেখিয়েছি যে তখনো পর্য্যন্ত গদ্যে একটা সত্যি জাতের সাহিত্য-রূপ আসে নি। বিষয়টাই নিয়েছে প্রাধান্য এবং রচনার শিল্পীক উৎকর্ষকে গৌণ বলে ধরা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথে হল এর উল্টোটা। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে সাহিত্যের পক্ষে কি বলা হচ্ছে সেটা গৌণ, কেমন করে বলা হচ্ছে সেটাই মুখ্য। অর্থাৎ সাহিত্যে ও অসাহিত্যে যে তফাৎ, তা হল দৃষ্টি-ভঙ্গী ও প্রকাশ-রীতির তফাৎ। রবীন্দ্রনাথের ত বটেই, রবীন্দ্র সমসাময়িক যে কোন লেখকের লেখাতেই এই সাহিত্যিক কৌলীন্যটুকু লক্ষ্য করা যায়, যা যায় না বিদ্যাসাগর বা বঙ্কিম-যুগের অধিকাংশ রচনাতেই। খেলো ভাবপ্রবণতা, জোলো রসিকতা এবং ছেঁদো তত্ত্বকথাকে কৃত্রিম কষ্টকল্পিত ভাষায় প্রকাশ করতে গিয়ে, তাঁরা পদে পদে নাস্তানাবুদ হয়ে গেছেন। রচনায় প্রাণ-বন্ততা বা প্রসাদগুণ ত দূরের কথা, সাধারণ স্বচ্ছতা সঞ্চার করাও তাঁদের দ্বারা হয়ে ওঠে নি। রবীন্দ্রনাথই প্রথম সূতিকা-গৃহের এই অসহায়তা ঘুচিয়ে, বাংলা গদ্যকে পূর্ণ বয়সের প্রাচুর্য্যের সন্ধান দিলেন।

অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ রচনার পদ্ধতি নিয়ে দু'একটা অভিযোগ উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথ প্রবন্ধে উক্তির চাতুর্য্য বজায় রাখার খাতিরে, যুক্তির বন্ধন সর্ব্বত্র দৃঢ় রাখতে পারেন না। Analogyর সাহায্যে তিনি সিদ্ধান্তে আসেন, কিন্তু সে সিদ্ধান্ত প্রমাণসহ হয় না, শুধু প্রকাশ-ভঙ্গীর গুণে ধরা পড়ে না। তাছাড়া যে নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর লিরিক কাব্যের প্রাণগত ত্রুটি হয়েও অপরূপ ভাব-ব্যঞ্জনা এবং অনবদ্য শব্দ-যোজনার গুণে ধরা পড়ে নি, গদ্য রচনায় তা মারাত্মক ত্রুটি হয়েই দাঁড়িয়েছে। তার গল্প-উপন্যাসের অপরিসীম ভাবমুখিতা এবং আত্মবীক্ষাসূচক

প্রবন্ধের অনাত্মতা অবশ্যই দোষের। কিন্তু মনে রাখতে হবে, রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের মর্ম্মস্থানে এই মৌলিক ত্রুটি থাকলেও, তার ব্যবহারিক সংস্থানে ঐশ্বর্য্যও আছে প্রচুর, যা আর কারুরই নেই। 'ছিন্নপত্র', 'জীবন-স্মৃতি', 'পঞ্চভূত,' 'বিচিত্র প্রবন্ধ,' 'প্রাচীন সাহিত্য,' 'আধুনিক সাহিত্য,' 'শিক্ষা,' 'সমাজ,' 'কালান্তর,' 'শব্দতত্ত্ব,' 'ছন্দ,' অগণ্য নূতন নূতন পথে তিনি বাংলা গদ্যের ধারাকে প্রবাহিত করেছেন। সব শুদ্ধ জড়িয়ে বাংলা গদ্যকে তিনি যা দিয়েছেন, কি বস্তুর দিক থেকে, কি বিন্যাসের দিক থেকে, বিশ্ব সাহিত্যের ইতিহাসে একক ভাবে আর কোন লেখকের কাছেই বোধ হয় তা পাওয়া যায় নি।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সুদীর্ঘ জীবনে এক এক করে তিনটি পরস্পর বিশ্লিষ্ট গদ্যরীতির প্রবর্ত্তন করেছেন—প্রথম 'ভারতী'র যুগে, দ্বিতীয় 'সাধনা' ও 'বঙ্গদর্শনে'র যুগে, তৃতীয় 'সবুজ পত্রে'র যুগে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য-সাহিত্য সম্বন্ধীয় পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধে আমি এই তিন পর্য্যায়ের বিশেষত্ব নিয়ে আলোচনা করেছি। এই ত্রি-ধারার কোন-না-কোনটাকে কেন্দ্র করেই এ পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য সাহিত্য আবর্ত্তিত হয়েছে। অলঙ্কারবহুল ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গী থেকে সুরু করে, আটপৌরে কথ্য ভঙ্গী পর্য্যন্ত, যত রকমের ষ্টাইল বাংলায় আনা যেতে পারে, রবীন্দ্রনাথই তার চূড়ান্ত পরীক্ষা করেছেন। রবীন্দ্র সমসাময়িকদের অনেকে, এবং রবীন্দ্রোত্তর কালের সকলেই, এই পুঁজি ভাঙিয়ে যশস্বী হয়েছেন।

[৫]

রবীন্দ্র-সমসাময়িক মনীষীদের অনেকেই ইংরেজী লিখে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন, বাংলা ভাষার প্রতি তাঁদের দৃষ্টি পড়েনি। যাঁরা বাংলা ছাড়া আর কিছুই জানেন না, অথচ দেশের বিদ্বৎমণ্ডলীর চিন্তা-ধারার সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ রাখেন, তাঁদের সম্বন্ধে

এই অবিচার জাতীয় জীবনের একটি লজ্জাজনক দিককেই উদ্ঘাটিত করে। বিশ্বের পণ্ডিত সমাজে বাঙালীর বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্যকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে ইংরেজীর মতো একটা সার্ব্বজাতিক ভাষার আশ্রয় নেওয়া দরকার ঠিকই, এবং সে দিক থেকে তাঁরা অন্যায়ও কিছু করেন নি। কিন্তু দেশের জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ওপর অপরিচয়ের পর্দ্দা টেনে দেওয়াও তাঁদের পক্ষে সমীচীন হয় নি।

আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু Response of the Living and the Non-living বই লিখে পৃথিবীর চিন্তা-জগতে ওলট-পালট এনেছিলেন। কিন্তু ইংরেজী-না-জানা বাঙালী তার কোন খবরই পান নি। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্রের History of Indian Chemistry বা Life of an Indian Chemistও মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। সৌভাগ্যবশতঃ স্বামী বিবেকানন্দের সমস্ত এবং অরবিন্দের কিছু রচনার বাংলা অনুবাদ হয়েছে। কিন্তু ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, হীরালাল হালদার, বিপিনচন্দ্র পাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যদুনাথ সরকার, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিনয়কুমার সরকার, মহেন্দ্রনাথ সরকার, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, গিরিন্দ্রশেখর বসু, রমেশচন্দ্র মজুমদার, এ কালের বাঙালী পণ্ডিতদের দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, সর্ব্ববিষয়ক রচনাই আজো ইংরেজী ভাষার কারাগারে আটক রয়েছে। দেশবাসী এঁদের নাম শুনেছেন, কিন্তু নাগাল পান নি! এঁরা নিজেরাও পর-ভাষায় লিখে মাতৃভাষাকে যেমন উপেক্ষা করেছেন, দেশের শিক্ষিত সমাজও এঁদের রচনাবলী অনুবাদ করে, মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি করা তেমনি অনাবশ্যক মনে করেছেন।

এঁদের মধ্যে বিবেকানন্দ বাংলায় 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,' জগদীশচন্দ্র 'অব্যক্ত' এবং অরবিন্দ 'কারা কাহিনী' ও 'গীতার ভূমিকা' লিখে বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত করেছেন যে বাংলা লেখার ক্ষমতা তাঁদের কম ছিল না এবং নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা লিখলে, এঁরা সত্যিকার সম্পদও দিতে পারতেন দেশকে। বিপিনচন্দ্র অবশ্য প্রচুর বাংলা লিখে গেছেন এবং বাংলা ভাষার একজন বিশিষ্ট গদ্য লেখক বলে তাঁর প্রতিষ্ঠাও আছে। 'চরিত্র কথা', 'জেলের খাতা', 'সত্য মিথ্যা' প্রভৃতি অযত্ন লিখিত কয়েকখানি বইয়ে এবং অসংখ্য অসংগৃহীত প্রবন্ধে, তাঁর মনীষা, চিন্তা এবং লিপি-চাতুর্য্যের যে পরিচয় পাই, তাতে একথা অসঙ্কোচেই বলিতে পারি যে পলিটিক্সের রাজ্যে তিনি যতই যা করে থাকুন, সাহিত্য সেবায় একান্তভাবে মনোনিবেশ না করে, দেশকে তিনি বঞ্চিতই করেছেন। পরবর্ত্তীয়দের মধ্যে রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ সরকার, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গিরীন্দ্র শেখর বসু, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ অধ্যাপকেরাও অল্প-স্বল্প বাংলা লেখার চর্চ্চা করেছেন। প্রত্যেকেরই হেলা-খেলা করে লেখা বাংলা বইও কিছু কিছু আছে। কিন্তু এঁদের সকলেরই গভীরতর পাণ্ডিত্য ও গবেষণার ফলাফল যা, তা লিপিবদ্ধ রয়েছে ইংরেজীতেই। বাংলা লেখার ওপর এঁদের আর যাই হোক খুব বেশী আস্থা বা অনুরাগ যে নেই, তার এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কি হতে পারে?

রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের 'দরিদ্রের ক্রন্দন', 'বাঙালী ও বাংলা', সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'দার্শনিকী', 'রবি-দীপিতা', গিরীন্দ্র শেখর বসুর 'স্বপ্ন', সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাংলা ভাষা-তত্ত্বের ভূমিকা', 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', মহেন্দ্রনাথ সরকারের 'উপনিষদের আলো' প্রভৃতি বই এবং সাময়িক পত্রে প্রকাশিত মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রকুমার

বসু, জ্ঞান ঘোষ প্রভৃতির কয়েকটি প্রবন্ধ ছাড়া, আধুনিক পণ্ডিতদের বাংলা রচনার কোন নিদর্শনই চোখে পড়ে নি, এবং এই সমস্ত রচনাও যে এঁদের নাম ও প্রতিভার হিসাবে বিশেষ কিছুই নয়, একথাও শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন। একমাত্র বিনয়কুমার সরকারের কাছেই দেশের কৃতজ্ঞ হবার কিছু কারণ রয়েছে, বাংলা লেখাকে তিনি উপেক্ষার বলে মনে করেন নি। 'রাষ্ট্র, গোষ্ঠী ও পরিবার', 'ভাবী সমাজের ভিত্তি', 'নয়া বাংলার গোড়া পত্তন' প্রভৃতি বইয়ে তিনি অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য বাঙালী পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। তাঁর ভাষার উর্দ্দূ-ঘেঁষা উগ্রতা আমার ভাল লাগে না, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর চিন্তাশীলতা এবং স্বাজাত্য বোধের আমি অনুরাগী।

অবশ্য যে সমস্ত রচনা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, তা সাহিত্যের সীমানার বাইরে। ওদের স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে, পণ্ডিতদের বিতর্ক সভায়, রসিকের মজলিসে নয়। তবু পাণ্ডিত্য বা মনীষাকে ত ভাষা থেকে ছেঁটে বাদও দেওয়া যায় না। ভাষার প্রাণ-শক্তি, তার চিন্তা-সম্পদ ও প্রকাশ-ভঙ্গী, পরিপুষ্টি লাভ করে তার পেছনে বৈদগ্ধ্যের একটি বলিষ্ঠ পটভূমি থাকলেই, যা না থাকায়, বাংলা গদ্য আজো ফরাসী বা ইংরেজীর মতো শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াতে সমর্থ হয় নি। আর এজন্যে দায়ী এদেশের পণ্ডিত মণ্ডলী, যাঁরা পাশ্চাত্যে প্রচার লাভ ও প্রশংসার্জ্জনকেই জীবনের প্রধান লক্ষ্য করেছেন, দেশের ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার দিকে দৃষ্টি দেন নি। বাংলা ভাষায় যে আজো দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সাহিত্য, শিল্পতত্ত্ব, ইতিহাস ইত্যাদি নিয়ে চূড়ান্ত আলোচনা করার উপযোগী পরিভাষা ও ধারণা-শক্তি জন্মায় নি, তার কারণ কি এই নয় যে ভাষার অন্তর্ব্বর্ত্তী যে বনিয়াদ, তাতে বিদ্যাবত্তার বন্ধন খুব দৃঢ় নয়? দেশের বিদ্যাবত্তাকে সযত্নে

বাংলা ভাষার এলাকা থেকে দূরে রাখার ফলেই, বাংলা ভাষা এখনো নিছক রস-সৃষ্টির বাহন হয়েই রয়েছে। তাতে গভীরতর বিচিত্রতর চিন্তা, দৃষ্টি ও অনুভূতি স্পষ্ট রূপ নিতে পারছে না। যেখানে যেটুকু পরীক্ষা হয়েছে, তাতে বাংলা ভাষা যে স্বাতন্ত্র্যলাভের অযোগ্য নয়, তা বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, শশাঙ্কমোহন সেন প্রভৃতির পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা ত এই ভাষাতেই সম্ভব হয়েছে এবং তার বৈশিষ্ট্যও কেউ অস্বীকার করবেন না।

অবশ্য মনীষা এবং শিল্প-নৈপুণ্যের একত্র সমাবেশ ভিন্ন সত্যি জাতের গদ্য সাহিত্য জন্মাতে পারে না। এদেশে তা কদাচিৎ হয় বলেই, বাংলার সাহিত্যে বিদ্যাবত্তার রং এত ফিকে, পাণ্ডিত্যেও শিল্পীক স্বচ্ছতার এত অভাব। এদেশের সাহিত্যিক সমাজ ও বিদ্বৎ সমাজে তাই মস্ত একটা পার্থক্য দেখা গিয়ে থাকে—যেন দুটো পরস্পর বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়। একমাত্র রবীন্দ্রনাথেই দুই পর্য্যায়ের ভেতর একটা মিলন স্থাপনের চেষ্টা হয়, যা তাঁর পরবর্ত্তীদের হাত দিয়ে আবার পৃথক হয়ে গেছে। রবীন্দ্র সমসাময়িকদের প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর উল্লেখ আগেই করেছি। তিনিই হলেন এ যুগের দ্বিতীয় লেখক, যাঁর লেখায় পাণ্ডিত্য দেহ রূপে এবং প্রকাশ-ভঙ্গী প্রাণ রূপে পরস্পরের অনুপূরকতা করেছে। তাই পূর্ণাঙ্গ গদ্য সাহিত্যের স্রষ্টা রূপে তাঁর স্থান এত উঁচুতে।

প্রমথ চৌধুরীর পরে বা সঙ্গে আর যাঁরা গদ্য লিখে খ্যাত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, অজিত কুমার চক্রবর্ত্তী, সুরেশ চক্রবর্ত্তী, দীলিপ কুমার রায়, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম পাঠকদের সুপরিচিত। এঁদের মধ্যে এক অজিতকুমারই সরাসরি

রবীন্দ্রনাথের অনুসরণ করেছেন। তাঁর দৃষ্টি, চিন্তা এবং রচনাপদ্ধতি সবই যে রাবীন্দ্রিক, 'বাতায়ন', 'কাব্য পরিক্রমা' এবং 'রবীন্দ্রনাথের' পাঠক তা হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন। আর সকলেই প্রমথ চৌধুরীর ভেতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুগমন করেছেন। অর্থাৎ প্রমথ চৌধুরীর কথ্য ভঙ্গী, তাঁর ইংরেজী-ঘেঁষা বাগ-বিন্যাসের ধারা, তাঁর ধারালো শব্দ-যোজনার কায়দা, সবই এঁদের লেখায় বিশেষ ভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। (যদিও রসাদর্শ বলতে যা বোঝায়, তা এঁরা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য থেকেই আহরণ করেছেন। স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীও যে তা থেকে একেবারে মুক্ত, এমন নন। রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালের এত বড় প্রতিভা যে তাঁকে ষোল-আনা এড়িয়ে যাওয়া শুধু কঠিনই নয়, বোধ হয় অসম্ভব।)

এই দলের ভেতর অতুল গুপ্তের ষ্টাইল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রসন্ন, তাঁর দৃষ্টিও সব চেয়ে স্বচ্ছ। 'কাব্য জিজ্ঞাসা'র মতো তাত্ত্বিক বইও সেই জন্যে তাঁর হাতে এতখানি সরস হয়েছে। নলিনীবাবুর লেখায় পারিভাষিক দুরূহতার সঙ্গে পাণ্ডিত্যের ঘনঘটা মিশে, তাতে বেশ একটু কৃত্রিমতার সঞ্চার করেছে। 'সাহিত্যিকা' বই সেই জন্যেই যথেষ্ট চিন্তাপূর্ণ হয়েও সুখপাঠ্য হয় নি। সুরেশ চক্রবর্ত্তীর লেখায় ঝাল-নুনের পরিমাণ বেশী, প্যাঁচোয়া উক্তি, শব্দ-ক্রীড়া, আরো কোন কোন দিকে তিনি হুবহু প্রমথ চৌধুরীরই শিষ্য। তাঁর 'হসন্তের পত্র' সত্যিই খুব মনোজ্ঞ রচনা। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ সুপণ্ডিত এবং তাঁর পাণ্ডিত্যের পরিধিও ব্যাপক, কিন্তু ভাষা তাঁর হাতে কেমন যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলে— তার ওপর তাঁর রচনায় ঠিক সেই জাতের ক্রমানুবন্ধও পাওয়া যায় না, যা সুরচনার পক্ষে অপরিহার্য্য। 'চিন্তয়সি,' 'আমরা ও তাঁহারা' ইত্যাদি বইয়ের কথাই আমি বলছি। দীলিপকুমারের ভাষা মিষ্টি—

তাঁর দৃষ্টি এবং মনন-শক্তিও গভীর (কতকগুলি বাত্তিক এবং মুদ্রাদোষ থাকলেও)। তিনি নিঃসন্দেহেই একজন সত্যিকার প্রবন্ধকার। 'তীর্থঙ্কর' বইয়ে জগৎবিখ্যাত কয়েকজন মনীষীর সঙ্গে তাঁর যে সমস্ত আলাপ-আলোচনা স্থান পেয়েছে, বাংলা গদ্যের ইতিহাসে তার স্থান নিতান্ত নীচুতে নয়। ইথেল ম্যানিন বা লিটন ষ্ট্র্যাচীর এই জাতের লেখার সঙ্গে ঐ বইটিকে আমি অনায়াসেই এক পর্য্যায়ভুক্ত করতে পারি। তাঁর 'ভ্রাম্যমান'ও চমৎকার।

অতি-আধুনিক দলের নামী লেখক যাঁরা, তাঁরা সবাই গল্প-উপন্যাস নয়ত কবিতা লিখেছেন—প্রবন্ধ প্রায় কেউই লেখেন নি। যা মুষ্টিমেয় প্রবন্ধ এই সময়ের ভেতর লেখা হয়েছে, তার ইতিহাস খুব সংক্ষিপ্ত। (বলা বাহুল্য আমি নিছক সাহিত্যিক প্রবন্ধের কথাই বলছি)। অন্নদা শঙ্কর রায়ের 'পথে প্রবাসে', 'তারুণ্য', বুদ্ধদেব বসুর 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', প্রবোধকুমার সান্যালের 'অরণ্যপথ', 'মহা প্রস্থানের পথে' ছাড়া সত্যি জাতের প্রবন্ধ আর বিশেষ কিছুই নেই। শচীন সেনের 'প্রবাসের কথা' বইটিও এই দলেই পড়ে। এঁরা সকলেই, বিশেষ করে প্রথম তিন জন, কথা-সাহিত্য রচনা করে অধিকতর খ্যাতিমান হয়েছেন। কিন্তু ব্যক্তিক অনুভূতি ও চিন্তার, ভ্রমণ ও অভিজ্ঞতার সঞ্চয় ভাঙিয়ে, হাল্কা হাতে লেখা প্রবন্ধেই এঁদের লিখন শক্তির পূর্ণতর বিকাশ হয়েছে। শিবরাম চক্রবর্ত্তীর 'আজ ও আগামী কাল,' প্রবোধ চট্টোপাধ্যায়ের 'মেজদার ডায়েরী,' মহেন্দ্র রায়ের মেটারলিঙ্ক সম্বন্ধীয় রচনাগুলি বা 'কিশলয়' ও আধুনিক প্রবন্ধ-সাহিত্যে সম্মানের আসন দাবী করতে পারে।

পঞ্চম অধ্যায়

গদ্য ও সাময়িক পত্র

[খৃষ্টান পাদ্রীদের উদ্যোগেই বাংলা ভাষায় প্রথম গদ্য লেখা শুরু হয়েছিল, একথা আমরা আগেই বলেছি। পাদ্রীরা চেয়েছিলেন, দেশের লোককে শিক্ষায় সংস্কৃতিতে উন্নত করে নিয়ে, তাঁদের খৃষ্ট ধর্ম্মের প্রতি আকর্ষণ করতে। কিন্তু দেশের চিন্তা-ধারা এই থেকে আপনার মুক্তির পথ পেয়েছিল। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাময়িক পত্র 'সমাচার দর্পণের' আদর্শেই রামমোহন রায়, ঈশ্বর গুপ্ত, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্র ঠাকুর প্রমুখ নেতারা, পরে সাময়িক পত্রের ভেতর দিয়ে এক দিকে সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কার, অন্য দিকে জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচার করতে লাগলেন। হিন্দুর সমাজে ও ধর্ম্মে যে সমস্ত যুগার্জ্জিত কুসংস্কার ও কদাচার জমেছিল, তা দূর করায় এবং বাংলা গদ্যকে আমাদের প্রাত্যহিক প্রয়োজনের উপযোগী করে গড়ে তোলায়, 'সংবাদ কৌমুদী', 'প্রভাকর', 'তত্ত্ববোধিনী' ইত্যাদি যে কাজ করেছে, তা অসামান্য। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শনে' একই সঙ্গে এলো সাহিত্য এবং স্বাদেশিকতা। এই সময় থেকেই সাহিত্য পত্রিকা এবং সংবাদপত্র আলাদা হয়ে গেল, গোড়াতে যা ছিল এক। বঙ্কিম-সমসাময়িক ও পরবর্ত্তী সাহিত্য পত্রিকার মধ্যে 'বান্ধব', 'সাধারণী', 'সাহিত্য', 'ভারত' ইত্যাদি উল্লেখ-যোগ্য। আর সংবাদপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'সঞ্জীবনী', 'বসুমতী'। স্বদেশী আন্দোলন এবং পরে গান্ধী-আন্দোলন থেকে এদেশের রাজনৈতিক সংবাদিকতা বিশেষ রকম পরিপুষ্টি লাভ করে, আর তার ফলে সংবাদপত্র যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। বিশ্ব-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে, সাহিত্যিকতাও যেমন এগিয়ে চলে, সাহিত্য পত্রিকারও তেমনি উন্নতি হতে থাকে। 'প্রবাসী' এবং 'সবুজপত্র' সেই উন্নতির একদিকের উদাহরণ। আর একদিকের উদাহরণ 'আনন্দ বাজার', 'বঙ্গবাণী' ইত্যাদি। এখনো পর্য্যন্ত আমরা মোটের ওপর এই আবহাওয়ার ভেতরই রয়েছি।]

[১]

বাংলা গদ্য সাহিত্যের আলোচনা আমরা শেষ করেছি। এই আলোচনা থেকে ইচ্ছা করেই আমি একটা প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে রেখেছি, পৃথক ভাবে আলোচনা করবো বলে। সে হচ্ছে বাংলা গদ্যের উৎপত্তি, বিস্তৃতি ও ক্রম-পরিণতির মূলে বাংলা সাময়িক পত্রের দানের কথা। গোড়াতেই আমি দেখিয়েছি যে বাংলা গদ্যের জন্ম শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের হাতে এবং 'সমাচার দর্পণ' নামক সাময়িক পত্রই হল লিখিত বাংলা গদ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। এই আদি পত্রিকা থেকে একেবারে আজ পর্য্যন্ত, প্রধানতঃ সাময়িক পত্রের অয়নকে কেন্দ্র করেই বাংলা গদ্য নানা রূপান্তরের ভেতর দিয়ে তার আধুনিক উন্নত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। এর পেছুনে পৃথক পৃথক ভাবে নানা প্রতিভাধর লেখকের একক দান আছে ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে অনেক বেশী রয়েছে সমসাময়িক পত্রের ছোট-বড় ভালো-মন্দ অজস্র লেখকের সম্মিলিত দান।

উল্লেখযোগ্য বাংলা সাময়িক পত্রগুলির প্রত্যেকটিই কোন-না-কোন্ বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সম্পাদনায় বের হয়েছে—সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত সম্পাদক-সাহিত্যিক অনেকেই সম্মানের আসন লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের প্রতিভাকে বেষ্টন করে, ছোট-বড়-মাঝারি আর যে সমস্ত লেখক লিখে গেছেন, তাঁদের পৃথক কোন স্বীকৃতির দাবী না থাকলেও, সমগ্রভাবে তাঁদের দানও উপেক্ষার নয়। প্রতিভাধর এক-এক যুগে একটি-দুটির বেশী জন্মান না—তাঁরা আসেন নূতনের বার্ত্তা নিয়ে, যা পুরাণো, যা প্রাত্যহিক, যা অভ্যাসমলিন, তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী নিয়ে। কাজেই প্রচলিত সমাজ হঠাৎ তাঁদের চিনতেও পারে না, সহ্য করতেও পারে না। তখন তাঁদের আশেপাশে

সাধারণ লেখক যাঁরা জড়ো হন, তাঁরাই নূতন যুগের বাণীকে সাধারণ্যে প্রচার করে, যুগের সঙ্গে জন-মনের সংযোগ ঘটিয়ে থাকেন। এক যুগ থেকে আর এক যুগে, ভাবে, কর্ম্মে, দৃষ্টিতে মানুষের যে স্বাভাবিক বিবর্ত্তন, তার বীজ থাকে ভাব-নায়কদের চিন্তায়—কিন্তু বিস্তার নির্ভর করে সাধারণ কর্ম্মীদের ওপর। আর সব ক্ষেত্রের মতো, সাহিত্য ক্ষেত্রেও এই নিয়ম। কিন্তু সময় চলে যাবার পর প্রতিভাই বাঁচে, তার প্রচারকরা যান লুপ্ত হয়ে। পুরাতন সাময়িক পত্রের ফাইল ঘাঁটলেই তাঁদের অনেকের দেখা পাই এবং বারবার সকৃতজ্ঞ বেদনায় মনে হয়, এঁদের আমরা কেন ভুলেছি? কিন্তু নিষ্ঠুর হলেও এটা স্বাভাবিক, সুতরাং এ নিয়ে দুঃখ করাও নিষ্ফল!

আগেই বলেছি, ইংরেজী আমলে দেশের লোককে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানে ওয়াকিবহাল করে, পাশ্চাত্য চিন্তা-ধারায় অনুপ্রাণিত করে, অজ্ঞাতসারে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যেই এ দেশে পাদ্রী পণ্ডিতরা কলেজ বসিয়েছিলেন, সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন এবং বাংলা বই লিখিয়েছিলেন। খৃষ্টানুরক্তি দেশে আশানুরূপ বাড়ে নি—কিন্তু পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে, এ দেশের সংস্কৃতি নাড়া পেয়ে জেগে উঠেছিল। হিন্দু ও মুসলীম দুই সংস্কৃতিই তখন ক্ষয়ের মুখে—দেশে তখন জমা হয়েছে ঘোরতর অজ্ঞতা ও কুসংস্কারের কালো মেঘ। সেই অনশেচতনাহীন নিস্তরঙ্গ আবহাওয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রথম ধাক্কায় ঘুলিয়ে উঠলো। দেশবাসী এক-টানা জীবন যাপনের পথে টক্কর খেয়ে হঠাৎ তাকিয়ে দেখলেন, সময় এগিয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে তাল রেখে তাঁরা এগোন নি। তখন সুরু হল পুরাণোকে ভাঙা এবং নূতন করে তাকে গড়ে নেওয়া—সতীদাহ নিবারণ, বহু বিবাহ নিবারণ, বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন, স্ত্রী-শিক্ষা প্রচার, দু-পাতা মুগ্ধবোধ, দু-কলি হাফেজের

বয়েৎ আর রঘুর দুটি শ্লোক মুখস্থ করা ছেড়ে, দেশ-বিদেশের সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস মন্থন। অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলা যাবে আধুনিকতা, তার সূচনা হল। শ্রীরামপুরের পাদ্রীরা, হিন্দু কলেজের স্থাপয়িতারা, ব্রাহ্ম-সমাজের উদ্যোক্তারা, সকলেই এদিক থেকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

যে সমস্ত নাম এই প্রসঙ্গে সকলের আগে মনে পড়ে, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদি, আজকের বাঙালী সংস্কৃতি তাঁদের সকলের কাছেই ঋণী। তাঁরা ও তাঁদের অগণ্য সহযোগীরা সেদিন দেশকে নব-জীবনের সন্ধান দিয়েছিলেন। শুধু যে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির হাওয়াই তাঁরা দেশে বয়ে এনেছিলেন, বহির্পৃথিবীর বিস্তৃত আকাশে দেশের বিমূঢ় দৃষ্টিকে অবারিত মুক্তির আলোয় উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন, তা নয়। দেশের যা ভালো, যা সত্য, যা মহৎ, তাকেও সময়োচিত আদর্শে সঞ্জীবিত এবং সংস্কৃত করে, প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সতীদাহ নিবারণে রামমোহন এবং বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তনে বিদ্যাসাগর, হিন্দু সমাজ-নীতির মহত্তর আদর্শকেই অনুসরণ করেছিলেন। বৈষ্ণবতার নামে কিশোরী ভজন, তান্ত্রিকতার নামে বামাচার, পশুবলি, মদ্যপান এবং ধর্ম্মাচরণের নামে আরো বিবিধ যথেচ্ছাচার তাড়িয়ে, রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ এবং কেশবচন্দ্র সেন চৈতন্যময় পরব্রহ্মের উপাসনা প্রবর্ত্তন করে হিন্দু ধর্ম্মের মূল তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। সমাজ ও ধর্ম্মে এই যে নানামুখী সংস্কার, এর প্রবর্ত্তনা দিয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা, কিন্তু পুঁজি জুগিয়েছিল প্রাচ্য সংস্কৃতিই। কিন্তু দেশের লোক এটা ধরতে পারেন নি। তাই রামমোহন, বিদ্যাসাগর, কেশব সেন, সকলকেই সমসাময়িকদের হাতে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। বলা বাহুল্য,

এই সব সংস্কার সম্ভবপর হয়েছিল অনেকটাই সাময়িক পত্রিকার সাহায্যে।

পাদ্রী পণ্ডিতদের কাগজের উল্লেখ আগেই করেছি। এর পর উল্লেখযোগ্য রামমোহনের 'সম্বাদ কৌমুদী,' ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী'। 'সমাচার দর্পণ' 'সম্বাদ কৌমুদী' এবং 'প্রভাকর' ছিল একাধারে সংবাদ পত্র ও সাহিত্য পত্র। সমসাময়িক সংবাদের সঙ্গেই এ গুলিতে ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং শিক্ষা সম্বন্ধীয় নানা প্রবন্ধ বের হত। তাছাড়া অনেক সুখপাঠ্য ও কৌতুকপ্রদ পত্র এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম, লৌকিক ক্রিয়া-কর্ম্ম সম্বন্ধে নানা-জনের আলাপ-আলোচনা, বিচার-বিতর্ক ইত্যাদিও থাকতো। সম্বাদ কৌমুদীতে আবার খগোল, জ্যোতিষ, বিজ্ঞান, এমন কি ব্যাকরণ বিষয়ক প্রবন্ধও থাকতো, এবং সেগুলির বেশীর ভাগই লিখতেন স্বয়ং রামমোহন। তত্ত্ববোধিনী ছিল খাঁটি জাতের সাহিত্য পত্রিকা, আর অক্ষয় দত্ত ছিলেন এর সম্পাদক। এতে অক্ষয় দত্তের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, বিদ্যাসাগরের মহাভারতানুবাদ, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বেদান্ত ধর্ম্ম ব্যাখ্যান, অযোধ্যানাথ পাকড়াশীর বক্তৃতা, আরো বহু উল্লেখযোগ্য রচনা বের হয়েছিল।

স্কুল-কলেজে মুষ্টিমেয় সহুরে লোক শিক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু দেশের জন-মনে নব সংস্কৃতির প্রভাব সঞ্চারিত করায় এই কাগজ গুলিই করেছিল সব চেয়ে বেশী সহায়তা। তখন গদ্যের অবস্থাই বা কি ছিল? কোন রকমে কষ্টে-সৃষ্টে বক্তব্য বিষয়কে পাঠকের গোচরে আনতেই তার প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে যেতো। ভাষার সেই আদিম অবস্থাতেই, এদেশের সাময়িকপত্র যে সমস্ত গুরু বিষয় নিয়ে আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একেশ্বরবাদ প্রচার এবং বিশুদ্ধ বৈদান্তিক আদর্শে ধর্ম্ম সংস্কার, স্ত্রী-শিক্ষা, স্ত্রী-স্বাধীনতা ও নারীর উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা, স্মার্ত্ত পণ্ডিতদের বিধি-বিধান খণ্ডন করে, বিধবা-দহন বন্ধ এবং তার পুনর্ব্বিবাহ প্রবর্ত্তন, বাংলা বর্ণমালার উচ্ছেদ করে তার স্থানে রোমান লিপি চলিত করার আন্দোলন, এক কথায়, আজকের দিনের সংবাদপত্রের অবলম্বনীয় যাবতীয় বিষয়ই, সেদিনের লেখকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং তাঁরা সে সমস্ত বিষয় নিয়ে তাঁদের মতো করে বিচার-বিশ্লেষণও করেছিলেন। সেই সঙ্গে দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণাকে যতটা সম্ভব দেশের মাটিতে পত্তনও করেছিলেন, কতক অনুবাদ করেছিলেন, কতক বা অনুসরণ করে লিখেছিলেন। এই সমস্ত রচনার কিছু অংশ পরে বই আকারে গ্রথিত হয়েছে, কিন্তু বেশীর ভাগই গেছে লুপ্ত হয়ে। 'সংবাদ পত্রে সেকালের কথা' বইয়ে এই সব লেখার কিছু কিছু নিদর্শন দেখতে পাওয়া যাবে।

আমি আগেই বলেছি যে এই সব পত্রিকা একাধারে সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্র ছিল। সেইজন্যে সমসাময়িক ব্যক্তিদের কার্য্য-কলাপ সম্বন্ধে এগুলিতে সময় সময় অতি তীব্র সমালোচনা বের হত—সেই সমালোচনা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধরতো কদর্য্য আক্রমণের রূপ। রাম-মোহন রায়ের বিলাতযাত্রা বা তাঁর মুসলমানী বিবাহ নিয়ে যে সমস্ত উতোর কাটাকাটি হয়েছিল, তা পড়লে আজ গা বমিবমি করে। বিধবা বিবাহ নিয়ে যে খিস্তি-খেউড় চলেছিল, তাও সমান জঘন্য! গুড়গুড়ে ভট্টাচার্য্যির 'রসরাজে', আর ঈশ্বর গুপ্তের 'প্রভাকরে' যে সমস্ত বাদ-বিবাদ হয়েছিল, তার সম্বন্ধে রাজ নারায়ণ বসুর মন্তব্য প্রণিধান-যোগ্য। তিনি বলেছেন, দুইটি মেথরে রাজপথে যদি ঝগড়া বাধে এবং সেই ঝগড়ার মুখে তারা পরস্পরের গায়ে যদি স্ব স্ব হাঁড়ির বিষ্ঠা

নিক্ষেপ করে, তাহলে যা হয়, এদের ঝগড়া হত সেই রকম। দুঃখের বিষয় সাময়িক পত্রিকার জগতে এই মেথরামি আজো আছে। কিন্তু এটা বড় কথা নয়। সময় চলে গেছে, তার মালিন্যও সেই সঙ্গে গেছে, যেটুকু বেঁচে আছে তার দাম কম নয়!

দ্বিতীয় পর্ব্বের যে সব সাময়িকপত্র উল্লেখযোগ্য, তার মধ্যে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সার-সংগ্রহ', টেকচাঁদের (প্যারী চাঁদ মিত্রের) 'মাসিক পত্র', ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট', বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন', যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'সোম প্রকাশ', দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ভারতী', অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'সাধারণী', কালী-প্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব' ইত্যাদির নাম অনেকের জানা। এর ভেতর এডুকেশন গেজেট এবং সোম প্রকাশ ছাড়া আর সবগুলিই মাসিকপত্র এবং সব গুলিই পূরোপূরি সাহিত্য পত্র। সাংবাদিকতা আর সাহিত্যিকতা তখন থেকে দুটো আলাদা জাতের জিনিষ বলে ধরা হয়ে আসছে। সে বিভেদ আজো আছে।

[২]

বিগত শতাব্দীর ইতিহাস হল বাংলাদেশের পক্ষে একটা সুদীর্ঘ সমাজ-বিপ্লবের ইতিহাস। যে সমস্ত সংস্কার আধুনিক বাংলাকে প্রাচীন বাংলা থেকে স্বতন্ত্র করেছে এবং এ যুগের ইতিহাসকে তার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে অভিষিক্ত করেছে, তাদের জন্ম বিগত শতাব্দীতে। বেদান্ত সম্মত একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী-শিক্ষা ও স্ত্রী-স্বাধীনতা মঞ্জুর, সতীদাহ নিবারণ, বহু বিবাহ নিবারণ, বিধবাবিবাহ সমর্থন, অব্রাহ্মণের শাস্ত্রাধিকার স্বীকার, ভাষায় (অর্থাৎ বাংলা ভাষায়) শাস্ত্রালোচনার অধিকার দান, এ সমস্তই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্ব্ব থেকে ঊনবিংশ

শতাব্দীর ভেতর হয়েছে। আজ এই ব্যাপার গুলোর সঙ্গে আমরা এমনই অভ্যস্ত যে এদের বিরোধিতা করার কোন কারণ আছে বলেই আমাদের মনে হয় না। কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলায় এই সব অভ্যাসের দৌরাত্ম্য কি প্রবল ছিল এবং তা থেকে মুক্ত করে, দেশকে আধুনিকতার পথে আনতে, বিগত শতাব্দীর সংস্কারকদেরকে কি কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে, তা ভাবলেও অবাক হতে হয়।

এই সব সংস্কার দেশের মর্ম্মস্থানে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজে সেদিন তাঁহাদের সাময়িকপত্র ছাড়া অন্য কোন সহায়কই ছিল না। পাদ্রীদের 'সমাচার দর্পণ,' রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী,' ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর,' আদি ব্রাহ্ম সমাজের 'তত্ত্ববোধিনী' একের পর এক বা একযোগে, সমাজের অন্তস্তল থেকে প্রাচীন কদাচারগুলি উচ্ছিন্ন করে, তাদের স্থানে নূতন আদর্শের পত্তন করেছিল। বহু যুক্তি-তর্ক, বাদ-বিবাদের ভেতর দিয়ে শেষ পর্য্যন্ত এঁদের লক্ষ্য জয়যুক্ত হয়েছিল। দেশের আবহাওয়ায় নূতন যুগের বাণী পৌঁছে দেওয়া ও পুরাতনের ত্রুটিগুলো সম্বন্ধে চেতনা সঞ্চার করার কাজে এই সব সাময়িকপত্র যা করেছে, তার পরিচয় আগেই দিয়েছি। কিন্তু এখানেই সব শেষ নয়। একদিকে যেমন সামাজিক ও নৈতিক জীবনকে এই ভাবে ঢেলে সাজা চলেছে, অন্যদিকে তেমনি দেশ-বিদেশের দর্শন, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদির বহু জ্ঞাতব্য তথ্য উপস্থিত করা হয়েছে দেশবাসীর জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সাম্নে। দেশে ভাঙা-চোরা ভাবে টোলে ও মক্তবে ছিটেফোঁটা সংস্কৃত এবং উর্দ্দূর চর্চ্চা ছিল— অর্থাৎ জ্ঞানের চর্চ্চাই বিশেষ কিছুই ছিল না। এই সব পত্রিকায় বাংলা ভাষার ভেতর দিয়ে পাশ্চাত্য জ্ঞান পরিবেষণ করে, দেশের সাংস্কৃতিক জীবনকেও আধুনিকতার সন্ধান দেওয়া হল।

ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' আর একটা বড় কাজ করেছে—পুরাতন কবিদের কবিতা এবং জীবন-বৃত্তান্ত এতে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হত, আবার নবীন লেখকদের উৎসাহ দেবার জন্যে তাঁদের রচনা সমূহও এতে মুদ্রিত হত। পরবর্ত্তী কালের বড় লেখক যাঁরা, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ অধিকারী, সকলেরই হাতে-খড়ি 'প্রভাকরে'। 'তত্ত্বোধিনী'তে যেমন দেবেন্দ্র নাথ ঠাকুর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বিদ্যাসাগর প্রমুখ পণ্ডিতদের হাত দিয়ে দেশে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার আবহাওয়া তৈরী হচ্ছিল, 'প্রভাকরে'র লেখকদের ভেতর দিয়ে তেমনি তৈরি হচ্ছিল একটা সাহিত্যিক আবহাওয়া। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সার-সংগ্রহে' সাহিত্য এবং সংস্কৃতির রূপ অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করলো। বলে রাখা দরকার যে বিবিধার্থ-ই প্রথম বাংলা ভাষায় সাহিত্য সমালোচনার প্রবর্ত্তন করেছিল। সুপণ্ডিত রাজেন্দ্র লাল সাহিত্য, ইতিহাস এবং পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে একাই বহু প্রবন্ধ লিখতেন এতে। এর অন্যতম লেখক ছিলেন মাইকেল মধুসূদন। তাঁর 'তিলোত্তমা সম্ভব' এতে বেরিয়েছিল।

এর পর বঙ্কিমের 'বঙ্গ দর্শন'। বঙ্গ দর্শনেই বাংলা সাময়িক সাহিত্য তার পূর্ণ বয়সে এসে পৌঁছুলো। বাংলা গদ্যের প্রাথমিক অবস্থায়, সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কার এবং সংস্কৃতি-বিস্তারের ব্রত পালন করতে পূর্ব্ববর্ত্তী পত্রিকাগুলোকে প্রচুর মেহনৎ করতে হয়েছিল। ভাষার অপূর্ণতাই অবশ্য এই মেহনতের প্রধান কারণ। কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত সাধনা ব্যর্থ হয় নি—তাঁদের তৈরী রাস্তা দিয়েই বঙ্গ দর্শনের রাজরথ সবেগে বয়ে চললো। বিশুদ্ধ জাতের সাহিত্য সৃষ্টির এবং উন্নততর সংস্কৃতি বিতরণের কাজে বঙ্কিমের যে কৃতিত্ব, তার মূলে আছে

এঁদের এই প্রাথমিক প্রচেষ্টা। বঙ্গ দর্শনকে কেন্দ্র করে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতি কবি এবং কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ গদ্য লেখক দেখা দিয়াছিলেন, এও তার একটি সৌভাগ্য। বঙ্গ দর্শন থেকেই দেশে প্রথম স্বাদেশিকতার সূচনা। এর আগের পর্ব্ব গেছে সামাজিক সমস্যার সমাধান নিয়ে, এবার এলো রাষ্ট্রীয় সমস্যা এবং এদিক থেকে দেশে প্রথম চেতনা সঞ্চারের দাবী প্রধানতঃ বঙ্কিমের। আর উচ্চ অঙ্গের সাহিত্যিক প্রবর্ত্তনা দেবার সম্মান ত তাঁর আছেই।

বঙ্কিম সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ লেখকদের অনেকেরই নিজের নিজের কাগজ ছিল। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'এডুকেশন গেজেট', কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'বান্ধব', অক্ষয় সরকারের 'সাধারণী', চন্দ্রশেখরের 'উপাসনা', ছিল তখনকার জনপ্রিয় কাগজ। এঁদের ভালো লেখা যা-কিছু, সমস্তই প্রথমে এঁদের নিজের নিজের কাগজে বেরিয়েছিল। এই কাগজগুলি সম্মিলিত ভাবে দেশের চিত্ত ও চিন্তা-ধারাকে সর্ব্বপ্রথম যুগের হাওয়ায় সজাগ করে তুললো। জ্ঞান-বিজ্ঞানে আধুনিক ভারতে বাঙালী যে সর্ব্বপ্রথম জেগেছিল, তা সম্ভব হয়েছিল শুধু এই কাগজগুলির বহুল প্রচারের ফলে। আগাছা তুলে নূতন বীজের পত্তন আগেই সুরু হয়েছিল, এত দিনে দেখা দিল সত্যিকার শস্যসম্পদ। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে বঙ্গদর্শনের যুগ ভাবে ও ভাষায় এতখানি সম্পদের উত্তরাধিকার না রেখে গেলে, পরবর্ত্তী রবীন্দ্র-যুগ এতটা ঐশ্বর্য্যশালী এত সহজেই হত না! পৃথক্ পৃথক্ ভাবে এ যুগের লেখকদের মূল্য যাই হক, একযোগে তাঁরাই যে বাংলা সংস্কৃতিকে তার আধুনিক সম্ভাবনীয়তার পথে এগিয়ে দিয়েছেন, একথা অনস্বীকার্য্য। ঠাকুর বাড়ীর 'ভারতীর' নামও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-যুগের

শেষ ও রবীন্দ্র-যুগের সূচনায় এই মাসিক পত্রটি অববাহিকার মতো থেকে দুটি যুগকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছে।

প্রথম পর্ব্বের সাময়িকগুলি ছিল একাধারে সংবাদপত্র এবং সাহিত্য পত্র। বঙ্কিম যুগে এসে এরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তখন থেকে সংবাদপত্র সাহিত্যের এলাকার বাইরে চলে গেল এবং রাষ্ট্র, সমাজ ও শিক্ষার সাম্প্রতিক আলোচনাই হল তার একমাত্র লক্ষ্য। পক্ষান্তরে সাহিত্যপত্র নিল রসসৃষ্টি এবং সংস্কৃতি বিস্তারের ব্রত। দ্বিতীয় পর্ব্বের সংবাদপত্র গুলোর মধ্যে 'সোমপ্রকাশ', 'সঞ্জীবনী', 'বঙ্গবাসী', 'হিতবাদী', 'বসুমতী' ইত্যাদির নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আসামে চা-কুলির দুর্দ্দশা নিবারণে সঞ্জীবনীর আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। আর বঙ্গবাসীর সম্পাদকই বোধ হয় সর্ব্বপ্রথম রাজ-দ্রোহের অপরাধে কারাদণ্ড ভোগ করেন। (বঙ্গ-বাসীতে) ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পঞ্চানন্দ' এবং (হিতবাদীতে) কাব্য বিশারদের 'বুদ্ধের বচন' তখনকার সমাজে বিশেষ আদৃত ছিল। বহুকাল পরে 'আনন্দ বাজার পত্রিকায়' 'দধি-কর্দ্দম' এবং আরও পরে 'যুগান্তরে' 'ইতস্তত' নাম দিয়ে আবার সেই শ্রেণীর ঝাল-নুন-মিশ্রিত টিপ্পনী লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়েছিল।

[৩]

পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির অনুশীলন দেশে যত প্রসার লাভ করতে লাগলো, ততই দেশবাসীর ভেতর আত্মশুদ্ধির তাগিদ স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগলো। প্রথমতঃ এলো সমাজ ও ধর্ম্ম-সংস্কারের হিড়িক। সেটা ক্রমশঃ থিতিয়ে যাবার পর এলো রাষ্ট্রিক আন্দোলন। পরের পর এই তিনটি ধাপই দেশ অতিক্রম করতে পেরেছিল এত

তাড়াতাড়ি, তার কারণ দেশে সাময়িকপত্রের বিস্তার উত্তরোত্তর বিশেষ ব্যাপক হয়ে চলছিল। হতে পারে, দেশের বর্দ্ধনশীল মন আত্ম-প্রকাশের উদ্দামতায় চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল বলেই সাংবাদিকতা এমন দ্রুত উন্নতির পথে চলছিল, অথবা সাংবাদিকতা এত দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল বলেই দেশ তার সঙ্গে তাল রেখে চলছিল!

এই সঙ্গে অবশ্য মুদ্রাযন্ত্রের ক্রমোন্নতির প্রসঙ্গটা ভাববার আছে, আর আছে খবরাখবর লেন-দেনের ব্যবস্থায় উত্তরোত্তর উন্নতির প্রসঙ্গ। খবর বিক্রয়ের এজেন্সী, টেলিগ্রাফ, বেতারবার্ত্তা, অনেক কিছুই আজ সাংবাদিকতাকে এতটা প্রসারিত হবার সুবিধা দিয়েছে। কিন্তু যেদিন এসব ছিল না, অথচ সংবাদপত্র চালাতে হত, সেদিন সাংবাদিকদের অসুবিধাটা কত বেশী ছিল, তা সহজেই অনুমেয়। সেদিন তাই সাপ্তাহিক ছাড়া আর যে কোন রকম কাগজই ছিল অভাব্য। আশ্চর্য্যের বিষয়, তা সত্ত্বেও বাংলাদেশের অগ্রগামী মন বাধা পায় নি! শুধু অবাধে এগিয়ে আসাতেই নয়, নানা অবস্থান্তর, নানা উত্থান-পতনের ভেতর দিয়ে দেশকে আজকের পরিণত অবস্থায় এনে দাঁড় করানোতেও, তার অধ্যবসায়ের অভাব হয় নি।

এর পর স্বদেশী আন্দোলন। স্বাধীন ইংরেজের অধীন হয়ে এবং দিনের পর দিন তার সাহিত্য ও সংস্কৃতির ভেতর নিজেকে নির্ব্বাসিত করে, দুর্ব্বল বাঙালী অধিক কাল নিশ্চেষ্ট থাকে নি। পূর্ব্বাচার্য্যেরা সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম্মের ভেতর প্রাণ-বেগ সঞ্চার করে, দেশের গ্রহণী-শক্তিকে যথেষ্ট সজাগ করে গিয়েছিলেন। তার পর যেদিন স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও আত্ম-মর্য্যাদা বোধের বাণী নিয়ে দেখা দিলেন বঙ্কিম, সেই দিন থেকেই ইঙ্গ-ভারতে জাতীয় চৈতন্যের সুরু। সেই শুভ সূচনাই অল্প কাল পরে স্বদেশী আন্দোলনে রূপান্তরিত হল। সেই

আন্দোলনের ঢেউ 'বন্দে মাতরম,' 'সন্ধ্যা,' 'যুগান্তর,' নানা পত্রিকার ভেতর দিয়ে দেশের মর্ম্মস্থানে এসে পৌঁছেছে—বাংলার সীমানা ছাড়িয়ে তা মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব, গুজরাট, মাদ্রাজে ছড়িয়ে পড়েছে। সে আন্দোলন বাইরে থেকে ব্যর্থ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দেশের স্বাদেশিকতা-বোধকে তা যে উদ্দীপনা দিয়ে গেছে, তার দোলা আজো থামে নি।

বাংলার রাজনৈতিক সাংবাদিকতা যা, তার জন্ম এইখানে। কিন্তু তখনো পর্য্যন্ত রাজনীতি চর্চ্চাটা সীমাবদ্ধ ছিল শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই, তাই ইংরেজীই ছিল তার প্রধান বাহন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' থেকে সুরু করে 'বেঙ্গলী,' 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ,' 'অমৃত বাজার পত্রিকা,' সেকালের প্রসিদ্ধ খবরের কাগজ সবই ছিল ইংরেজী—এবং কৃষ্ণদাস পাল, শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ সেন, স্যর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী, অরবিন্দ ঘোষ, শিশিরকুমার ঘোষ ও মতিলাল ঘোষ, বাংলার সাংবাদিক ইতিহাসে যাঁদের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে, দেশের রাষ্ট্রিক চেতনায় যাঁদের প্রভাব মৃত-সঞ্জীবনীর কাজ করেছে, তাঁরা কেউ বাংলা লেখেন নি। তবে সৌভাগ্য এই যে দ্বারিকা বিদ্যাভূষণ, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, পাঁচকড়ি বন্দোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, কৃষ্ণকুমার মিত্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা সেদিনই টের পেয়েছিলেন যে বাংলা সাংবাদিকতাকে তফাতে রেখে, বাংলা স্বাদেশিকতা সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। দেশের জন-মনে স্বাধীনতার প্রথম সাড়া এনেছিলেন এঁরাই এবং এ দিক থেকে দেশ এঁদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

এর পর বাংলা সাংবাদিকতার ইতিহাসে দ্বিতীয় বার জোয়ার এলো অসহযোগ আন্দোলনের সময়। কিন্তু সে ইতিহাস মাত্র

সেদিনের, কাজেই তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। প্রথম মহাসমরের পর যেদিন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্যে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল, কারাগার, লাঞ্ছনা, অপমান, মৃত্যু, কোন কিছুতেই পেছপা হয় নি, সেদিন সংবাদপত্রই তাকে দিয়েছিল সেই সাহসের সঞ্চয়। যে সব সংবাদপত্র এই সময় মাথা তুলেছিল, তার মধ্যে দৈনিক 'আনন্দ বাজার', 'বঙ্গবাণী' এবং সাপ্তাহিক 'আত্মশক্তি'র নামই বোধ করি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সাংবাদিকের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, নির্য্যাতন এর আগেও হয়েছে, কিন্তু এখন থেকে সেটা হয়ে দাঁড়ালো নিত্যকার ব্যাপার এবং রাজ-রোষের উদ্যত দণ্ড মাথার ওপর নিয়েই তাঁদের চলতে হল!

[৪]

সাহিত্য পত্রিকার কথা এ পর্য্যন্ত বলি নি। বলা বাহুল্য, সংবাদ পত্রের এই দ্রুত উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে, সাহিত্য পত্রিকাও একেবারে আজ পর্য্যন্ত লম্বা পায়েই এগিয়ে এসেছে। বঙ্কিম-যুগের শেষ এবং রবীন্দ্র-যুগের সূচনায় 'ভারতীর' আবির্ভাব হয়েছিল, একথা আগেই বলেছি। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও কিছু দিন 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনা করেছিলেন, তারপর প্রকাশ করেছিলেন 'সাধনা'। নবপর্য্যায় বঙ্গদর্শন এবং সাধনা থেকেই দেশ ভালো করে এ-যুগের শ্রেষ্ঠ গদ্য লেখকদের সাক্ষাৎ পেলো। এঁদের মধ্যে ছিলেন প্রিয়নাথ সেন, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ইত্যাদি, আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ত বটেই। এই শক্তিশালী লেখকদের গোষ্ঠিপতি রূপে কবি বাংলা গদ্যের প্রাণ-শক্তি যত বড় করে দিলেন, তার পর তা আর বিশেষ বেড়েছে কিনা

সন্দেহ! রবীন্দ্র-পরিমণ্ডলের বিরুদ্ধে সেদিন দেশের অধিকাংশ সাংবাদিক ও সাহিত্যিকই কোমর বেঁধেছিলেন। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, কাব্যবিশারদ, সুরেশ সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, সকলের রসনাই সেদিন নির্ভীক সমালোচনার নামে অপভাষণে মুখর হয়ে উঠেছিল। সে সব বা তার পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিবাদের সাময়িক জঞ্জাল এনে, আমরা এই সংক্ষিপ্ত আলোচনার আসর ভারী করবো না। রসের মাপকাঠি ছেড়ে, নীতির মাপকাঠিতে সাহিত্য-বিচারের সেই কদর্য্যতা দেশে আজো আছে—হয়ত পরেও থাকবে।

তা সত্ত্বেও একথা এইখানে বলে রাখা দরকার যে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য', পত্রিকা হিসাবে বঙ্গদর্শনের পরই শ্রদ্ধার আসন দাবী করতে পারে। এর লেখকবর্গ যাঁরা—পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, স্বয়ং সমাজপতি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, দীনেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতি—বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁরা স্থায়ী গৌরবের অধিকার লাভ করেছেন। রবীন্দ্র-গোষ্ঠী এবং সমাজপতি গোষ্ঠী পরস্পর সমান্তরাল ভাবে সাহিত্য সৃষ্টি করে, দর্শনে, বিজ্ঞানে, ইতিহাসে, রসতত্ত্বে, প্রবন্ধে, নিবন্ধে, গল্পে, উপন্যাসে, বাংলা গদ্যকে সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণতা দিলেন। দুই দলে মতদ্বৈধ যাই থাকুক, উভয় দলের সম্মিলিত সাধনায় বাংলা গদ্য যে অসামান্য সাবলীলতা এবং শক্তি অর্জ্জন করলো, তা বলাই বাহুল্য এবং অপক্ষপাত সহজদৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে, এ কথা আজকের সমালোচককে স্বীকার করতেই হবে যে বিরুদ্ধপন্থী বলে যাঁরা সেদিন দেশে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছিলেন, রচনা-ভঙ্গী এবং চিন্তা-পদ্ধতির দিক থেকে তাঁরা আসলে কবিকেই অনুসরণ করেছিলেন। অর্থাৎ তাঁরা সকলেই রবি-শিষ্য, কেউ প্রকাশ্য কেউ প্রচ্ছন্ন। এঁদের আসর জুড়িয়ে আসার পর রবীন্দ্র-যুগ সারা দেশে

সুপ্রতিষ্ঠিত হল। শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রবাসী' হল সেই যুগাদর্শের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুখপত্র। এরই পাশে পাশে ক্ষীণস্রোতা 'যমুনার' ভেতর দিয়ে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব—সাময়িক পত্রের ইতিহাসে সে এক দৈবঘটনার মতো!

রবীন্দ্র-যুগের মধ্যপর্ব্বে সাময়িক সাহিত্যে আবার একটা বিপ্লবের হাওয়া এলো প্রমথ চৌধুরীর 'সবুজ পত্র' থেকে। এই বিপ্লবের প্রভাবটা প্রধানতঃ বাইরের দিকে কাজ করেছে—সে হল সাহিত্যে কথ্য ভাষার ব্যবহার, যা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও গ্রহণ করলেন। কিন্তু অন্তরের দিকেও এর প্রভাব কিছু কাজ করেছে—তা বাংলা সাহিত্যের আসরে বিশুদ্ধ প্রজ্ঞার অবতারণা করা। তথাকথিত Intellectual movement, যা আজকের কতক লেখকের হাত দিয়ে দলগত হয়ে পড়েছে, তার জন্ম এইখানে। কিন্তু প্রমথ চৌধুরী এটা বোধ হয় চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, ভাবালুতার উচ্ছেদ করে, যুক্তিসিদ্ধ অথচ পপ্যুলার সাহিত্য সৃষ্টি করতেই। নইলে প্রচলিত সাধু ভাষার আড়ষ্টতাকে তিনি কখনই আঘাত করতেন না। কিন্তু দেশের বিদ্বৎ সমাজ তাঁকে সঠিক বোঝেন নি—তাই 'সবুজপত্র' গোষ্ঠীর প্রায় সকলেই ভালো লেখক হয়েও বড় লেখক হন নি, অবশ্য প্রমথ চৌধুরী নিজে ছাড়া। 'সবুজ পত্রের' পর 'কল্লোল', 'কালি কলম' প্রভৃতির উল্লেখ না করলে এই আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ লেখক যাঁরা, একটি ভাবী যুগের সম্ভাবনাকে এগিয়ে এনেছেন, তাঁদের আবির্ভাব এই সব পত্রিকায়। এর পর আর একমাত্র পত্রিকা 'পরিচয়', যার নাম উল্লেখ করেই আমরা এই আলোচনা শেষ করবো।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাস

[নাটকের মতো উপন্যাসও বাংলা ভাষায় জন্মেছিল ইংরেজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণা থেকে। এ দেশের ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্যে এক শ্রেণীর কাব্যধর্ম্মী আখ্যায়িকা লেখার রীতি ছিল, 'কাদম্বরী' বা 'বাসবদত্তা' তার প্রমাণ। কিন্তু আজকের দিনে নভেল বলতে আমরা যা বুঝি, তা সম্পূর্ণরূপেই এসেছে ইউরোপ থেকে। বাংলা ভাষায় সত্যিকার প্রথম নভেলিষ্ট হলেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর আগে বিদ্যাসাগর, তারাশঙ্কর প্রমুখ লেখক বাংলায় ক্ল্যাসিক্যাল রোমান্সের পুনর্লিখন করেছিলেন—আর টেকচাঁদ, ভবাণীচরণ ইত্যাদি করেছিলেন সমসাময়িক সমাজ নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর স্যাটায়ার রচনা। (এঁরা সম্ভবতঃ মুসলীম কেচ্ছা-সাহিত্য থেকে আদর্শ আহরণ করেছিলেন।) বঙ্কিম যখন সাহিত্যিক রূপে আবির্ভূত হন, তখন দেশের সমাজ ইংরাজী শিক্ষার সাম্প্রতিক মোহে উদ্ভ্রান্ত। যুবকরা হয় খৃষ্টান, নয় ব্রাহ্ম হচ্ছিলেন, দেশের ধর্ম্ম-কর্ম্ম, আচার-সংস্কৃতির ওপর শ্রদ্ধা হারিয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমচন্দ্র সেই উন্মার্গগামী সমাজকে দেশীয় সংস্কৃতির মহান ঐতিহ্যে উদ্দীপ্ত করাকেই তাঁর জীবনের ব্রত করলেন। এই জন্যেই তাঁকে লিখতে হল প্রধানতঃ ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সামাজিক উপন্যাসেও তিনি নৈতিক আদর্শকে প্রাধান্য না দিয়ে পারলেন না। বঙ্কিমের এই সংস্কারক বুদ্ধির আধিক্য তাঁর শিল্পের গরিমা অনেকটাই ক্ষুণ্ণ করেছে হয়ত, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের সাহিত্যে তাঁর প্রভাব অসামান্য। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে গোড়ার দিকে বঙ্কিমী আদর্শই বিশেষ ভাবে দেখা যায়, যদিও সে প্রভাব কবি শীঘ্রই কাটিয়ে উঠেছিলেন এবং মনস্তত্ত্ব উদ্‌ঘাটনে ও আখ্যায়িকার স্বাভাবিক পরিণতি নির্দ্দেশে অল্পদিনেই তিনি বঙ্কিমকে ছাড়িয়েও গিয়েছিলেন। বঙ্কিমের 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি' পাশাপাশি রেখে পড়লেই এ কথার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন হবে। বঙ্কিম-সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের অনেকের লেখাই সেদিন বিশেষ সমাদৃত ছিল, যদিও আজ তার মূল্য ঐতিহাসিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এঁদের মধ্যে দামোদর মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র

চট্টোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' এবং দামোদরের 'মা ও মেয়ে' কৌতূহলী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। এঁদের সামান্য পরের তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট লেখক। তাঁর 'স্বর্ণলতা'তেই বাংলা গার্হস্থ্য উপন্যাসের রূপ সর্ব্বপ্রথম পূর্ণতা লাভ করলো। যোগেন্দ্র বসু, ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তাঁর সমসাময়িক লেখকরাও একদা খ্যাতিমান ছিলেন, কিন্তু তাঁদের কোন লেখাই পরবর্ত্তী কালে বেঁচে থাকে নি। রবীন্দ্রনাথ বাংলা উপন্যাসে যে ভাবমুখিতা এবং মনস্তাত্ত্বিকতা প্রবর্ত্তন করলেন, তা তাঁর সমসাময়িকদের তেমন বেশী প্রভাবিত করে নি। বরং তাঁর তাত্ত্বিকতাকে পরিহার করারই চেষ্টা হয়েছে বিশেষ করে। তাঁর উপন্যাসে বাস্তবের রং ফিঁকে এবং মানুষ তাতে মতবাদের বাহন একথা ঠিক, কিন্তু শিল্প হিসাবে তাদের উৎকর্ষ যে কম নয়, তা সকলেই স্বীকার করবেন। এরপর এলেন শরৎচন্দ্র। তিনিই বাংলা উপন্যাসকে ষোল-আনা সম্পূর্ণতা দিলেন। মানুষের দুঃখ-ব্যথা, স্খলন-পতনকে সুগভীর সহানুভূতির রঙে চিত্রিত করে, তিনি বঙ্কিমের নীতিনিষ্ঠা এবং রবীন্দ্রনাথের মননশীলতাকে পরাভূত করলেন। তাঁর আদর্শ ই আজো দেশে বিশেষভাবে অনুসৃত হচ্ছে। বঙ্কিম সাহিত্যে রাজা, জমিদার বা সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারুর স্থান হয়নি। রবীন্দ্র সাহিত্যেও সম্পন্ন গৃহস্থেরাই নায়ক-নায়িকা; তাদের বুদ্ধি মার্জ্জিত, রুচি উন্নত, কার্য্য-কলাপ কাব্যিক। শরৎচন্দ্রই প্রথম তথাকথিত ছোটলোককেও সম্মানিতরূপে আঁকলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দ্দশাকে সমবেদনা দিয়ে ফোটালেন। আজকে আরো খানিকটা আমরা এগিয়েছি এবং আজ তাদের হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণাই করেছি হয়ত, কিন্তু তার পেছনেও শরৎচন্দ্রের অদৃশ্য হাত রয়েছে। শরৎচন্দ্রের পর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল প্রভৃতির নাম উপন্যাসকার হিসাবে উল্লেখযোগ্য।]

১]

আজকের দিনে বাংলা ভাষার সবচেয়ে বেশী যা লেখা হয়, তা হল উপন্যাস। মাসিক-সাপ্তাহিক সর্ব্বত্রই ক্রমশঃ-প্রকাশ্য উপন্যাস থাকে—আর বই আকারে যে কত উপন্যাস বের হয়, তার ইয়ত্তাই নেই।

এক মাত্র উপন্যাসেরই প্রকাশক, ক্রেতা এবং পাঠক সুলভ বলে, যাঁরা স্বভাবতঃই উপন্যাস লিখিয়ে নন, তাঁরাও এই লাইনে পা বাড়িয়েছেন এবং এমন সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ আছে যে উপন্যাসের এই অতি-প্রচলন অবিলম্বে রহিত না হলে, সাহিত্যের অপরাপর শাখাগুলি হয়ত মারাই যাবে। এখনি নাটক, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, ব্যক্তিক প্রবন্ধ, লিরিক কবিতা, কৌতুক রচনা ইত্যাদির ক্ষয়দশা সুরু হয়েছে। আধুনিক লেখকদের একজনকেও এই সব দিকে লেখনী চালনা করতে দেখা যায় না। সবাই ঝুঁকে পড়েছেন উপন্যাস, গল্প, আর গদ্য কবিতার দিকে এবং সাহিত্যিক বলতে আজ বোঝায় শুধু তাঁদেরই, যাঁরা এই সব জিনিষ লিখে থাকেন।

বলা বাহুল্য, উপন্যাস সাহিত্যের একটি প্রধান অঙ্গই এবং এর বিস্তৃতি ও পরিপুষ্টি আনন্দেরই কথা। নাটক মঞ্চস্থ না হলে, সম্যক হৃদয়ঙ্গম করা সকলের পক্ষে সহজ নয়। কাব্যের আবেদন গূঢ়, তাও সকলের জন্যে নয়। প্রবন্ধের পাণ্ডিত্য প্রাকৃত জনের আয়ত্তের বাইরে। কাজেই এগুলো সর্ব্বসাধারণের দ্বারা সমাদৃত হওয়া কঠিন। কিন্তু উপন্যাসের ভিত্তি প্রাত্যহিক জীবনের ওপর, তার নর-নারীরা চলে-ফেরে আমাদেরই মতো করে এবং আমাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার সঙ্গে তাদের যোগ সুগভীর—সেইজন্যে উপন্যাস বোঝা এবং উপভোগ করা সকলের পক্ষেই সহজ। তাছাড়া, উপন্যাসের ভেতর যদিও গল্পাংশই প্রধান, তবু তারই সঙ্গে নাটক, কাব্য এবং প্রবন্ধেরও মিশ্রণ আছে। চরিত্রের সঙ্গে চরিত্রের সঙ্ঘাত বেধে, উপন্যাসের দ্বন্দ্ব যখন তরঙ্গিত হয়ে ওঠে, তখন তা ধরে নাটকের রূপ। বহিঃপ্রকৃতি ও বাস্তব ঘটনার সঙ্গে অন্তর্বৃত্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে যে সমস্ত সূক্ষ্ম অনুভূতি জন্মগ্রহণ করে, তা হয় কাব্য। আর উপন্যাসের ঘটনা ও

বিষয়-বস্তু, তার প্রতিপাদ্যে পৌঁছুতে যে সমস্ত অনুকূল ও প্রতিকূল মতের অবতারণা করে, তা প্রবন্ধ গোত্রীয়।

অর্থাৎ সাহিত্য-শিল্প হিসাবে উপন্যাস একটা মিশ্র জাতের জিনিষ। কিন্তু এর এই প্রকারগত বিভিন্নতাগুলি একটি প্রকৃতিগত সমন্বয়ের সূত্রে গ্রথিত হওয়া চাই। অতি-নাটকীয়, অতি-কাব্যিক বা অতি-প্রাবন্ধিক হলে, উপন্যাস স্বকীয়তা ভ্রষ্ট হয় এবং তখন তার উপন্যাস হিসাবে মূল্যও যায় খুব কমে। প্রত্যেক পর্য্যায়ের সমমাত্রিক সমাবেশ এবং তাদের পারস্পরিক সামঞ্জস্য থেকেই জন্মায় উপন্যাসের রস। কিন্তু এটা যে কি করলে হয় এবং কেমন করে এটা করা যায়, তা বুঝিয়ে বলা কঠিন। তবে এটা না হলে কিন্তু বেশ ধরা যায়। আধুনিক উপন্যাসে দুটো দিকের খুব প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে—হয়, তাতে মানব-মানবীকে পরস্পর-বিরোধী কতকগুলি মতবাদের প্রতীকরূপে আঁকা হচ্ছে এবং যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে এক পক্ষকে পরাস্ত ও অপর পক্ষকে প্রতিষ্ঠিত করে, একটা সত্যে উপনীত হওয়া হচ্ছে—না হয়, কতকগুলি মানব-মানবীকে লেখকের পছন্দসই ছকে ফেলে, নিজের রুচি মতো এঁকে যাওয়া হচ্ছে।

এই দুই আদর্শই উপন্যাসের পক্ষে অসার্থক। প্রথমতঃ, মানুষের জীবনে মত বা সংস্কারের প্রভাব যথেষ্ট হলেও, চব্বিশ ঘণ্টাই সে মতের পিছু ধাওয়া করে না, সর্ব্বদাই সে যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণে সুসজ্জিত হয়েও বসে নেই। তার খেয়াল আছে, স্বপ্ন আছে, ভাবাবেগ আছে। ঘটনার আবর্ত্তে এই বৃত্তিগুলো কখন কোন দিকে মোড় ফিরে; তাকে দিয়ে কি করিয়ে নেবে, তারও কোন নিশ্চয়তা নেই, আর তা নেই বলেই মানুষের জীবন কোন বাঁধা ফরমিউলায় পড়ে না। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মানুষের এই অজ্ঞেয় অন্তর্বৃত্তির স্ফুরণ এবং তা থেকে

তার চরিত্রের গতি-পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই প্রমাণসহ এবং বিজ্ঞানসিদ্ধ নয়। মানুষের মুখে তাই মতের লাগাম এঁটে দিয়ে, তাকে পেছন থেকে নিজের খুশীমতো চাবুক লাগালে, (উপন্যাসের পথে) সে চলতে পারে না—সেটা তার মনোধর্ম্মেরই প্রতিকূল। দ্বিতীয়তঃ, আমি যেমনটি আশা করি, আর একজন ঠিক তেমনটি করে না বলেই আমার জীবন অসম্পূর্ণ—আবার সে যেমনটি আশা করে, আমি তেমনটি করি না বলেই তার জীবনও ব্যর্থ—অথচ হয়ত আমরা পরস্পরই পরস্পরের ভেতর সমন্বয় স্থাপন করতে চেয়েছি। এই ত জীবনের সত্যিকার ট্রাজেডী! মৃত্যু, অত্যাচার, দারিদ্র্য, এর চেয়ে ঢের অগভীর। সুতরাং উপন্যাসের চরিত্রকে যেতে দিতে হবে তার নিজের বেগে—আমার পছন্দের ব্রেক কষে তাকে আটকালে তা সত্যিকার উপন্যাস হবে না।

মানব-চরিত্রের এই স্বাভাবিক প্রবণতাকে ক্ষুণ্ণ করে, তাকে যন্ত্রে পরিণত করায়, আধুনিক উপন্যাসের নর-নারীরা রক্ত-মাংসের মানুষ হয় না, হয় নিরুপাধিক ভাবাদর্শের প্রতীক। কাজেই তারা যে ঘটনা-সঙ্ঘাতের মধ্যে দিয়ে এগোয়, তা গল্প হয় না, হয় তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা। এখনকার উপন্যাসের বিরুদ্ধে গল্পাংশের ন্যূনতা এবং বক্তব্যের প্রাচুর্য্য একটা বড় গোছের নালিশ এবং এ নালিশ অর্থহীন নয়। এই ত্রুটির মূল নিয়ে বিচার করলেই দেখা যাবে যে এটা অনেকাংশে অনিবার্য্য রূপেই ঘটেছে। মত থেকে বিচ্ছিন্ন করে মানুষকে দেখতে আমরা ভুলেই গেছি, তাই প্রত্যক্ষ ঘটনাকে নির্ব্বিশেষ রূপে দেখা আজ সম্ভব হয় না। বাস্তব অবস্থায় মানুষ কি করে, কি বলে এবং তার সেই বলা ও করা কোন্ পরিণতিতে গিয়ে দাঁড়ায়, সেটা আমরা যেন আঁচ করতেই পারি না। তাই এখনকার উপন্যাসে আখ্যানাংশের অভাব হয়েছে। তার স্থানে এসেছে তত্ত্ব, তথ্য, মত, মন্তব্য ও রূপকের প্রাচুর্য্য,

যার আড়ালে সত্যকার মানুষ ও বাস্তব সংসারের রূপ গেছে একেবারে ঢাকা পড়ে। মস্তিষ্ক-বৃত্তির এই অভ্যুদয়ে অনেকে উপন্যাসের রাজ্যে cultural conquest হয়েছে ভাবেন, কিন্তু নিছক উপন্যাসের এতে হয়ত সমাপ্তিই হয়েছে।

গল্পাংশের ওপর এতটা জোর দিতে দেখে অনেকে হয়ত মনে করবেন, আমি বলছি, নিছক গল্প না হলে উপন্যাসই হয় না। তা আমি বলছি না, বরং তার উল্টোটাই বলছি। মানব-জীবনের স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে বিশ্লিষ্ট করে, গল্পকে জমাট করলে তা গল্পই হবে, সাহিত্য হবে না। এখানে যেমন বুদ্ধি-বৃত্তির খাতিরে মানুষকে গলা টিপে মারা হয়, ওখানে তেম্নি গল্পের খাতিরে তাই করা হবে। বস্তুতঃ গল্পটা আসা চাই মানব-প্রকৃতির সহজ ক্রিয়াশীলতা থেকেই। আসলে গল্প কি? প্রত্যেকটি স্ত্রী-পুরুষেরই চিত্ত, চিন্তা এবং চরিত্রের কতকগুলো নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য আছে—এগুলো কারুর সঙ্গে কারুর খাপ খায় না, অথচ বাস্তব সংসারে, একের অন্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট না হয়ে থেকে উপায় নেই। তাই সংস্কার, আদর্শ, উদ্দেশ্য, তাদের বাইরে থেকে সমন্বয়ের দিকে চালাতে চেষ্টা করে, কিন্তু ভেতরকার এই সব সহজাত স্বাতন্ত্র্য-বোধ পদে পদেই মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এই থেকে ঘটে বৈষম্য। তারপর প্রকৃতি অনুসারে এই সমস্ত বৈষম্য টেনে আনে বিদ্রোহ, বিপ্লব, বেদনা, বিরহ—যা জীবনকে তার প্রারম্ভিক ভিত্তিভূমি থেকে উৎখাত করে, অপ্রত্যাশিত পরিণতিতে নিয়ে গিয়ে ফেলে। উপন্যাসের গল্প হল এই পরিণতি চিত্রণের এবং এই পরিণতিতে পৌঁছুবার পথ-নির্দ্দেশের সহায়ক।

অর্থাৎ উপন্যাসের গল্পাংশ হল স্রোতের মতো। বাইরে থেকে বয়ে চলেছে শুধু স্রোত—কিন্তু ভেতরে-ভেতরে তারই সঙ্গে বয়ে

চলেছে উর্ব্বরা-শক্তি, মৃত্তিকার প্রাণ-রস, জীব ও উদ্ভিদের শরীর-রক্ষক উপাদান। তাতে আবর্ত্ত আছে, উচ্ছ্বাস আছে, তরঙ্গ আছে। কিন্তু সবশুদ্ধ জড়িয়ে তা হচ্ছে স্রোত মাত্র। উপন্যাসের ঘটনা বয়ে চলেছে, সেটাই প্রত্যক্ষ—তার ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে নর-নারীর ভাব ও কর্ম্ম, দুঃখ ও বেদনা, তাদের মনস্তত্ত্ব, নীতি, মত-মতি সব কিছুই। অব্যাহত গল্প-স্রোতে অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়ে বয়ে যাচ্ছে বলেই, বাইরে থেকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া সহজ নয়, যেমন নয় স্রোতকে থামিয়ে, তার উপাদানিক বিশ্লেষণ করা। যখনই স্রোতকে খাল কেটে এনে আটকাই, এবং নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির অভিমুখে চালাতে যাই, অম্নি তার জীবন-বেগ যায় থেমে এবং তাতে জমা হয়ে ওঠে অনিষ্টকর আবর্জ্জনা স্তূপ। উপন্যাসের গল্প-রূপ প্রাণ-বেগকে ব্যাহত করে, তাকে প্রয়োজনের পথে চালাবার চেষ্টা করলেও, তেম্নি প্রাণবন্ত, স্বচ্ছন্দ, এবং সুখপাঠ্য সাহিত্য হয় না—হয় ভালো কথা, দামী চিন্তা ও সবল যুক্তির গুদাম-ঘর, যা আধুনিককালের উপন্যাসে হরদম হয়ে থাকে। এটাকে সাহিত্যের একটা নূতন টেকনিক বলা যেতে পারে, কিন্তু উপন্যাসের টেকনিক এ নয়, যেমন আধুনিক গদ্য-কবিতাও কবিতা নয়।

[২]

বঙ্কিমচন্দ্রই যদিও বাংলার প্রথম সত্যিকার ঔপন্যাসিক এবং বাংলা উপন্যাসের আধুনিকতম পরিণতির ঠিক আগে পর্য্যন্ত, যদিও তাঁর একক প্রভাবই বিশেষ ভাবে কাজ করে এসেছে, তবু তাঁর পূর্ব্বেও বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস লেখা হয়েছে এবং ঐতিহাসিক দিক থেকে তাদের মূল্যও নিতান্ত কম নয়। তবে একটা কথা আমাদের মনে

রাখতে হবে—প্রাক-বঙ্কিম উপন্যাস যা পাওয়া গেছে, সেগুলো খাঁটি জাতের উপন্যাস নয় এবং তারা বঙ্কিমচন্দ্রকে বা তাঁর সমসাময়িক আর কোন উপন্যাসকারকে আদৌ স্পর্শ করে নি। এই উপন্যাসগুলো লেখা হয়েছিল দেশীয় সাহিত্যের সনাতন ঐতিহ্য অনুসরণ করে—আর বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস আমদানি করেছিলেন ইংরেজী সাহিত্য থেকে।

টেকচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলালকে'ই এত কাল প্রাক-বঙ্কিম উপন্যাসের এক মাত্র নিদর্শন বলে ধরা হত। এই ধারণার একটা কারণ এই যে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই টেকচাঁদকে বাংলা ভাষার প্রথম ঔপন্যাসিক ও বাংলা কথ্য ভাষার প্রথম প্রবর্ত্তক বলে প্রশংসা করে গেছেন। বস্তুতঃ এ দুটোই বঙ্কিমের ভুল। টেকচাঁদের বহু পূর্ব্বেই কেরী পাদ্রীর 'কথোপকথনে' এবং 'সমাচার পত্রিকার' 'প্রেরিত পত্রে' টেকচাঁদের চেয়ে অনেক বেশী তৈরি কথ্য ভাষা পাওয়া গেছে। আর পাদ্রী-সমসাময়িক ভবানী চরণের 'নব বাবু বিলাস' এবং 'নব বিবি বিলাস' বইয়ে টেকচাঁদী আদর্শের উপন্যাসই পাওয়া গেছে ঢের বেশী পূর্ণতর আকারে। সুতরাং কথ্য ভাষা প্রবর্ত্তন বা উপন্যাস লেখা, কোন দিক থেকেই টেকচাঁদের প্রথমতার গৌরব স্বীকার করা যায় না। এই তিনখানি বইকে একত্র করে প্রাক-বঙ্কিম উপন্যাস সাহিত্যের পর্য্যায়টি সম্পূর্ণ, এ কথা অবশ্য নিশ্চিত। বঙ্কিমচন্দ্র অপরাপর বইয়ের খবর জানতেন না, তাই টেকচাঁদকেই যোল-আনা প্রশংসা অসঙ্গত ভাবে দিয়ে গিয়েছেন।

আগেই বলেছি, এই বইগুলোকে ঠিক উপন্যাস বলা চলে না, এরা স্যাটায়ার জাতের রচনা। তৎকালীন সমাজের তরুণ ও প্রবীণদের দোষ-ত্রুটি, অন্যায়-অপরাধ, আতিশয্য ইত্যাদি নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা এবং তাঁদেরকে সুপথের সন্ধান বাৎলে দেওয়ার জন্যেই এদের সৃষ্টি।

সময়টা আমাদের মনে রাখতে হবে। হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলমান সংস্কৃতির সঙ্ঘর্ষ হতে হতে, দেশে শেষ পর্য্যন্ত একটা মিশ্র জীবনাদর্শ গড়ে উঠেছিল—আচকান, পাগড়ী ও ফর্সির সঙ্গে ফারসী পড়া যেমন হিন্দুদের মধ্যে আভিজাত্যের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনই কৌলীন্য ও আচার-নিষ্ঠার আঁটুনিও বেড়ে গেছলো অত্যন্ত বেশী। এই বাইরে মুসলমানী ও ভেতরে হিঁদুয়ানীর ভাব-সঙ্ঘাত থেকে সমাজ-জীবন তার প্রাণ-শক্তি হারিয়ে, নিতান্তই উন্মার্গগামী হয়ে পড়েছিল। দুর্ব্বল স্বাস্থ্যের ওপর মহামারীর আক্রমণের মতো, এই ভাঙনের মুখে হঠাৎ এসে পড়লো ইংরেজী শাসন এবং ইংরেজী সভ্যতা।

দেশের যুব-শক্তি সেই বন্যার মুখে অন্ধের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো, বৃদ্ধেরা কোমর বেঁধে অতি-হিন্দুত্বের দিকে দিলেন মন। এক দিকে সুরু হল, জাতি-ধর্ম্ম ত্যাগ, বিদেশী পোষাক, বিদেশী খাদ্য ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ—আর এক দিকে সুরু হল, বিধবা দহন, উপপত্নী রক্ষণ, ফোঁটা-তিলক রুদ্রাক্ষ-রক্তচন্দনের আড়ালে কিশোরী ভজন, বামাচার সিদ্ধি, আর এদেরই অনুপূরক রূপে গুরু-পুরোহিত-মহান্তদের বেল্লোমিকে প্রশ্রয় দেওয়া। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণ-শক্তি তখনো দেশের মাটিতে দানা বাঁধে নি, তখনো চলছে শুধু ভাঙন ও ওলট-পালট। এই বিক্ষোভ জুড়িয়ে থিতিয়ে প্রথম নব সংস্কৃতির সুগঠিত রূপ প্রকাশ পেলো বঙ্কিম, মাইকেল, কেশব সেন প্রভৃতির সাধনায়। আর এই ভাঙনের মধ্যে দিয়ে জাতিকে গঠনের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন রামমোহন, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর—যাঁদের কথা দেশকে চিরকাল মনে রাখতে হবে।

এই ভাঙা-চোরা সমাজে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অবসর ছিল ঢের, প্রাচীনপন্থীদের নিয়েও, আধুনিকপন্থীদের নিয়েও। ভবানীচরণ ও

টেকচাঁদ উভয়েই লক্ষ্য করেছিলেন 'এডুকেটেড ইয়ং বেঙ্গলকে'। তাদের উচ্ছৃঙ্খলতা, উদ্দামতা, আতিশয্য, সব কিছুর ভেতরই ঠাট্টা, এমন কি, আক্রমণের জিনিষও ছিল প্রচুর। নানা বইয়েই এই পুঁজি ভাঙানো হয়েছে। এমন কি, সেদিন পর্য্যন্তও এর জের চলেছে। আর 'ওল্ড ফুলদের' কথা ত বলারই নয়। এই আমলের নক্সায়, নাটকে, উপন্যাসে, সর্ব্বত্রই সেই ক্ষয়িষ্ণু সমাজের চিত্র পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই সব বইয়ের অধিকাংশই খেলো জাতের রচনা। এদের মধ্যে কালী সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' ও দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশীতে'ই শুধু স্থায়ী সাহিত্যের চেহারা পাওয়া যায়, আর সবই হচ্ছে পরিবর্ত্তনশীল সমাজ ও সংস্কৃতির, ভাষা ও সাহিত্যের সমসাময়িক আলেখ্য মাত্র। তবে এই বইগুলোর মূল্য একদিক থেকে অনস্বীকার্য্য, তা হচ্ছে, ক্লাসিক্যাল আভিজাত্যের বেড়া ভেঙে, ভাষাকে ও বিষয়-বস্তুকে ঘরোয়া সারল্যের দিকে আনবার চেষ্টা। সেদিন এ জিনিষ কারুর শ্রদ্ধার উদ্রেক করেনি, তাই এদের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরী রচনাই দেশকে করেছে বিশেষভাবে আকর্ষণ।

এই শ্রেণীর স্যাটায়ার সাহিত্যিক চুটকি হিসাবে ছোকরা মহলে হয়ত আদর পেতো। কিন্তু দেশের ভদ্র-সমাজে আদর পেতো পৌরাণিক ধরণের আখ্যায়িকা—'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'ভ্রান্তিবিলাস', 'কাদম্বরী', 'রাসেলাস', 'টেলিমেকস', 'রামের রাজ্যাভিষেক' ইত্যাদি। এদের বিষয়, রচনা-রীতি, প্রতিপাদ্য, সর্ব্বত্রই ছিল সংস্কৃত-কৌলীন্য এবং সেটাই বিবেচিত হত ভদ্র-সাহিত্যের আদর্শ বলে। এমন কি, সেকালে বন্ধুর বিবাহে নববধূকেও নাকি এই সব প্রীতি-উপহার দেওয়া হত। কিন্তু এ বইগুলো মৌলিক সাহিত্য নয়—নিতান্তই অনুবাদ ও adaptation। সুতরাং এদের বিষয়গত বৈশিষ্ট্য যা, তা সবই মূল

লেখকদের, বাংলা লেখকদের যা-কিছু কারিকুরি, তা ভাষা ও অঙ্গসজ্জায় সীমাবদ্ধ। এই ভাষা সম্বন্ধে আগে আলোচনা করেছি। সুতরাং এখানে আর পুনরুক্তি করবো না।

বঙ্কিমচন্দ্র এই ক্ল্যাসিক্যাল আদর্শ ও পূর্বোক্ত স্যাটায়ারিক আদর্শের মধ্যে একটি মেল-বন্ধন ঘটিয়ে, বাংলা উপন্যাসকে আঁতুড় ঘর থেকে প্রাত্যহিক সংসারের মধ্যে নিয়ে এলেন। এই দুই শাখার অপূর্ণতা ও অসাফল্যই বঙ্কিমকে এই নবতন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিল নিঃসন্দেহ। কিন্তু তাঁকে সব চেয়ে বেশী প্রভাবান্বিত করেছিল স্যার ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাস। হিন্দু কলেজের প্রথম গ্র্যাজুয়েট বঙ্কিম স্কট পড়েছিলেন ভালো করেই এবং স্কটকে অনুসরণ করেই তিনি প্রথম ঐতিহাসিক রোমান্স নিয়ে লেখা সুরু করলেন। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'সীতারাম', 'মৃণালিনী', 'রাজসিংহ', 'কপালকুণ্ডলা', 'চন্দ্রশেখর', সব বইয়ের পেছুনেই একটা করে ঐতিহাসিক কাঠামো আছে, এবং এদের ধরণ-ধারণ, বিষয়-বিন্যাস, সব কিছুতেই Ivanhoe, Kenilworth, Quintin Durward, ইত্যাদির ছায়া সুস্পষ্ট। অবশ্য পরে বঙ্কিম সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন এবং 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'রাধারাণী'তে, মধ্যযুগীয় রাজা-বাদশা-নাইট ইত্যাদির বদলে, জমিদার বা সম্পন্ন ভদ্রলোকের গণ্ডীতে নেমে এসেছিলেন। তখন স্কটের বদলে কোঁৎ, মিল, বেন্থামের প্রভাব তাঁকে অভিভূত করেছে। তিনি দার্শনিক ভিত্তিতে সমস্যামূলক উপন্যাস লিখতে সুরু করলেন। আর এখানেই হল আধুনিক বাংলা উপন্যাসের সূচনা।

[৩]

স্কটের আদর্শে বঙ্কিম ঐতিহাসিক রোমান্স লিখতে সুরু করেছিলেন, কিন্তু স্কটের সঙ্গে বঙ্কিমের একাধিক দিক থেকে পার্থক্য

ছিল। স্কটের রোমান্সে ইতিহাসের কাঠামো খুব মজবুত এবং সে ইতিহাস যেমন ঘটনাবহুল, তেমনি রোমাঞ্চকর। তাছাড়া, গল্প লেখার সহজ শক্তিও স্কটের ছিল অফুরন্ত। তাই তিনি ইতিহাসের ব্যতিক্রম না ঘটিয়েও, যথেষ্ট সরস ও সঙ্ঘাতময় উপন্যাস গড়তে পেরেছিলেন। পক্ষান্তরে বঙ্কিম স্বদেশের ইতিবৃত্ত থেকে যে সমস্ত টুকরো-টাকরা উপাদান পেয়েছিলেন, তা এতই অল্প এবং এমনি অসম্পূর্ণ, যে তার সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ গাল-গল্পের ভেজাল না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল না।

এই মিশেলের ফলে তাঁর আখ্যায়িকার ঐতিহাসিক বনিয়াদ হয়েছে আলগা—অথচ ইতিহাসের ঠাট বজায় রাখতে যাওয়ায়, তাঁর গল্পও প্রত্যাশিত পরিণতি লাভ করেনি। অর্থাৎ ডুমার মতো নিছক রোমান্স, বা স্কটের মতো ঐতিহাসিক রোমান্স—কোনটাই তিনি সমগ্র করে সৃষ্টি করতে পারেন নি। এই শ্রেণীর বইয়ের মধ্যে, একমাত্র 'কপালকুণ্ডলা'-তেই তিনি একটা নিছক কল্পনামূলক কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন, কিন্তু তার ভেতরেও শেষ পর্য্যন্ত ঐ নকল ইতিহাস এসে ঢুকেছে। যেমন হয়েছে 'চন্দ্রশেখরে', 'মৃণালিনীতে', বা 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে। শুধু 'রাজসিংহের' ভিত্তিভূমিটাই ষোল-আনা ঐতিহাসিক, কিন্তু এই বইয়ে যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয় থাকলেও, 'কেনিলওয়ার্থ' বা 'মেরীকুইন অব স্কটস' এর তুলনায় এর জৌলুষও অনেক বেশী ঝুটো। হতে পারে, বঙ্কিমী রচনা-রীতির প্রধান যে দোষ, তার একান্ত বহির্মুখিতা, তারই ফলে অন্যান্য বইয়ের মতো, এই বইয়েরও গাঁথুনি শিথিল হয়ে পড়েছে। কিন্তু আসল কারণটা বোধ হয় গভীরতর, কিন্তু সেটা আরো পরে বলবো।

বঙ্কিম যে সময়ের মানুষ, জাতির জীবনে সে একটা বিপর্য্যয়ের আমল। ইংরেজী শিক্ষা ও সভ্যতার আকস্মিক আলোয় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে

দেশের যুব-শক্তি সেদিন বিদ্রোহী ও যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠেছিল। দেশের সমাজ, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সর্ব্ব বিষয়েই তাদের জেগে উঠেছিল তীব্র অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার ভাব। এই বহিঃপ্রভাবের তাড়নাতেই তারা নিজের দেশ এবং জাতিকে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর ভাবতে সুরু করেছিল। এমন দিনে, জাতির মনে আত্ম-সম্মান-জ্ঞান জাগানো, তার বিশ্বাস ও কর্ম্ম-শক্তি উদ্দীপ্ত করা, তাকে কল্পিত বা মিথ্যা হলেও, গরিমাময় জাতীয় ঐতিহ্যের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করা বিশেষ ভাবে দরকার হয়ে পড়েছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই বঙ্কিমের লেখনী-ধারণ এবং এ দিক থেকে তাঁর লেখনীর সাফল্যও অসাধারণ। বাস্তবিকই, বাংলা দেশে জাতীয়তা বোধের উদ্বোধনে বঙ্কিমের সমান কর্ম্মী খুব কমই হয়েছেন!

এই প্রয়োজনের বশেই বঙ্কিম দেশের ইতিহাস অনুসন্ধান করেছিলেন এবং যথেষ্ট পরিমাণ ইতিহাস না পাওয়ায়, নিজের মতো করে ইতিহাস গড়ে নিয়ে, জনপ্রিয় আদর্শে উপন্যাস লিখেছিলেন। এই গঠনমূলক পরিকল্পনা পেছুনে ছিল বলেই, রস-সৃষ্টির ওপর বঙ্কিম ষোল-আনা মনোযোগ দিতে পারেন নি। তাই তাঁর উপন্যাসগুলি সাম্প্রতিক প্রয়োজন যথেষ্ট পরিমাণে মেটালেও, শিল্প হিসাবে আজ আর কোন বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে পারে না। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক জীবনকে বঙ্কিম প্রথমটা আমল দেন নি এই জন্যে, যে আদর্শ সৃষ্টির বা রসসৃষ্টির পক্ষে দূরত্ব যতটা সহায়ক, নৈকট্য ততটা নয়। কিন্তু বঙ্কিমের অবাধ কল্পনার মুখে ছিল একটা উদ্দেশ্যের শক্ত লাগাম পরানো। তাই তিনি দূরে গিয়েও রসের গভীরে উধাও হতে পারেন নি। এইখানেই তাঁর শিল্পীত্বের প্রধান অসাফল্য।

সামাজিক উপন্যাসে এসেও বঙ্কিম একই অসুবিধার সম্মুখীন

হয়েছেন। বর্ণাশ্রমকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি মনস্তত্ত্বের স্বাভাবিক গতিকে প্রতিহত করেছেন পদে পদে। গল্পকে যে সম্ভাবনীয়তা দিয়ে রঙ্গমঞ্চে উপস্থিত করেছেন, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা যে পরিণতিতে পৌঁছুতে পারতো, বঙ্কিম তা হতে দেন নি। রোহিণী বা শৈবলিনীর চরিত্রে যে পরিণতির বীজ বপন করা হয়েছে, তারা তার স্বধর্ম্ম অনুসারে পত্র-পুষ্পে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠেনি। তারা আগাগোড়া গল্পের স্বকীয় বেগে বেড়ে ওঠেনি—গল্পকে উজান হাঁটিয়ে, বর্ণাশ্রমিক আদর্শকে জয়যুক্ত করার দিকেই তাদের গতি। এর ফলে, আর্টের বিচারে তাঁদের অনেকেরই মধ্যপথে মৃত্যু হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই মর্ম্মগত ত্রুটি ঘটেছে শুধু পূর্ব্বোক্ত কারণেই। সামাজিক উপন্যাসেও বঙ্কিম প্রধানতঃ নজর রেখেছিলেন সমাজ-গঠনের দিকে, রস-সৃষ্টির দিকে নয়।

সাধারণ পাঠকের কাছে রসের সূক্ষ্ম আবেদনের চেয়ে, তত্ত্বের মোটা কথাটা বড়। তাঁরা বঙ্কিমী উপন্যাসের এই তাত্ত্বিক দিকটা পেয়েই উল্লসিত হয়েছেন এবং শুধু এই দিক থেকেই তাঁকে বিচার করেছেন—তাই এদেশে তাঁকে জাতীয় আদর্শের পুরোধা বলে যতটা সম্মান দেওয়া হয়, শিল্পী বলে ততটা দেওয়া হয় না। তাই 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'র তুলনায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল' ইত্যাদির পাঠক দেশে আজো কম। বঙ্কিমের এই প্রতিষ্ঠা নিয়ে কোন প্রশ্ন তুলতে চাইনে। তবে বঙ্কিম-প্রবর্ত্তিত জাতীয়তার স্বরূপটাও বিশ্লেষণসাপেক্ষ। বঙ্কিমের সাহিত্যে অ-হিন্দু বিদ্বেষ আছে, একথা বঙ্কিম বেঁচে থাকলে, নিজেই স্বীকার করতেন। অনুন্নত হিন্দু, এমন কি হীনবিত্ত হিন্দুও তাঁর সাহিত্যের ত্রিসীমানায় ঘেঁসতে পারেন নি। রাজা, জমিদার, যোদ্ধা ও সন্ন্যাসী—এবং তাঁদের সুখ-দুঃখ নিয়েই বঙ্কিম ব্যস্ত। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানে,

উন্নত ও অনুন্নতে, ধনী ও দরিদ্রে, একটি স্থায়ী এবং অনড় বিভেদের গণ্ডী টেনে দিয়ে, তিনি কেবল সম্পন্ন বর্ণ-হিন্দুর সংহতি ও পরিপুষ্টিকেই দেশাত্মবোধ নামে প্রচার করে গেছেন। সমষ্টিগত সমন্বয় এবং সাম্য (যা পরবর্ত্তী বয়সে বঙ্কিম ভুল বলেই মনে করেছিলেন) অনুসারে তিনি দেশকে গড়তে চান নি। পরকীয় শক্তির প্রভুত্বেও তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

বঙ্কিম সমসাময়িকদের মধ্যে রমেশচন্দ্র দত্ত এবং দামোদর মুখোপাধ্যায় একদা উপন্যাসকার রূপে সমাদৃত ছিলেন। রমেশ দত্তের 'বঙ্গ-বিজেতা', 'মাধবী-কঙ্কণ', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', সমস্তই বঙ্কিমী আদর্শে লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাস এবং সুখপাঠ্য হলেও, সাহিত্য হিসাবে চলনসই। রমেশচন্দ্র প্রকৃতিগত ভাবেই ছিলেন ঐতিহাসিক—তাঁর রচনার ঐতিহাসিক যথার্থতা তাই বঙ্কিমের চেয়ে বলিষ্ঠতর, কিন্তু বঙ্কিমের অর্দ্ধেক স্বজনী-প্রতিভাও তাঁর ছিল না। তাই তিনি সত্যিকার উপন্যাসই লিখতে পারেন নি। ছেলেবেলায় এই বইগুলি আমরা সাগ্রহে পড়েছিলাম, সে শুধু এদের বিষয়গত আকর্ষণের গুণে—দেশের জন্যে, ধর্ম্মের জন্যে, স্বাধীনতার জন্যে, সতীত্বের জন্যে, অনন্যসাধারণ স্ত্রী-পুরুষদের সেই সমস্ত কার্য্য-কলাপ আমাদের কিশোর চিত্তকে বিশেষভাবেই নাড়া দিয়েছিল। কিন্তু বড় বয়সে আবার পড়তে গেলে, এদের ছত্রেছত্রে হোঁচট খেতে হয়—চরিত্র নেই, সজ্যাত নেই, রস নেই। আর রমেশচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাস দুটি ('সংসার' ও 'সমাজ') ত একেবারেই অচল।

কিন্তু বঙ্কিম-সমসাময়িকদের মধ্যে দামোদরবাবুর বেশ একটু বিশিষ্টতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের বৈবাহিক হবার সুযোগে তিনি অবশ্য তাঁর কয়েকখানি উপন্যাসের পরিশিষ্ট লিখে, মূল বইগুলিকেই খুন

করেছিলেন এবং সে অপরাধ এতই প্রবল যে তাঁর নিজের ভালো লেখাগুলোও কেউ এই কারণেই শ্রদ্ধা নিয়ে পড়েন নি। কিন্তু দামোদরের 'মা ও মেয়ে' বই-ই কোন কোন দিক থেকে অতি-আধুনিক বাংলা উপন্যাসের অগ্রদূত স্বরূপ। সমাজ বহির্ভূত যৌন-সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্ককে কেন্দ্র করে জটিল জীবন-দ্বন্দ্ব তিনি যতটা সাহসের সঙ্গে ফোটাতে চেষ্টা করেছেন, সে যুগের আর কারুর লেখাতেই তা পাওয়া যায় না। তাঁর দৃষ্টির বিস্তারও লক্ষ্যণীয়। দীন-দরিদ্র, চাষা, ছোটলোক, খুনী, অন্যায়কারী, এমন কি ব্যভিচারিণীকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। এটাও আধুনিকতারই গৌরচন্দ্রিকা স্বরূপ। সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপ চাঁদ', 'মাধবীলতা', 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' প্রভৃতি উপন্যাসও এই সময়ের রচনা হিসাবে কম উল্লেখযোগ্য নয়। বিশেষ করে শেষ বইটি।

[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত আসতে, মাঝেখানে যে ছোট্ট যুগটি পড়ে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তার দাম খুব কম নয়। প্রত্যেক যুগেই সেই যুগের নেতৃস্থানীয় লেখকদের প্রবর্ত্তিত ধারা ধরে অজস্র লেখা হয়—যা তাৎকালিক রুচির বিচারে সমাদরও পায়। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে সেই অনুকরণপুষ্ট রচনার আর কোন কদর থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবর্ত্তিত উপন্যাসগুলির সঙ্গে লেজুড় জুড়ে দিয়ে নূতন উপন্যাস লেখা পর্য্যন্ত বাদ যায়নি। এই আওতা থেকে বাংলা উপন্যাসকে নূতন দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবার দরকার ছিল। তারকনাথ গাঙ্গুলীর 'স্বর্ণলতা' সেই কাজ করলো।

এক সময় 'স্বর্ণলতা' বই দেশে খুব সমাদৃত হয়েছে, কিন্তু এখনকার পাঠক অনেকেই এই উপন্যাসটির খবর রাখেন না। যাঁরা রাখেন, তাঁরাও

একে সেকেলে বলে বাতিল করেই তৃপ্তি বোধ করেন। বস্তুতঃ মাইকেল থেকে রবীন্দ্রনাথে বাংলা কাব্যের বিবর্ত্তনে যেমন বিহারীলালের মধ্যস্থতা অনেকটা কাজ করেছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রেও তেম্নি তারক গাঙ্গুলী বঙ্কিম চন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মাঝখানে অববাহিকার মতো থেকে, দুটি বিশিষ্ট ধারাকে গ্রন্থিবদ্ধ করেছেন, এবং তার দ্বারা বাংলা উপন্যাসের পরবর্ত্তী পরিণতিকেও অনেকটা সুগম করে দিয়েছেন। বাংলা কাব্য এবং উপন্যাস (অবশ্য গদ্য সাহিত্যও) পরবর্ত্তীকালে রবীন্দ্রনাথের একক প্রভুত্বে এসে, তার বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য অর্জ্জন করলো। কিন্তু এই পরিণতির পথকে প্রশস্ত করে দেবার কাজে, তারক গাঙ্গুলী এবং বিহারীলাল তাঁকে অনেকটা প্রেরণা দিয়েছিলেন। বিহারীলালের ঋণ কবি স্বীকার করেছেন, কিন্তু তারক গাঙ্গুলী সম্বন্ধে তাঁর মতামত আমাদের শুনবার সুযোগ হয়নি।

তারক গাঙ্গুলী এবং বিহারীলাল শুধু এক সময়েরই লোক নন, দু'জনে এক পত্রিকারও লেখক ছিলেন। তৎকালীন 'অবোধ বন্ধু' নামক মাসিকে প্রথমের 'স্বর্ণলতা' এবং দ্বিতীয়ের 'সারদা মঙ্গল' ধারাবাহিক ভাবে বের হত। এই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে পড়তেন এবং তাঁর প্রথম বয়সের রচনার ওপর এই দুই লেখকেরই প্রভাব কিছু কিছু দেখতে পাওয়া যায়। তারক গাঙ্গুলীর রচনার বিশেষত্ব হচ্ছে, তাঁর রচনার একান্ত ঘরোয়া ভাব—রাজা-বাদশা, সিপাই-সেনানী বা সাধু-সন্ন্যাসী নিয়ে রোমান্স সৃষ্টি করা বা কর্ম্মযোগের আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করে, তাদের অপ্রাকৃত কার্য্যকলাপের বর্ণনা করা ছেড়ে, তিনি বাংলার সুপরিচিত প্রাত্যহিক জীবন-ধারা থেকেই কতক গুলি অংশ বেছে নিয়েছিলেন এবং তাকেই রূপ দিয়েছিলেন নিপুণ চিত্রকরের মতো। গৃহস্থ-জীবনের ছোট ছোট সুখ-দুঃখ, ছোট ছোট

ঈর্ষা-দ্বেষ, ছোট ছোট দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, বাইরে থেকে যাদের রং অত্যন্ত ফিকে, তাই তিনি তাঁর স্বচ্ছন্দ ভাষা ও সুললিত লিপি-চাতুর্য্যের গুণে সুষমান্বিত করে তুলেছিলেন। মোটা কথা তাঁরও হয়ত একটা ছিল—ভ্রাতৃ-বিরোধ জিনিষটা যে ভালো নয়, তাতে যে একান্নবর্ত্তী পরিবারের ধ্বংস অনিবার্য্য, এম্নি কিছু একটা সম্ভবতঃ তাঁর প্রতিপাদ্য ছিল এই উপন্যাসে, কিন্তু সেটা এতে বড়ও নয়, বিশিষ্টও নয়।

এই বইয়ে মূল আখ্যানাংশের টানে যে সমস্ত উপ-চরিত্র বা খণ্ড ঘটনা বা বিচ্ছিন্ন পরিপ্রেক্ষণী এসে পড়েছে, সে গুলোই হল এর আসল জিনিস। সে গুলোর সমবায়েই গল্পটা এমন জ্যান্ত হয়ে উঠেছে। বেহালা-ওয়ালা নীলকমল, তোৎলা গদাধরচন্দ্র বা ডাকসাইটে শ্যামা চরিত্র হিসাবে নিখুঁত এবং ডিকেন্সের চেয়ে তাদের অঙ্কণে কম শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। কালিঘাটের ভিখারীর মিছিল বা পল্লীগ্রামের যাত্রার আসর শরৎচন্দ্রের লেখনীতেও আর বেশী উজ্জ্বল হত না। অবশ্য প্রধান নারীচরিত্র প্রমদা অস্বাভাবিক—তাকে নির্জ্জলা দুর্বৃত্ত করেই আঁকা হয়েছে, যা বাস্তবে হয় না। কিন্তু সেটা গাঙ্গুলীর দোষ নয়, বঙ্কিম-প্রভাবের দোষ। চাঁচাছোলা সু ও কু দুই পক্ষ খাড়া করে, দুয়ের ভেতর দ্বন্দ্ব বাধিয়ে, ভালোর জয় এবং মন্দের ক্ষয় দেখানোর যে রীতি ছিল বঙ্কিমের একচেটে, তা থেকে দেশকে মুক্তি দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। তাঁর আগে একথা আমরা ভাবতেই পারিনি যে মানুষ অবিমিশ্র সু বা কু হয় না—সু এবং কু দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ভেতর দিয়েই মানুষকে দেখতে হয়। যথেষ্ট পরিমাণ বাস্তবপন্থী হয়েও, তারক গাঙ্গুলী এই দুষ্ট আদর্শবাদের হাত এড়িয়ে যেতে পারেন নি। ঠিক এই কারণেই গোপালের সঙ্গে স্বর্ণলতার প্রণয়-সঞ্চারের ইঙ্গিত দিয়েও তিনি থামতে পারেন নি। সেই

প্রণয়কে বিবাহের গঙ্গাজলে শোধন করে, তবেই বইয়ের উপসংহার দিয়েছেন। কিন্তু তাতে বইয়ের শেষাংশ যে কত খোঁড়া হয়েছে, তা তাঁর মতো শিল্পী টের পান নি, এটাই আশ্চর্য্য!

তারক গাঙ্গুলীর পাশে, এমন কি অল্প পরেও স্থান পেতে পারেন এমন ঔপন্যাসিক প্রাক-রবীন্দ্র সাহিত্যে আর কেউ নেই। তবু কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, যাঁদের রচনা কালক্রমে অপ্রচলিত হয়ে এলেও, বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পরিণতির মূলে যাঁদের প্রভাব কম-বেশী কাজ করেছে। 'বঙ্গবাসী' দলের ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং যোগেন্দ্র বসুর লেখা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এক সময় সাগ্রহ কৌতূহলে পঠিত হয়েছে। তাঁদের গল্প বানাবার অজস্রতা এবং সেই গল্প বলার অকপট সরলতা সত্যিই বিস্ময়কর! সুগভীর কোন জীবন-নীতির নির্দ্দেশ দেওয়া বা জটিল ভাব-সঙ্ঘাতের ভেতর দিয়ে কোন সুমহান সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁদের দ্বারা সম্ভব হয় নি। আবার উত্তেজনাহীন, আড়ম্বরহীন, আপাতনিষ্প্রভ আবেষ্টনীর ভেতর থেকে অকিঞ্চিৎকর সুখ-দুঃখকে আশ্রয় করে, প্রকৃত জীবনকে রূপ দেওয়াও তাঁদের শক্তির বাইরে ছিল। তাই সাম্প্রতিকের রুচি ও রসগ্রাহিতাকে তৃপ্ত করেই তাঁদের বইগুলি যথাসময়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তৎকালীন জীবন এবং তার আনুষঙ্গিক আতিশয্য, ন্যাকামি, ভণ্ডামি, ফচকেমি ইত্যাদির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় এই সব বইয়ে। সেই সঙ্গে পাওয়া যায় প্রচুর কৌতুকহাস্যের উপাদান, যা ইদানীং কালের সাহিত্যে হতাশাবাদের উপদ্রবে লোপ পেতে বসেছে।

ইন্দ্রনাথের 'কল্পতরু'তে চীৎপুর অঞ্চলের বাসিন্দাদের বা তৎকালীন সহুরে লোকেদের যে সমস্ত ছবি পাওয়া যায়, তা হুতোমের পাঠকদের

অচেনা নয়। কিন্তু হুতোমের চেয়ে ইন্দ্রনাথের ভাষা অপটু হলেও, নজর ধারালো ছিল। তিনি যাদের এঁকেছেন, তারা নিতান্তই ঠাট্টার প্রয়োজনে জন্মায় নি—সত্যিকার রক্ত-মাংসের মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছে, যদিও তাদের সমবায়ে যে গল্পটা গড়ে উঠেছে, তা তেমন স্বাভাবিক হয় নি। এই অস্বাভাবিকতা ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'তে আরো মারাত্মক হয়ে উঠেছে। তবে কি ইন্দ্রনাথ, আর কি ত্রৈলোক্যনাথ, দু'জনেরই ভাষার গতি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং মজলিস জমিয়ে গল্প বলার ধরণও মনোজ্ঞ। চুটকি জাতের সাহিত্য হিসাবে এঁদের বইগুলো অবশ্যই ভালো। কিন্তু চুটকি ত চিরদিনের জিনিষ নয়, তাই সময় পেরিয়ে যাওয়ার পর তার ধার আপনিই ভোঁতা হয়ে গেছে।

যোগেন্দ্র বসু এঁদের চেয়ে বড় দরের লিখিয়ে ছিলেন। ব্যঙ্গ বিদ্রূপের আড়াল থেকে দেখলেও, সত্যকার জীবন পর্য্যন্ত তাঁর নজর চলতো। তিনি 'মডেল ভগিনী' বা 'কালাচাঁদ' বা 'রাজলক্ষ্মী' প্রভৃতি বইয়ে যে জীবন চিত্রিত করেছেন, তাতে সাময়িকতার ছোঁয়া প্রচুর থাকলেও, রসের আমেজও আছে প্রচুর, যা সময়ের নিরূপিত গণ্ডীকে অতিক্রম করে আজকের পাঠক পর্য্যন্ত পৌঁছোয়। মডেল ভগিনীর ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভেতর বিদ্বেষের আভাস আছে—তিলকে তাল করে দেখানোর আতিশয্য নেই তাও নয়। তবু পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাতের ভেতর দিয়ে চরিত্রগুলো এমন একটা পরিণতিতে এসে দাঁড়িয়েছে, যা যথার্থ। এই যাথার্থ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি বলেই স্যাটায়ার হিসাবে মডেল ভগিনীর জৌলুষ আজো মিইয়ে যায় নি। একটা বিশেষ শ্রেণীর বাড়াবাড়িকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির নাম দিয়ে বাজারে চালু করার ভণ্ডামিকে লেখক আক্রমণ করেছিলেন। তাই তাঁর কৌতুকের তলায় তলায় আগা-গোড়া থেকে গেছে আক্রোশের একটা বিষাক্ত চাবুক, তবু গল্পের গাঢ়তা

দিয়ে তিনি সেটা মানিয়ে নিতে পেরেছেন। 'কালাচাঁদে' তাঁর হাসি অনেকটা প্রাণ-খোলা—পরবর্ত্তী কালের প্রভাত মুখুজ্যের লেখার মতো। কিন্তু কালাচাঁদেও হাসির পেছনে বেশ একটু অশ্রুর ছোঁয়াচ আছে, যাতে এই বাহির-গুণ্ডা ভিতর-কোমল মূর্খ মানুষটির জন্যে পাঠকের অনুকম্পা জাগে। আর রাজলক্ষ্মী—ঘটনার ঘনঘটা, গল্পের গাঁথুনি, সর্ব্বোপরি পরস্পর-বিরোধী অসংখ্য চরিত্রের অবতারণায় এই বিরাটকায় উপন্যাসটি সত্যিই নানামুখী বিশিষ্টতার পরিচয় দেয়। সেই রঘুদয়াল এবং শিয়াল মারা, সেই নায়িকা রাজলক্ষ্মী, কার না বাল্যে মনোহরণ করেছে? একটু গভীর দৃষ্টি এবং আর একটু অসাম্প্রতিকতা থাকলে, এ বইটা কখনই মারা যেতো না। অনেক দিক থেকেই 'রাজলক্ষ্মী' বাংলা ভাষার একখানা প্রথম শ্রেণীর বই।

এই আমলের আর একজন লেখক হচ্ছেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, যাঁর সম্বন্ধেও দু'কথা বলা দরকার। তাঁর 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' বইখানি বঙ্কিমোত্তর ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলির ভেতর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিম 'সীতারামে' বাংলার ইতিহাসকে স্পর্শ করেছিলেন, কিন্তু উপকথার ভেজালে সে ইতিহাস ঢাকা পড়ে গেছে। আগাগোড়া ইতিহাসকে অনুসরণ করে উপন্যাস লেখবার চেষ্টা হিসাবে এই বই-ই প্রথম এবং সাহিত্যাংশেও বইটির কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। পাদরী আমলে রামরাম বসু প্রতাপাদিত্যের চরিত নিয়ে একখানি আড়ষ্ট গদ্য বই লিখেছিলেন। সেই সামান্য উপাদানকে আশ্রয় করে এবং তার সঙ্গে প্রচুর স্বকীয় অনুসন্ধান এবং গবেষণার সংযোগ ঘটিয়ে, প্রতাপ ঘোষই প্রথম প্রতাপাদিত্যের একটি পূর্ণ কাহিনী দেশের সামনে তুলে ধরলেন। এই সুদীর্ঘ কাহিনী বা এর ফার্সি-মেশানো কটমটে ভাষা আজ আর বরদাস্ত করা সহজ নয় ঠিকই, কিন্তু পরবর্ত্তী কালের

সাহিত্যে এর প্রভাব কত বেশী, সেটা ভুলে গেলে চলবে না। রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে এই বইটিও পড়েছিলেন। তাঁর 'বউ ঠাকুরাণীর হাট' লেখার প্রেরণাও বোধ হয় এখান থেকেই পাওয়া। কিন্তু সে কথা যাক। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' বাঙালীর শৌর্য্য-বীর্য্য, যুদ্ধ-নৈপুণ্য, শাসন-প্রণালী ইত্যাদির যেমন অনেক বিস্মৃত এবং বিস্ময়কর বিবরণ আছে, বাঙালীর কাপুরুষতা, কপটতা ইত্যাদিরও তেমনি অনেক কৌতুকপ্রদ ঘটনা আছে। এদিক থেকে বইখানার মূল্য খুব বেশী। হাঁড়ি মাথায় দিয়ে জলে বসে থাকার গল্প আজো সকলেরই ভালো লাগার কথা।

[৫]

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্য নিয়ে আমরা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে কোন আলোচনা করবো না। তা করার কোন সার্থকতাও নেই। শুধু এইটুকু প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা দরকার যে বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত উপন্যাস-সাহিত্য শরৎচন্দ্রে এসে যে পরিণতি লাভ করলো, রবীন্দ্রনাথ দুই প্রান্তের মাঝখানে থেকে, তাতে সবিশেষ প্রাণ-প্রেরণা সঞ্চার করেছেন। নিছক গল্প বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করাই যে উপন্যাস সাহিত্যের এক মাত্র লক্ষ্য নয়, এবং আদর্শ নর-নারীর প্রবর্ত্তন করে, তাদের কার্য্য-কলাপের ভেতর দিয়ে জাতিকে মতের সন্ধান ও পথের নির্দ্দেশ দেওয়াই যে ঔপন্যাসিকের সব চেয়ে বড় কাজ নয়, এটা রবীন্দ্রনাথই প্রথম বোঝালেন। বাইরে ঘটনার ঘনঘটা কিছু মাত্র না থাকলেও, ভেতরে ভেতরে মানুষের জীবনে যে কত দ্বন্দ্ব, কত ভাঙা-গড়া, কত ওলট-পালট হয়ে যেতে পারে, এবং ভেতরকার সেই ভাব-বিপর্য্যয়ে তার বাইরের জীবনকে যে কি অসম্ভাবিত পরিণামের মুখে নিয়ে যেতে পারে, তা রবীন্দ্রনাথই প্রথম তাঁর উপন্যাসে দেখালেন। বলা বাহুল্য যে অনেক জিনিষের মতো বাংলায় মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসেরও তিনিই জনয়িতা এবং আজ পর্য্যন্ত বাংলা উপন্যাসে

তাঁর বিন্যাস-রীতিই প্রধানতঃ অনুসৃত হয়ে আসছে। শরৎচন্দ্র উপন্যাসের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছেন প্রচুর। জীবনের যে সমস্ত সুর কোনদিন এদেশের সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করেনি, তিনি তাদের স্বীকৃতি দিয়েছেন, জীবনকে আদর্শের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করে, তার প্রত্যক্ষ রূপকে স্বীকার করে নিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসের বিন্যাস-রীতি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথের কাছেই, একথা তিনি নিজেই স্বীকার করে গেছেন।

রবীন্দ্র সমসাময়িক এবং প্রাক-শরৎ ঔপন্যাসিকদের মধ্যে প্রায় সকলেই সাম্প্রতিক লেখক হিসাবে বিশেষ প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করেছিলেন। শরৎচন্দ্রের যাদুকরী প্রতিভার আবির্ভাব এবং দেশের সাহিত্যে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব, তাঁদের সেই যশ অনেকটা ম্লান করে ফেলেছে, নইলে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের কারুর দানই উপেক্ষার নয়। হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের 'রঙ-মহল' বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন, মোগল হারেমের বিচিত্র প্রেম কাহিনীগুলি তিনি কি সুন্দর মনোজ্ঞ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই সেলিমা বেগমের প্রণয় এবং তার শোচনীয় পরিণাম, সেই সবিতা-সুদর্শনের সুগভীর ভালোবাসার সুমহান ব্যর্থতা—এ কোনদিন ভোলবার নয়। এই বইয়ের ছোট ছোট গল্পগুলি বাংলা রোমান্স সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম নিদর্শন স্বরূপ। কি গল্পের গাঁথুনিতে, কি ভাষার অলঙ্করণে, কি ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে, এদের তুল্য ঐতিহাসিক কাহিনী বাংলায় আর লেখা হয়নি বললেই চলে। এরই পাশে ধরুন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের 'বেণের মেয়ে'। এটি বৌদ্ধ বাংলার পটভূমিতে লেখা একটি কল্পিত কাহিনী, কিন্তু সমস্ত কাহিনীটিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে সত্যিকার ইতিহাস। বেণের মেয়ের রচনাপদ্ধতি বঙ্কিমোত্তর লেখকদের পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি কোন স্বপ্নবিহ্বল রোমান্সের সৃষ্টি করেন

নি, বা কোন জটিল হৃদয়-দ্বন্দ্বের ফেনায়িত কাহিনীও রচনা করেন নি। সাধাসিধে সরল ভাষায় একটা পুরানো আমলকে গল্পের মধ্যে দিয়ে চিত্রিত করেছেন। অথচ পুরানো বলতে যে শ্রেণীর আষাঢ়ে গল্পকে বোঝায় তা নয়, এ হচ্ছে গৃহস্থ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের গল্প। কিন্তু সেদিনের জীবন ছিল অন্য রকম। তার কাহিনীও তাই অন্য রকম। নদীতে তুফান উঠবার পর বেণেনীর বমি বন্ধ করার জন্যে নদীতে পিপে-ভর্ত্তি গর্জ্জন তেল ঢালা, হাতী-ঘোড়া, লোক-লস্কর নিয়ে মহা-সমারোহে গুরুর আবির্ভাব—এমনি আরো অনেক কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র বেণের মেয়ের সর্ব্বত্র ঝলমল করছে। আর এর ভাষা? বঙ্কিম প্রভাবিত সংস্কৃতনবীশ শাস্ত্রীর খাস বাংলা ষ্টাইলের সঙ্গে কার না পরিচয় আছে? ঘরোয়া বাংলার জোর কত বুঝতে হলে, এ বইটি পড়া চাই-ই।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রসঙ্গে আর এক জনের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তিনি হচ্চেন 'ধর্ম্মপাল', 'শশাঙ্ক' প্রভৃতির লেখক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেঞ্জোদাড়োর আবিষ্কারক এবং 'বাংলা দেশের ইতিহাস' লেখক রূপেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দেশে সমধিক প্রসিদ্ধ। কিন্তু সাহিত্যিক রূপেও তাঁর মর্য্যাদা কিছু কম হবার কথা ছিল না। যে কর্ণ-সুবর্ণ, গৌড়, সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্ত নিয়ে আমাদের কথায় কথায় কণ্ঠ অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে, তার আসল পরিচয় আমরা জানি না। এই পরিচয় উদ্‌ঘাটিত করেছেন রাখালদাস তাঁর ওপরকার উপন্যাস দু'খানিতে। ঐতিহাসিক মাল-মশলার আধিক্যে উপন্যাসের জীবনী-শক্তি ক্ষুণ্ণ হবার যথেষ্ট ভয় ছিল। কিন্তু আশ্চর্য্য রাখালদাসের লিপি-চাতুর্য্য! আহরণী প্রতিভার সঙ্গে সৃজনী প্রতিভাও ছিল তাঁর প্রচুর পরিমাণে। বিচিত্র চরিত্রের অবতারণা, তাদের পারস্পরিক ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রণ,

ঘটনানুযায়ী পারিপার্শ্বিক অঙ্কন, সব বিষয়েই লেখনীর লীলা তাঁর বিস্ময়কর। ধর্ম্মপালের গোড়ায় যে শিব মন্দিরের চিত্রটি আছে এবং তাকে কেন্দ্র করে যে খণ্ড-ঘটনাটি জমে উঠেছে, তা আমার স্মৃতিতে এখনো ঝলমল করছে। এই সঙ্গে আসল ইতিহাসের ব্যতিক্রম হয় নি, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলোর মতো, সেও কম সৌভাগ্যের কথা নয়।

এই সময়ের প্রসিদ্ধ গোয়েন্দা উপন্যাস লেখক পাঁচকড়ি দেরও নামোল্লেখ প্রয়োজন। তাঁর 'মায়াবী', 'গোবিন্দরাম' ইত্যাদি একদিন আমরা রুদ্ধশ্বাস কৌতূহলে পড়েছি। তাঁর ঘটনাগুলো দেশী এবং গোয়েন্দাদের পদ্ধতিও বিদেশী নয়—কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। পাঁচকড়ি দের সঙ্গে আরো অনেকে গোয়েন্দা উপন্যাস লিখেছিলেন, যেমন যতীন পাল, সুরেন ভট্টাচার্যি ইত্যাদি। কিন্তু সে সমস্তই কোনান ডয়েল, এলান পো, এডগার ওয়ালেশ প্রভৃতি বিখ্যাত গোয়েন্দাকাহিনী রচয়িতাদের বইয়ের অক্ষম বাংলা সংস্করণ ছাড়া আর কিছুই নয়। আজো পর্য্যন্ত বাংলা সাহিত্যের এই দিকটা যথেষ্ট পূর্ণতা লাভ করে নি। অবশ্য বাংলা দেশের জীবন যথেষ্ট ঘটনা-সঙ্কুল নয় বা তাতে রোমাঞ্চকর হত্যা, ডাকাতি, গুপ্ত-চক্রান্ত ইত্যাদির অবকাশও অত্যন্ত কম। তাই সত্যিকার গোয়েন্দা কাহিনী লেখবার মাল-মশলার এদেশে একান্ত অভাব। কিন্তু লেখকদের উদ্ভাবনী-শক্তির অভাবও এজন্যে কম দায়ী নয়। যন্ত্র-বৈজ্ঞানিক আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত বাংলা ডিটেক্টিভ কাহিনী আজকাল লেখা হয়, তারও কিছু কিছু আমি পড়ে থাকি—সংক্ষেপে বলতে পারি, সেগুলো নির্জ্জলা অপাঠ্য। এর চেয়ে পাঁচকড়ি দের বইগুলো অনেক ভালো। দীনেন্দ্র কুমার রায়ের বৈদেশিক গোয়েন্দা কাহিনীর তর্জ্জমাও ঢের ভালো।

কিন্তু গোয়েন্দা উপন্যাসের ব্যাপার যাই হক, রবীন্দ্র সমসাময়িক আমলে গার্হস্থ্য উপন্যাস যথেষ্ট এগিয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে যাঁদের নাম উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শৈলবালা ঘোষজায়া, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, জলধর সেন, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, স্বর্ণকুমারী দেবী, কুসুমকুমারী দেবী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতির রচনার এখনো যথেষ্ট কদর আছে। সুরেন্দ্র ভট্টাচার্য্যের 'বিনিময়' সুখপাঠ্য রচনা, অবশ্য 'স্বর্ণলতা'র নকল। তাঁর আধ্যাত্মিক উপন্যাস গুলিতে যোগবলে অলৌকিক কাণ্ড করবার যে সব বিবরণ আছে, তা হাস্যোদ্দীপক। কিন্তু দেশে এ-জন্যেই তিনি দার্শনিক পণ্ডিত নামে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। নারায়ণ ভট্টাচার্য্যের 'মণির বর' সুন্দর লেখা—আগাগোড়া ঝরঝরে, পল্লী-জীবনের নানা খুঁটিনাটি বিষয় বর্ণনায় তাঁর দৃষ্টির স্বচ্ছতা এবং ভাষার প্রসন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু রচনা তাঁর অত্যন্ত বহির্মুখী। হারাণ রক্ষিতের 'কামিনী-কাঞ্চন' নীতিমূলক উপন্যাস—নাটকে রূপান্তরিত হয়ে একদা তা বাংলা দেশে অশ্রুর বন্যা বইয়ে দিয়েছে। বাল্যকালে শোনা সেই সিধে বৈরাগীর গান এখনো ভুলি নি। কিন্তু বইটি নিতান্তই সাধারণ। শৈলবালা দেবী এবং জলধর গার্হস্থ্য জীবনের ছোটখাটো চিত্রগুলি অত্যন্ত নিপুণ ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এঁদের আর একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, এঁরা দু'জনেই পল্লী বাংলার একটা অবহেলিত প্রশ্নের দিকে দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—তা হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান মৈত্রীর প্রশ্ন। আজকের এই বিবদমান দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একদা যে কত মধুর আদান-প্রদানের সম্বন্ধ প্রচলিত ছিল, তার চিত্র পাওয়া যায়, প্রথমের 'সেখ আন্দু'তে এবং দ্বিতীয়ের 'করিম সেখে'। কালধর্ম্মে এ চিত্র আজ দুর্লভ হয়েছে, সেই জন্যেই এই দুটি বইয়ের আজ আরো আদর হওয়া

উচিত, যেমন হওয়া উচিত মুসলমান কবি সৈয়দ হোসেনের 'শিব মন্দির' প্রভৃতি বইয়ের। এ ছাড়া জলধর সেনের 'বড় বাড়ী' এবং 'অভাগী' প্রাক-শরৎ বাংলা উপন্যাসের জনতার ভেতর দু'খানি সত্যি জাতের রচনা। অকপট আন্তরিকতা দিয়ে লেখা। অবশ্য আদর্শের দিক থেকে এরাও কতকটা স্বর্ণলতারই অনুগামী।

কুসুমকুমারী দেবীর 'শুভ বিবাহ' বাঙালী মেয়েদের লেখা উপন্যাসের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম। কিন্তু প্রথমতার দাবী ছাড়া আর কোন দাবী এর আছে কি না সন্দেহ! স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাও তাই। 'ছিন্ন মুকুল', 'দীপ নির্ব্বাণ' ইত্যাদি ঐতিহাসিক উপন্যাস আজ আর পড়া যায় না। এই দলের মধ্যে প্রভাত মুখোপাধ্যায় এবং যতীন্দ্র সিংহ শুধু উল্লেখের যোগ্যই নন, রবীন্দ্র সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁরা প্রথম শ্রেণীর লেখক। প্রভাত-কুমারের সত্যিকার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে তাঁর গল্পে, কিন্তু উপন্যাসেও তাঁর হাতের চাতুর্য্য বড় কম প্রকাশ পায় নি। 'সিন্দূর কৌটা', 'রত্ন দীপ', 'মনের মানুষ' হাল্কা হাতের লেখা হিসাবে অনবদ্য রচনা, দিবা-নিদ্রার পূর্ব্বে পড়বার মতো (after-dinner fiction) এমন ঝরঝরে মিষ্টি বই আর কেউই লিখেছেন কিনা জানি না। আর যতীন্দ্র সিংহের 'ধ্রুবতারা'কে ত আমি একদিক থেকে আধুনিক বাংলা উপন্যাসের প্রথম পথ-প্রদর্শক বলেই মনে করি। সাহিত্যের 'স্বাস্থ্যরক্ষা' আন্দোলনে আধুনিক লেখকদের বিরুদ্ধাচরণ করলেও, বিবাহ বহির্ভূত Intellectual প্রেম নিয়ে ইনি প্রথম উপন্যাস লেখেন এবং মনস্তত্ত্বের দোহাই দিয়ে তার সমর্থনও করেন।

[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথে, এবং রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রে এলে, বাংলা উপন্যাসের একটা ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আগে বাঙ্গলায় উপন্যাস নিয়ে যে পরীক্ষা হয়েছে, তার মূল্য ততটা সাহিত্যিক নয়, যতটা ঐতিহাসিক। বঙ্কিমই সর্ব্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ উপন্যাস লিখলেন এবং নিজে যা লিখলেন, তার চেয়ে অনেক বেশী সম্ভাবনীয়তার নির্দ্দেশ রেখে গেলেন তাঁর রচনার ভেতর।

রবীন্দ্রনাথে সেই সম্ভাবনীয়তার বীজ অঙ্কুরিত হল প্রথম, তারপর তা থেকে পত্রে-পুষ্পে সুষমান্বিত বনস্পতি দেখা দিল। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের উপন্যাসগুলিতে বঙ্কিমের বিন্যাস-রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। মধ্যবয়সে তিনি বঙ্কিমকে অতিক্রম করে গেলেন জীবন-নীতির গভীরতায় এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রসারতায়, আর শেষ জীবনে তিনি আধুনিক প্রজ্ঞাবাদের প্রবর্ত্তনায় বাংলা উপন্যাসের স্রোতকে দিলেন একটি সম্পূর্ণ নূতন দিকে মোড় ফিরিয়ে।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস সাহিত্যকে মোটামুটি ভাবে তিন পর্ব্বে ভাগ করতে পারি। প্রথম পর্ব্বে 'বৌঠাকুরাণীর হাট', 'রাজর্ষি', 'নৌকাডুবি' প্রভৃতি উপন্যাসে কবি প্রধানতঃ লক্ষ্য রেখেছেন গল্প বলার ওপর এবং সেই গল্পকে সুন্দর করে বলার জন্যে, যে সমস্ত আবেষ্টনীর সৃষ্টি ও হৃদয়-দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন, তাতে বৈচিত্র্য এবং শিল্পীক নৈপুণ্যও প্রকাশ পেয়েছে যথেষ্ট। তবু মনোযোগ দিয়ে পড়লেই দেখা যাবে যে এই উপন্যাসগুলিতে কবি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীটিকে ষোল-আনা পান নি—তিনি বঙ্কিমের কাঠামো অনুসরণ করেই সৃষ্টি করেছেন। অর্থাৎ এই বইগুলোর ভেতর সেই সূক্ষ্ম মননশীল ও তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির আবেদন নেই, যা রবীন্দ্র-রচনার একটি বিশেষ ধর্ম্ম। এই বহির্মুখিতা ও গতানুগতিক পদ্ধতির অনুগমনকে কবি নিজেই পরে অস্বীকার করেছেন। তার প্রমাণ, 'বৌঠাকুরাণীর হাট' এবং 'রাজর্ষি'র আখ্যাংশ নিয়ে তিনি পরে

'প্রায়শ্চিত্ত' ও 'বিসর্জ্জন' নাটক রচনা করে, প্রকারান্তরে ওদের বাতিলই করে দিয়েছেন।

দ্বিতীয় পর্ব্বের সুরু 'চোখের বালি'তে এবং 'গোরা'তে তার পূর্ণতা। এই পর্ব্বে নিছক গল্পকে অতিক্রম করে, কবি এলেন সমস্যা-বিচারে এবং বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে এই থেকেই বিশ্লেষণমুখিতার সূত্রপাত হ'ল। সমস্যা বঙ্কিমও নিয়েছিলেন এবং 'চোখের বালি'তে রবীন্দ্রনাথ যে সমস্যা নিয়েছেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' তিনি ঠিক সেই সমস্যাতেই হাত দিয়েছিলেন। কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে সমস্যাকে তার স্বাভাবিক পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার পথে, বঙ্কিমের প্রধান অন্তরায় হয়েছিল তাঁর অতি-নৈতিক মনোধর্ম্ম। বঙ্কিম দেখেছিলেন, বালবিধবা রোহিণীর স্বাভাবিক নিয়মেই পদস্খলন হয়েছে, কিন্তু তাকে তিনি সমর্থন করতে ত পারেনই নি, সহানুভূতি দেখাতেও তাঁর আপত্তি হয়েছে, যেহেতু তিনি শিল্প-সৃষ্টি করতে বসেও ভুলতে পারেন নি যে সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার গুরুদায়িত্ব তাঁর হাতে ন্যস্ত। অর্থাৎ তিনি মনস্তত্ত্বসম্মত পথে বাস্তব অবস্থার বিচার করেন নি। রবীন্দ্রনাথ সেই দুর্লভ সৎসাহস দেখালেন বিনোদিনীকে চিত্রিত করে। 'গোরা'তে তিনি জাতীয়তাবোধকেও অনুরূপ পন্থায় বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে বিবেচনা-হীন সংস্কারের অন্ধতায় দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাকে আমরা যাবতীয় সংস্কারের ওপর স্থান দিতে যাই, অনেক সময়ই তার পেছুনের বনিয়াদটা কাঁচা। বাস্তব অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাতে যেদিন সেই রূঢ় কঙ্কালটা বার হয়ে পড়ে, সেদিনকার রিক্ততা আর কোন অবলম্বনই পায় না। 'আনন্দ-মঠের' সাম্প্রতিক জাতীয়তাবাদের প্রতিক্রিয়ারূপেই বোধ হয় এই দৃষ্টি 'গোরা'র ভেতর দিয়ে এত স্পষ্ট করে প্রকাশ পেলো।

তৃতীয় পর্ব্ব 'ঘরে বাইরে' থেকে আরম্ভ এবং 'চার অধ্যায়' পর্য্যন্ত

এরই জের চলে এসেছে। সুধু মাঝখানে 'শেষের কবিতা' একটা স্বয়ং-সম্পূর্ণ পর্ব্বরূপে দেখা দিয়েছে, যা রবীন্দ্র-উপন্যাসের ক্রমিক ধারা থেকে বিচ্ছিন্ন। বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক নর-নারীর চটুল জীবন নিয়ে সহানুভূতি মিশ্রিত কৌতুক করার জন্যেই এর সৃষ্টি এবং সেদিক থেকে এ রচনা ষোল-আনা সার্থক। তৃতীয় পর্ব্বে এসে রবীন্দ্রনাথ কথা-সাহিত্যের প্রচলিত প্রসিদ্ধিকে একেবারেই এড়িয়ে গেলেন এবং গাল্পিকতা ও বস্তুমুখিতা দুয়েরই ওপর যবনিকা টেনে দিয়ে, একাগ্র নিষ্ঠার সঙ্গে নির্ব্বিশেষ তত্ত্বকে আশ্রয় করলেন। আধুনিক কালের যে প্রাবন্ধিক উপন্যাস ইউরোপ ও আমেরিকার সাহিত্যে দেখা দিয়েছে, এরা তাদেরই সগোত্রীয় এবং উপন্যাস রূপে না হক, সাহিত্য হিসাবে এদের উৎকর্ষ অনায়াস-শ্রদ্ধাতেই স্বীকার করে নিতে হয়।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই তিন পর্ব্ব নিয়ে সমগ্রভাবে আলোচনা করলে মোটা কথা এই দাঁড়ায় যে বঙ্কিম প্রবর্ত্তিত ধারার অনুসরণ করেই কবি উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন এবং তাঁর স্বকীয় দৃষ্টি, চিন্তা ও মননশীলতার স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই তা ধীরে ধীরে তার আধুনিকতম পরিণতিতে এসে উপস্থিত হয়েছে। এই পরিণতির স্বরূপ যদিও এত কম পরিসরে বোঝানো সম্ভব নয়, তবু সংক্ষেপে দু'এক কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে বাস্তব বরাবরই থেকে গেছে পশ্চাৎপটে, আর প্রত্যক্ষভাবে যা ফুটেছে, তা হচ্ছে কবির ব্যক্তি-মনের প্রজ্ঞাশীলতা। তিনি যে নর-নারীদের প্রবর্ত্তন করেছেন, তারা পুরোপুরি রক্ত-মাংসের মানুষ নয়—তারা হচ্ছে এক একটি মানবায়িত ভাব। পরস্পর-বিরোধী ভাবের সংঘর্ষ থেকে তাই রবীন্দ্র-উপন্যাসে যে সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া জন্ম নেয়, তা বস্তু-সংসারের স্বধর্ম্মসঞ্জাত নয়, তা তাত্ত্বিক গ্রন্থি-মোচনেরই ক্রমানুবৃত্তি। বলা বাহুল্য,

এই নূতন দৃষ্টি-ভঙ্গী বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ দান। শরৎচন্দ্র থেকে আধুনিক লেখক পর্য্যন্ত, সকলেই এই মননশীলতার দ্বারা সবিশেষ প্রভাবান্বিত হয়েছেন।

রবীন্দ্র-উপন্যাসের এই অমানবিক কারু-কলা শরৎচন্দ্রের হাতে এসে যদিও অন্য রূপ নিয়েছে, বিষয় ও বিন্যাস দু'দিক থেকেই তিনি নূতনত্বের দাবী প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তবু রসসৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা এবং সেই সৃষ্টিকে শিল্প-রূপ দেবার বাহন, তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকেই পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথে বাস্তব মানুষ নেই, একথা আগেই বলেছি। তবু যাদের মানুষ করে তিনি আসরে নামিয়েছেন, তারা সমাজ-সৌধের উঁচুতলার বাসিন্দাদেরই প্রতিচ্ছবি। বঙ্কিমের রাজা-জমিদার, নাইট ও সন্ন্যাসী-দের পর তারা স্পষ্ট ব্যতিক্রম সন্দেহ নেই, কিন্তু শরৎচন্দ্রের আগে বাংলা উপন্যাসে আমরা সত্যিকার আমাদের দেখিনি। আমরা যারা উঁচুতলারও নই, আবার পথেরও নই, সেই মধ্যবিত্তদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাবিক যোগ দৃঢ় না হওয়াই বোধ হয় তাঁর উপন্যাসের অপৌরুষেয়তার প্রধান কারণ। কিন্তু আসল কারণ বোধ হয় কবির মনোধর্ম্মের একান্ত অন্তর্মুখিতা, যা বস্তুসংসারের প্রত্যক্ষ চেহারাকে তাঁর দৃষ্টিতে পরিপূর্ণরূপে প্রকট হতে দেয় নি। কিন্তু শিল্পের বিচারে ওটা খুব বড় কথা কিনা সন্দেহ। নিছক রস-পরিবেষণের কাজে রঙের জৌলুষটা বাহুল্য নয়, হয়ত অপরিহার্য্যই। ভাষা-শিল্পের এবং যুক্তি-সিদ্ধ বিচার-বিতর্কের উৎকৃষ্টতম নিদর্শনরূপে রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস-সাহিত্য চিরস্মরণীয় হয়েছে, এখানেই তার সত্যিকার শ্রেষ্ঠতা।

[৭]

শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিকদের অনেকের রচনা নিয়েই আমি ইতিপূর্ব্বে আলোচনা করেছি। যাঁরা বাদ পড়েছেন, তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট

শ্রেণীর লেখক-লেখিকা কেউ নেই। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের ক্রমপরিণতি বোঝাতে হলে তাঁদের সম্বন্ধেও দু'চারটি কথা বলা দরকার। শ্রীমতী অনুরূপা দেবী ও শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর লেখা নিয়ে মেয়ে-মহলে ত বটেই, পুরুষ-মহলেও প্রচুর হৈ-হৈ হত, বিশেষতঃ অনুরূপা দেবীর লেখা নিয়ে। দুঃখের বিষয়, প্রথমার কোন লেখাই আমার বিশেষ ভালো লাগে নি। 'মা' উপন্যাসে তিনি কলির রাম-সীতা রূপে এক জোড়া স্ত্রী-পুরুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের জীবনের ট্র্যাজেডী (সেই সঙ্গে পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদির মহিমা) বর্ণন করে, ধর্ম্মনিষ্ঠ পাঠক-পাঠিকার শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আদর্শ-বাদের অসম্ভাব্যতা, গল্পাংশের অসারতা এবং রচনা-রীতির অপ্রাঞ্জলতা রসিক পাঠকের বিরক্তিই উৎপাদন করে। অন্ততঃ আমার তাই করেছে। 'মন্ত্র-শক্তি' এবং 'পোষ্য পুত্র' নামে তাঁর আর দু'খানি বইও পড়েছি—তারাও একই জাতের রচনা, অধিকন্তু প্রথমটির গল্পাংশ বাইরে থেকে নেওয়া।

শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর কতকগুলি লেখার আমি পক্ষপাতী। ভৃগু সংহিতার গণনা বা মনুসংহিতার অনুশাসন মিলিয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং নীতি উপদেশমূলক উপন্যাস তিনি লেখেন নি, এ আমাদের পক্ষে সৌভাগ্য। পল্লীগ্রামের পটভূমিতে সুখে-দুঃখে যে জীবন নিত্য নিঃশব্দে বয়ে চলেছে, তা থেকেই তিনি বিষয় আহরণ করেছেন এবং স্নেহার্দ্র মমতায় সেই জীবনকে তিনি চিত্রিত করেছেন। 'দিদি', 'অন্নপূর্ণার মন্দির', 'উচ্ছৃঙ্খল' এই তিন খানি বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা মহিলা-সুলভ আতিশয্য সত্ত্বেও, এগুলির আন্তরিকতা, স্পষ্টতা এবং উজ্জ্বলতা অবশ্যই লক্ষ্য করেছেন। নিরুপমা দেবীর রচনার এই শিল্পীক সৌকুমার্য্য এবং প্রকাশ-ভঙ্গীর এই স্বচ্ছ প্রসন্নতা যে সহজ প্রতিভার পরিচয় দেয়, তার

অর্দ্ধেকও অনুরূপা দেবীর নেই বলেই অবাস্তব আদর্শ এবং কটমটে বাংলার বাড়াবাড়ি দিয়ে তাঁকে বই জমাতে হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্য্য এ দেশের শিল্প-বিমুখিতা! অনুরূপা দেবীর রচনাই দেশের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার চোখে অনুরাগের বান ডাকিয়েছে! বইয়ের পাতা ছেড়ে সেই অশ্রু-প্লাবন সিনেমা এবং রঙ্গমঞ্চের অঙ্গন পর্য্যন্ত কল্লোলিত হয়েছে। নিরুপমা দেবীর সে হিসাবে আজো বিশেষ সমাদরই হয়নি।

এইখানে বলে রাখা যেতে পারে যে শরৎচন্দ্রের ভাগলপুর জীবনে নিরুপমা দেবী এবং তাঁর অগ্রজ বিভূতিভূষণ ভট্ট ছিলেন তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে নিরুপমা দেবীর লেখার ওপর উপন্যাস-সম্রাটের হাতের বিশেষ ছাপ পড়েছে। অন্ততঃ পক্ষে উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর দৃষ্টিকে সজাগ করে দেওয়ার পেছুনে শরৎচন্দ্রের যে বেশ একটু প্রভাব ছিল, একথা সুনিশ্চিত। পক্ষান্তরে অনুরূপা দেবীর মনের আকাশ আচ্ছন্ন করে রয়েছেন তাঁর পিতামহ মরালিষ্ট ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়, যাঁকে অতিক্রম করে তিনি কোন দিনই সহজ দৃষ্টিতে জীবনের বা পৃথিবীর দিকে তাকাতে পারলেন না। ভূদেব মুখোপাধ্যাকে আমি শ্রদ্ধা করি, কিন্তু তাঁর চিন্তা-ধারা যে আজ আর চলে না, একথাও অসঙ্কোচেই স্বীকার করি।

এই সময়ের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং ফণীন্দ্রনাথ পালের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের সকলেরই কিছু কিছু উপন্যাস ছেলেবেলায় আগ্রহ সহকারে পড়েছি। তখনকার কল্পনা-প্রবণ চিত্তে এই সব বই বেশ ছাপও ফেলতো। আজ আর এরা ভালো লাগবে না ঠিকই, কিন্তু এই সব বইয়ে দুটো জিনিষ লক্ষ্য করবার আছে, এক ভাষার শুচিতা, আর দেশের জীবন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে সুগভীর অভিজ্ঞতার পরিচয়, যার একটাও ইদানীংকার উপন্যাসে

পাই না এবং সেজন্যে আমাদের সাহিত্য থেকে জাতীয়তার বন্ধনই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে বলে আমার বিশ্বাস। হেমেন্দ্রপ্রসাদের 'প্রিয়া', শচীশচন্দ্রের 'কুঞ্জের ঝঙ্কার', ফণীন্দ্রনাথের 'স্বামীর ভিটা', 'সইমা' ইত্যাদি বইয়ে অসাধারণত্ব কিছু নেই। 'স্বর্ণলতা' থেকে যে শ্রেণীর গার্হস্থ্য উপন্যাসের সূচনা, এরা তারই বিলম্বিত অনুপূরক মাত্র। কিন্তু নিজস্বভাবে প্রত্যেকটি বই-ই বেশ ঝরঝরে এবং সুখপাঠ্য, এইটুকুও বড় কম কথা নয়। সত্যেন্দ্রকুমার বসু, সরোজনাথ ঘোষ, দেবেন্দ্রনাথ বসু প্রমুখ আরো কয়েকজন লেখক ছিলেন, যাঁদেরকেও এই দলের অন্তর্গত করা যেতে পারে।

এক কথায় এই লেখক-লেখিকাদের আমি 'বসুমতীর দল' আখ্যা দিতে পারি। ভাষা-বিন্যাসে এঁরা বঙ্কিমপন্থী, সাহিত্যাদর্শেও এঁরা বঙ্কিমানুগামী। অর্থাৎ এঁরা প্রগতি-বিরোধী বা রক্ষণশীল দলের সাহিত্যিক। প্রচলিত হিন্দুয়ানি ও তার আনুষঙ্গিক আচার-অনুষ্ঠানকে স্বীকার করে নিয়েই এঁরা সাহিত্য-সৃষ্টিতে অগ্রণী হয়েছেন এবং যুগ-ধর্ম্মের প্রতিকূলে চালিত বলেই এঁদের সাহিত্যে বাস্তবতার বাঁধন এত আল্গা। এঁদের পিঠপিঠ আর একটি দল দেখা দেয়। সেটি হল তখনকার নব্য দল। মোটামুটিভাবে এঁদেরকে বলা যেতে পারে 'ভারতীর দল'। এঁরা রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্য পড়েছিলেন এবং শুধু পড়াই নয়, রীতিমতো ভাবে এই দুই প্রতিভার অনুসরণই করেছিলেন। এঁদের রচনায় তাই বর্ণাশ্রমিক নীতি-নিষ্ঠার স্থানে এলো বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য এবং প্রত্যক্ষ জীবনের আন্তরিকতা। এইখানেই হল আধুনিক উপন্যাসের ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা। এই দলের মধ্যে চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বাংলা উপন্যাসের রাজ্যে যাঁরা আধুনিক নামে খ্যাত, তাঁদের ঠিক আগেকার দল হিসাবে এঁরাই যে তাঁদের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন সে কথা অস্বীকার করা চলবে না। তাছাড়া, দেশ-বিদেশের সাহিত্য থেকে নব নব পদ্ধতির প্রবর্ত্তন বিষয়েও এঁরাই অগ্রদূত স্বরূপ। এমন কি, অতি-আধুনিক সাহসিকতার মূলেও এঁরাই কতকটা প্রেরণা জুগিয়েছিলেন।

চারু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা তখনকার দিনে অশ্লীল বলে নিন্দিত হয়েছিল। কিন্তু চারুচন্দ্রই বাংলা উপন্যাসে সর্ব্বপ্রথম সমাজ-বিরুদ্ধ প্রেমকে সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং শেষ পর্য্যন্ত প্রায়শ্চিত্ত, আত্মহত্যা, উন্মাদনা ইত্যাদির অবতারণা না করেও তাকে রসের ক্ষেত্রে পাংক্তেয় বলে গ্রহণ করেন। তাছাড়া, শিক্ষিত স্বল্পবিত্ত আধুনিক সহুরেদের বর্ণহীন জীবনের ভেতর থেকে রোমান্স সন্ধানেও বোধ হয় তিনি পায়োনিয়ার। 'রূপের ফাঁদ', 'হেরফের', 'হাইফেন' প্রভৃতি বই যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা অবশ্যই তাঁর এ কৃতিত্ব স্বীকার করেন। সৌরীন্দ্র-মোহনের 'কাজরী' এই জাতেরই আর একখানি মনোরম রোমান্স। নব বিবাহিত দম্পতির মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগের সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক খেলা নিয়ে লেখা এই বইটি আজো পড়ে মুগ্ধ হতে হয়। হেমেন্দ্রকুমার রায়ের 'পায়ের ধূলো', 'জলের আল্পনা' প্রভৃতি হালকা হাতের লেখা রোমান্সগুলিও চমৎকার। নির্ভেজাল গল্পে এবং পরিপাটি রচনা-রীতির গুণে এগুলি আজো পুরাণো হয়ে যায়নি। প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর 'চাষার মেয়ে'তে অন্ত্যজের মেয়েকে নায়িকার গৌরব দিয়ে আধুনিক গণ-সাহিত্যের প্রাথমিক পরীক্ষা হয়েছে, যদিও অভিজ্ঞতার প্রসার না থাকায় সে পরীক্ষা সার্থক হয়ে ওঠে নি। 'বাজীকর' বা 'অচলপথের যাত্রী' তাঁর উৎকৃষ্টতর রচনা। সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'বৈরাগ

যোগ' বা উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাজপথ' উন্নততর চিন্তা ও বৈদগ্ধের পরিচায়ক, কিন্তু চারুচন্দ্র বা সৌরীন্দ্রমোহন বা প্রেমাঙ্কুরের রচনায় শিল্প-সৌষ্ঠব অনেক বেশী।

আজকের পাঠক এইসব বইয়ে কয়েকটি জিনিষ লক্ষ্য করে থাকেন। প্রথমতঃ এদের গল্পাংশ লঘু—অধিকাংশ স্থলেই রৌদ্রোজ্জ্বল রোমান্স, জীবনের কোন গভীর সমস্যা বা জটিল দ্বন্দ্ব, কোন প্রগাঢ় অনুভূতি বা প্রশস্ত চিন্তা সেই রোমান্সের পথ আটকে দাঁড়ায় না। দ্বিতীয়তঃ এঁদের ভাষা লিরিক কবিতার স্নিগ্ধতা সম্পন্ন। অব্যাহত পড়ার পথে কোথাও টক্কর খেয়ে নামতে হয় না। তৃতীয়তঃ লেখকদের কোন প্রতিপাদ্য বিষয় নেই—কাজেই আপন আনন্দে গল্প তার পরিণতি খুঁজে নিতে পারে। বলা বাহুল্য, এগুলো গুণই এবং এই গুণেই এঁরা জনপ্রিয় হয়েছিলেন। (অবশ্য বিদেশী হাল্কাজাতের After-dinner Romance থেকে এঁরা প্রচুর মাল-মশলা আহরণ করেছিলেন এবং অনেকেই তা স্বীকারও করেন নি।) কিন্তু জীবনের গভীরতর স্তরের সঙ্গে যোগ ছিল না বলেই বাইরের এই সাজানো সাহিত্য ধোপে টেঁকেনি। এঁরা রবীন্দ্রনাথের বাচন-ভঙ্গী এবং শরৎচন্দ্রের বিন্যাস-রীতির অনুকরণ করে-ছিলেন। কিন্তু প্রথমের প্রজ্ঞাশীলতা এবং দ্বিতীয়ের আন্তরিকতা এঁদের ছিল না, তাই এঁরা সাহিত্যের আবহাওয়ায় পরিবর্ত্তনের ঢেউ আনলেও, নিজেরা বড় কিছু গড়ে তুলতে পারেন নি। বঙ্কিম-যুগ আর রবীন্দ্র-যুগের মাঝখানে যাঁরা উপন্যাস লিখেছিলেন, তাঁরা যেমন রঙ্গ-ব্যঙ্গ ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ নিয়ে এক শ্রেণীর হাল্কা সমাজ-চিত্র রচনা করেছিলেন, রবীন্দ্র-শরৎ-যুগ এবং আধুনিক যুগের মাঝখানে এঁরাও তেমনি এক শ্রেণীর মিষ্টি রোমান্স লিখে উপন্যাস সাহিত্যের ধারাটি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন। সেই সব সমাজ-চিত্র বা এই সব রোমান্স উঁচু জাতের সাহিত্য অবশ্য নয়—

কিন্তু ঐতিহাসিক অনুক্রম হিসাবে এ শ্রেণীর সাহিত্য জন্মানোও যেমন স্বাভাবিক, এদের উপযোগিতাও তেমনি খুব বেশী। মণীন্দ্রলাল বসুর 'রমলা' এই শ্রেণীর রচনার মধ্যে বেশ একটু বিশিষ্টতারই দাবী করতে পারে।

এর পর আধুনিক যুগ। এই যুগের সাহিত্য সুরু হল একটি প্রবল উত্তেজনা নিয়ে। তথাকথিত সমাজ, ধর্ম্ম, নীতি ও সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেই জন্মালো এযুগের উপন্যাস। শ্লীলতা-অশ্লীলতার উচিত-অনুচিতের পুরানো নিরিখ (values) পাল্টিয়ে ফেলে, নূতন করে পরীক্ষা সুরু হল। সামাজিক কৌলীন্য, ব্যক্তিক আভিজাত্য, নৈতিক শুচিতা, ব্যবহারিক সৌন্দর্য্য, সব কিছুকেই ভেঙে-চুরে বিশ্লেষণ ব্যবচ্ছেদ করে দেখা চলতে লাগলো। ফ্রয়েডীয় বিজ্ঞান ও মার্ক্সীয় দর্শন আধুনিক কালে সমাজ ও রাষ্ট্রে যে বিপর্য্যয় এনেছে, পাশ্চাত্যের সাহিত্য দিয়ে তার ঢেউ বাংলায় এসে লাগলো। তার ফলে বাংলার সাহিত্য সর্ব্বপ্রথম শ্রেণী ছেড়ে গণ-জীবনের, আদর্শ ছেড়ে প্রত্যক্ষের দিকে মোড় ফিরলো। এক কথায় সাহিত্যে বিপ্লব এলো। এই বিপ্লবের প্রথম সূত্রপাত হল নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের লেখায়। তাঁরই সঙ্গে সঙ্গে ছিলেন স্মরণীয় সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, যিনি 'কমলের দুঃখ' লিখে বাস্তবপন্থী উপন্যাসের বনিয়াদ পাকা করেছিলেন। নরেশচন্দ্রের লেখা অশিল্পীক, অসুন্দর, অনেক ক্ষেত্রে বিবৃতিসর্ব্বস্ব। কিন্তু অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের অবতারণায় বা অসমাজ-সম্মত প্রসঙ্গের আলোচনায় তাঁর দুঃসাহস ও পর্য্যবেক্ষণের পরিচয় পাই, তা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই দুর্লভ। 'রক্তের ঋণ', 'পাপের ছাপ', 'রাজগী', 'শাস্তি', ইত্যাদি যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই জানেন এ দুঃসাহস কত প্রবল, এ পর্য্যবেক্ষণ কত নিখুঁত। নরেশচন্দ্র সেন গুপ্তের এই বিদ্রোহিতাই বাংলা সাহিত্যে

আধুনিকতার পথ মুক্ত করে দিলে, যে পথ দিয়ে হুহু করে বাঞ্ছিত অবাঞ্ছিত বহু জিনিষ এসে দেশের সাহিত্য-ধারাকে ঘুলিয়ে তুললো।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে আমরা পেয়েছিলাম, মানুষের সংস্কৃতিশুদ্ধ মনের ওপর তার পারিপার্শ্বিকের প্রভাব যে সমস্ত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তারি কাব্যিক ব্যাখ্যান। বাংলা সাহিত্যে Intellectualism-এর সুরু সেখানে। শরৎচন্দ্র বাস্তব জীবনকে এঁকেছিলেন এবং তাঁর স্খলন-পতন, দোষ-ত্রুটি, সুন্দরতা-অসুন্দরতাকে সমান মমতায় স্বীকার করেই এঁকেছিলেন। সেখান থেকেই সুরু পাপ-তাপ, গ্লানি-গলদকে শ্রদ্ধার চোখ নিয়ে দেখার।

[৮]

নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের হাত দিয়ে আমরা যে আধুনিক উপন্যাসে এসে পৌঁছুলাম, তার পূর্ব্বাভাষ পেয়েছিলাম শরৎচন্দ্রেই। শরৎচন্দ্রই প্রথম পাপ-তাপ ও স্খলনে-পতনের ভেতর দিয়েও মানুষের আত্মিক মহিমাকে উজ্জ্বল করে ফুটিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম বুঝিয়েছিলেন দেশকে যে সমাজ-পর্য্যায়ে যারা নীচু, যারা উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত, মানুষ হিসাবে তারা তথাকথিত সম্ভ্রান্তদের চেয়ে কোন অংশেই খাটো নয়। আর যারা অবস্থা-বিপর্য্যয়ে, নয়ত কোন বিশেষ দুর্ব্বলতার আকর্ষণে, অন্যায় বা পাপের পথে কোনদিন পা বাড়িয়াছে, তারা শত সহস্র সম্ভাবনীয়তা নিয়েও শুদ্ধ মাত্র ঐ অপরাধের জন্যেই মনুষ্যত্বের অধিকার থেকে বঞ্চিতও হতে পারে না।

শরৎচন্দ্রের আগে এত স্পষ্ট করে এই কথা আর কেউ বলেন নি। এদেশের সাহিত্যে ব্রাহ্মণ বলে, জমিদার বলে, বড় চাকুরে বলেই মানুষ চিরদিন সম্মানিত হয়েছে। এই সমস্ত বাইরের জৌলুষ থেকে মুক্ত,

নিছক নির্ব্বিশেষ মানুষ বলে তার কোন স্বীকৃতি সাহিত্যে ছিল না। বঙ্কিমে, মাইকেলে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও মানুষের এই মানবিক অধিকার তাই পদে পদে খর্ব্বিত হয়েছে। একমাত্র দীনবন্ধুতে, আর তাঁর পরে শরৎচন্দ্রে সত্যিকার মানুষ এসেছে, সেই সঙ্গে এসেছে তার দোষ-ত্রুটি-দুর্ব্বলতা, পাপ-তাপ, স্খলন-পতন—এবং অকপট প্রীতি ও অসাধারণ সহানুভূতিতেই তাকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাই যে সমস্ত জিনিষ একদা ঘৃণ্য বলে, দূষণীয় বলে, আর্টের ক্ষেত্রে অপাংক্তেয় বলে নিন্দিত ছিল, তাকে তিনি বর্জ্জন করেন নি, তার ভেতর দিয়েই ফুটিয়ে তুলেছেন মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বকে। লাঠিয়াল আকবর আলি, পতিতা চন্দ্রমুখী, চাষা গোফুর জোলা, জাতিভ্রষ্টা অন্নদাদিদি, শরৎসাহিত্যের আসরে ঠিক সেই সম্মানের দাবী নিয়েই দেখা গিয়েছে, যেমন দিয়েছে রমেশ, জ্যাঠাই মা, গিরীশ বা মহিম।

অবশ্য শরৎচন্দ্র প্রকৃতপক্ষে ছিলেন মধ্যবিত্ত পরিবারের লেখক এবং তাঁর সত্যিকার নিষ্ঠাও ছিল এই সম্প্রদায়ের ওপর। এই সম্প্রদায়টা বাংলা দেশে একটু বিচিত্র ধরণের। এর এক প্রান্ত সংলগ্ন আভিজাত্যের সঙ্গে, অপর প্রান্ত নগ্ন দীনতার সঙ্গে। দুই চরম প্রান্তের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে, এই সুবৃহৎ সম্প্রদায়টি বাংলার সমুদয় আচার-অনুষ্ঠান, রীতি-সংস্কৃতির ধারাকে টিঁকিয়ে রেখেছে। সুযোগ পেলে এরা শ্রেণীতে গিয়ে ওঠে, আর নইলে গণ-সমাজে নেমে আসে। এই নেমে-আসাটা এই সম্প্রদায়ের পক্ষে এখনো মস্ত বড় দুঃখ এবং সে দুঃখ দিনে দিনে বেড়েই চলেছে। শরৎচন্দ্র সেই ভাঙনকে লক্ষ্য করেছিলেন এবং তা থেকে বাংলার জীবন ও সংস্কৃতি যে সমস্ত ওলট-পালটের সম্মুখীন হচ্ছে, তার স্বরূপও তিনি উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিলেন। তাঁর মমতাটা থেকে গেছে বরাবরই ওপরের দিকে

এবং নীচের দিকে নেমে-আসাটাকে তিনি ব্যথা বলেই জেনেছিলেন। তাই তিনি মতবাদের দিক থেকে রক্ষণশীল না হয়ে পারেন নি। কিন্তু সৌখীন মমতা দিয়ে তিনি নীচের স্তরটারও অপমান করেন নি, বরং শ্রদ্ধা দিয়ে, দরদ দিয়ে, একে বরণীয় করে তুলেছিলেন।

এখান থেকেই আধুনিকতার জন্ম। নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত এর পর আর এক ধাপ এগিয়ে এলেন। স্খলন, পতন ও অধঃপাতকে তিনি বৈজ্ঞানিক নিস্পৃহতার সঙ্গে উদ্ঘাটিত করলেন, তার ফলে আচার ও সংস্কৃতির পালিস-ঢাকা শুচিতার অন্তর্নিহিত কুশ্রী রূপটা নিবারণ হয়ে দেখা দিলে। তিনি দেখালেন, প্রবৃত্তি ও পারিপার্শ্বিকের ঘাত-প্রতিঘাত ভেতরে ভেতরে মানুষের সমস্ত সুকুমার গুণকে গ্রাস করে আনছে, অথচ বাইরে তার কৌলীন্য ও ভব্যতাকে বাঁচাবার জন্যে চলেছে জীবন-মরণ সংগ্রাম। বৈজ্ঞানিক নিরীক্ষাবাদী নরেশচন্দ্র বললেন, মানুষের সত্যকার প্রবণতাই হল অন্যায়ের দিকে—সুতরাং অন্যায়টা উপেক্ষারও নয়, অশ্রদ্ধারও নয়। তাকে গ্রহণ করেই মানুষের ইতিহাস, দরদ দিয়ে তাকে মহনীয় করে তুলতে যাওয়াও বিড়ম্বনা। বলা বাহুল্য, শরৎচন্দ্রে আদর্শের ছায়া ছিল, নরেশচন্দ্রে এলো বাস্তবতার ছায়া। কিন্তু আতিশয্যবাদ তাঁর এই বস্তুমুখিতাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, অনেকটা ডষ্টয়েভেস্কীর মতোই। মানুষ মাত্রেই জন্মগতভাবে ক্রিমিন্যাল নয়, আবার অবস্থা-বিপর্য্যয়ে উদ্ভ্রান্ত ও বিপথচালিত 'স্বভাব-সুজন'ও নয়। তা সত্ত্বেও নরেশচন্দ্রের এই নির্লিপ্ত কঠোরতা, এই দুঃসাহস, সর্ব্বোপরি জীবন-পর্য্যায়ের নিম্নতর সোপানগুলির সম্বন্ধে এই সজাগ দৃষ্টি, পরবর্ত্তী সাহিত্যের পথকে যথেষ্ট প্রশস্ত করে দিয়েছে।

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, প্রবোধকুমার সান্যাল, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, আর যাঁরা এযুগের উপন্যাস সাহিত্যে খ্যাতিমান

হয়েছেন, তাঁরা এই নূতন জীবন-বেদ থেকেই যে অনেকখানি উদ্দীপনা লাভ করেছেন, একথা নিঃসন্দেহ। শৈলজানন্দে অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের যে বিচিত্র রূপায়ন দেখা যায়, সমাজ-জীবনে সব চেয়ে যারা ঘৃণ্য, তাদের সম্বন্ধে যে নিখুঁত অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়, বা প্রেমেন্দ্র মিত্রে সহুরে গৃহস্থ ও তাদের আশে-পাশে বিক্ষিপ্ত অসম্ভ্রান্তদের জীবনের ওপর নূতন আলোক-পাতের যে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তা তাঁদের স্বকীয় প্রতিভার পরিচায়ক ঠিকই, কিন্তু সেই প্রতিভাকে স্ফূর্ত্ত করেছেন প্রথমতঃ শরৎচন্দ্র, তারপর নরেশচন্দ্র। এঁরা দু'জনেই বড় স্রষ্টা, তাই এই প্রাথমিক প্রবর্ত্তনাকে অতিক্রম করে, স্ব স্ব ধারায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে পেরেছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রথমের 'নারীমেধ' এবং দ্বিতীয়ের 'উপনায়ন' বই দুটির উল্লেখ করবো। প্রবোধকুমারের 'কলরব' এবং অচিন্ত্য কুমারের 'বেদে'তেও দেখতে পাই এই নূতন সাহিত্যাদর্শ। কিন্তু বলে রাখা দরকার যে এঁরা সকলেই গল্প লিখিয়ে এবং আসলে এঁরা লিখেছেন গল্পই। উপন্যাসের বিস্তৃতি, পূর্ণতা এবং সর্ব্বাঙ্গীনতাকে এঁরা যথাসম্ভব সংহত করেই এনেছেন এঁদের রচনায়।

বিষয়-বস্তু এবং বিন্যাস-রীতিতে এই যে নূতনত্ব, এর ভেতর মেকি জিনিষ কিছু আসে নি তা নয়। প্রত্যক্ষতার নামে নগ্নতা এবং বিশ্লেষণমুখিতার নামে ব্যবচ্ছেদের দ্বারা উপন্যাসের গাল্পিক দিকটাকে অনেকেই ক্ষুণ্ণ করেছেন এবং সাহিত্য-সৃষ্টি অপেক্ষা নূতনত্ব আমদানির মোহও কারুর কারুর রচনায় বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তবু বলতে হবে, আধুনিককালের বুদ্ধি বিশুদ্ধি, বৈজ্ঞানিকতা এবং বামপন্থী চিন্তা-ধারা বাংলা উপন্যাসে প্রবর্ত্তন করে, এঁরাই প্রথম সাহিত্যে নূতনতর দৃষ্টির সন্ধান দিয়েছেন। সত্যিকার গণসাহিত্য আজো অবশ্য হয়নি, তার কারণ গণসাধারণের ভেতর থেকে সাহিত্যিক বের হননি কেউ,

তবে তার সম্ভাবনাকে এঁরাই এগিয়ে দিয়েছেন। অবশ্য শরৎচন্দ্রের ধারা ধরে বৃথা অনুকরণ চলেছে অনেকদিন—আজো চলছে। এই দলের লিখিয়েরা শরৎচন্দ্রের সুগভীর জীবন-বেদকে আয়ত্ত করতে পারেন নি, তাঁর বিচিত্র ষ্টাইলও তাঁদের অনুকরণের বাইরে। তাঁরা শরৎচন্দ্রের দুর্ব্বলতাগুলোকেই নিয়েছেন বিশেষ করে। অসতীর ভেতর সতীত্ব, শত্রুতাপরায়ণ জ্ঞাতির ভেতর অসাধারণ মমতা, অন্ত্যজ দাসীর ভেতর সংস্কারমুক্ত মনীষার দীপ্তি ইত্যাদিকেই এঁরা মূলধন করেছেন। এই সব লেখা নিয়ে আমরা কোন আলোচনা করবো না।

ইউরোপীয় জীবনের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্রব থেকে যে এক বিশেষ শ্রেণীর বাঙালী গড়ে উঠেছে, তাদের অপ্রাকৃত চরিত্র এবং কার্য্য-কলাপ নিয়েও ইদানীং উপন্যাস লেখা হচ্ছে। অন্নদাশঙ্কর রায়ের বহু খণ্ডে বিভক্ত 'সত্যাসত্য' বা দীলিপকুমার রায়ের 'দোলা', 'তরঙ্গ রোধিবে কে' ইত্যাদি বই এই শ্রেণীভুক্ত। এই সব বইয়ে লিপি-চাতুর্য্য, চিন্তা-শীলতা, অধ্যয়ন এবং অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে প্রচুর। কিন্তু এরা খাঁটি জাতের উপন্যাস নয়, কারণ এদের আখ্যান-ভাগ দুর্ব্বল, আবার এরা বিশুদ্ধ চিন্তারও খোরাক নয়, কারণ এদের মননশীলতাও নির্ভেজাল নয়। ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'অন্তঃশীলা'ও এই দলেই পড়ে। যে মননশীলতা অলডাস হাক্সলিতে বা টমাস মানে পাই, তার একটা academic মূল্য স্বীকার করা কঠিন নয়, কিন্তু এই বইগুলোর সেই সাংস্কৃতিক মেরুদণ্ড অত্যন্ত অপটু। তাই এরা সৌখীন snobberyর ওপরে ওঠে কদাচিৎ।

আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে আর যে দু'জনের কথা বলে এই আলোচনা শেষ করা দরকার, তাঁরা হলেন 'পথের পাঁচালী' লেখক

বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ‘পদ্মানদীর মাঝি’ লেখক মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়। ‘পথের পাঁচালী’ বইয়ে গল্পের নিস্তরঙ্গতা এবং বর্ণনার প্রাচুর্য্য থাকলেও, একটি ভাব-প্রবণ কিশোর চিত্তকে তার স্বাভাবিক আবেষ্টনীর ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে যে ভাবে ফোটানো হয়েছে, তা অপূর্ব্ব। ‘পদ্মানদীর মাঝি’তে তথাকথিত বামপন্থী আন্দোলন নেই, কিন্তু সত্যিষ্কার বাম-দৃষ্টি দিয়ে জীবনকে দেখা এবং সেই দেখাকে শিল্পে রূপান্তরিত করার বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্য আছে, যা সমসাময়িক অন্য কোন লেখকের লেখায় দেখি না। এই বইয়ে তাঁর যে শক্তি প্রকাশ পেয়েছে, তা পূর্ণতা লাভ করলে, কালে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক হবেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

গল্প

[বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্কিম-সমসাময়িক লেখকরা বাংলা উপন্যাসকে পূর্ণতা দিয়েছিলেন, কিন্তু ছোট গল্প রচনার দিকে রবীন্দ্রনাথের আগে কারুর দৃষ্টি পড়েনি। 'হুতোম-প্যাঁচার নক্সা'য়, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোক রহস্যে'র কতকগুলি রচনায় এবং কমলাকান্তের জবানবন্দীতে গল্পের ধাঁচা পাওয়া যায়, কিন্তু গল্পের সম্পূর্ণতা নেই। বঙ্কিমের 'যুগলাঙ্গুরীয়', দীনবন্ধু মিত্রের 'পোড়া মহেশ্বর', 'যমালয়ে জীবন্ত মানুষ', সঞ্জীবচন্দ্রের 'রামেশ্বরের অদৃষ্ট' ছোট আখ্যায়িকা—গল্প বলতে আজ আমরা যে শ্রেণীর রচনাকে বুঝি, এরা তা থেকে স্বতন্ত্র জাতের। বঙ্কিম-যুগে এই সমস্ত নক্সা, রঙ্গচিত্র এবং ক্ষুদ্র আখ্যায়িকাই সাদরে গৃহীত হয়েছে। তারপর রবীন্দ্রনাথ গল্প প্রবর্ত্তন করলেন—প্রথমে 'হিতবাদী'তে, পরে 'ভারতী'তে তিনি গল্প প্রকাশ করতে লাগলেন এবং তাঁর সমসাময়িকেরা তাঁর দৃষ্টান্তেই এই নূতন পথে লেখনী চালনায় অবহিত হলেন। সুরেশ সমাজপতি, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে প্রভাতকুমার গল্প লেখকরূপে বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হন। রবীন্দ্রনাথের গল্পে মানব-জীবনের গভীর ভাবানুভূতিগুলি রূপ পেয়েছে, প্রভাতকুমার রূপ দিয়েছেন তার কৌতুকের দিকগুলিকে। অবশিষ্ট সকলেই লিখেছেন প্রাত্যহিক গার্হস্থ্য জীবনের সুখ-দুঃখের কাহিনী। প্রভাতকুমারের 'ফুলের মূল্য' প্রভৃতি গভীর গল্পও আছে, কিন্তু 'বলবান জামাতা' প্রভৃতি রঙ্গ-রচনার জন্যেই তিনি প্রসিদ্ধ। জলধর সেনের 'এক-পিয়ালা চা', দীনেন্দ্রকুমারের 'সেকেলে ডেপুটি', সুধীন্দ্র ঠাকুরের 'কাসিমের মুরগী', সমাজপতির 'ভাগ্যহীনা' প্রভৃতি গল্প বিগত দিনের গল্প হিসাবে সত্যিই উপভোগ্য। এই সময় থেকে দেশে বৈদেশিক গল্প সাহিত্যের অনুশীলন আরম্ভ হল এবং প্রমথ চৌধুরী ও জ্যোতিরিন্দ্র-নাথ ঠাকুর ফরাসী সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করে, দেশবাসীর দৃষ্টি ও রুচিকে গড়ে তোলার কাজে সহায়তা করলেন। প্রমথ চৌধুরীর অনুবাদিত ফরাসী

গল্প 'ফুলদানি', এবং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ব্যালজাক, মোপাসাঁ, গতিয়ে, দোদে'র গল্পানুবাদ অনেকেই পড়ে থাকবেন। রবীন্দ্রনাথের এবং এই সব বিশ্ববিখ্যাত লেখকের আদর্শ বাঙালী লেখকদের সামনে গল্প রচনার বহু নূতন পথ খুলে দিলে। এই পথ দিয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে হু হু করে বাংলা গল্প এগিয়ে চললো। এই নূতন দলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম হল শরৎচন্দ্রের। সমাজ-জীবনের নানা দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অত্যাচারকে তিনি গল্পের ভেতর দিয়ে ফুটিয়ে তুললেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প 'মহেশ', 'সতী', 'হরিলক্ষ্মী', 'আঁধারে আলো'। এর মধ্যে 'মহেশ' গল্পে অত্যাধুনিক বামপন্থী আন্দোলনের পূর্ব্বাভাষ ধ্বনিত হয়েছে, অপরগুলির অবলম্বন নিম্ন মধ্যবিত্ত জীবন। শরৎ সমসাময়িক লেখকদের মধ্যে কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির গল্প কিছুদিন আগেও সমাদরে পঠিত হত। এঁরা রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের প্রদর্শিত পথেই চলেছেন এবং নিজেরা বিশিষ্ট জাতের গল্প রচনা না করতে পারলেও, পরবর্ত্তী লেখকদের গল্প লেখার পথ প্রচুর পরিমাণে প্রশস্ত করে দিয়েছেন। আধুনিক কালের লেখকরা সমরোত্তর পৃথিবীর রাষ্ট্র, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞানের প্রভাবকে স্বীকার করে নিলেন —জীবনের মান ও আদর্শের মূল্য যাচাই করেই এখন থেকে গল্প রচিত হতে লাগলো। এই নূতন দলের ভাষা, দৃষ্টি, চিন্তা, মননশীলতা, গল্প-বিন্যাসের পদ্ধতি সবই বিশিষ্টতার পরিচায়ক। এঁদের সকলে না হন, অন্ততঃ কয়েকজন যে আধুনিক ইউরোপ, আমেরিকার লেখকদের সমপর্য্যায়ভুক্ত গল্পকার, সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এঁদের ভেতর শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের নাম বিশেষ করে উল্লেখের যোগ্য। হাসির গল্পে পরশুরামের নাম উল্লেখ না করলে, এই তালিকা সম্পূর্ণ হবে না।]

[১]

বই আকারে উপন্যাসই সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয়। যেমন-তেমন করে একটা ঘটনার ভেতর দিয়ে কতকগুলি পাত্র-পাত্রীকে শ'-দেড়েক পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে, কোন অমীমাংসিত পরিণতির পথে ছেড়ে

দিলেই, একটা উপন্যাস খাড়া করা যায়। তা লেখাও সহজ, পড়াও সহজ। কাজেই অবসর-বিনোদনের জন্যে সাধারণ শ্রেণীর পাঠক যখন সাহিত্যের দ্বারস্থ হন, তখন তাঁরা উপন্যাসই পড়েন। কিন্তু সাময়িক পত্রে উপন্যাস বের হয় খণ্ডিত আকারে, তার আরম্ভের হদিশ অনেক সময় পাওয়া যায় না, শেষও থাকে অনিশ্চিত। সুতরাং সহিষ্ণু এবং অধ্যবসায়ী না হলে, দিনের পর দিন তাকে অনুসরণ করে যাওয়া কঠিন। এই জন্যে সাময়িক পত্রের উপন্যাস সাধারণ পাঠক বড়-একটা পড়েন না। সাময়িক পত্রে সব চেয়ে বেশী আদর ছোট গল্পের। তা আকারে ছোট, কাজেই অল্প সময়ের মধ্যেই পড়ে শেষ করা যায় এবং প্রকারে স্বয়ং-সম্পূর্ণ, কাজেই একদমে পড়ে নেবার পর, কোন দিক থেকে অপ্রাপ্তির কোন ক্ষোভও থাকে না। এই জন্যে যাঁরা সাময়িক পত্রিকার পাঠক, তাঁরা সাধারণতঃ ছোট গল্পেরই পাঠক।

কালধর্ম্মে মানুষের মনোযোগের ধারা গেছে বিক্ষিপ্ত হয়ে, সময়ও এসেছে যথেষ্ট কমে। একটি দিনের নির্দ্দিষ্ট সময়কালের মধ্যে তাকে করতে হয় অনেক-কিছু। তাই পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা পাড়ি দিয়ে, একটা দীর্ঘ রচনার আগুন্ত অনুসরণ করতে তার সত্যিই আটকায়। এই জন্যে সাময়িক পত্রিকার সংক্ষিপ্ত আসরেই আজকাল পাঠকের জনতা জমে সব চেয়ে বেশী। সাময়িক পত্রের পরিচালনায় কিন্তু সার্ব্বজনীন রুচির মুখ চাইতে হয়। তাই তাতে উপন্যাস, ভ্রমণ-কাহিনী, জীবনী, বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস ইত্যাদি বিষয়ক প্রবন্ধ, সমালোচনা, টুকিটাকি নানা জিনিষই দিতে হয়। এরই সঙ্গে কবিতা-গল্পও দিতে হয়। কিন্তু এক গল্প ছাড়া আর সব জিনিষেরই পাঠকসংখ্যা সীমাবদ্ধ। তার কারণও স্পষ্ট। ধারাবাহিক উপন্যাস পড়ার অসুবিধা কি তা আগেই দেখিয়েছি। অপরাপর বিষয়গুলি সর্ব্বজনবোধ্য, সহজ ও সরস নয়, কাজেই উন্নত

রুচির পাঠক ছাড়া, আর সকলের কাছেই তারা নিরর্থক। আর কবিতা ত একেবারেই অচল। এই অপরিহার্য্য কারণেই বাংলা দেশে ইদানীং কেবলমাত্র গল্প-রচনার জন্যেই পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। অন্য জাতীয় রচনা শুধু পত্রিকার শোভাবৃদ্ধি করে, গল্পই করে তার শক্তি ও সম্পদবৃদ্ধি।

শুধু বাংলাতেই নয়, সব দেশেই মোটের ওপর একই কারণে গল্পের আদর দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু অন্য দেশে পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করে গল্পকে পুস্তকে রূপান্তরিত করা চলে, এদেশে আবার তা চলা কঠিন। কারণ বই আকারে গল্পের চাহিদা নেই, আছে উপন্যাসের। সাময়িকপত্রিকায় যা না হলেই নয়, বই আকারে তা প্রবন্ধের বা কবিতারই মতো বাজার-বিমুখ, এ বড় বিচিত্র জিনিষ! কিন্তু লেখক মাত্রেই জানেন, এ কতখানি সত্যি। এ থেকে মোটের ওপর একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে—গল্প লোকে পড়ে ক্ষণকালিক আনন্দের জন্যে, যেমন দেখে সিনেমা।

আগে লোকে সারারাত্রিব্যাপী থিয়েটার বা যাত্রা দেখতো, এখন নানা কাজের ফাঁকে টুক করে সিনেমা দেখে আসে। এতে সময়ও লাগে কম, ব্যয়ও হয় কম, অথচ আনন্দ সমানই পাওয়া যায়। সাহিত্যেও আগে বনিয়াদী বিস্তৃতিই কৌলীন্য বলে বিবেচিত হত। কিন্তু যুগ-ধর্ম্মে লেখকও হয়েছেন সংক্ষেপের পক্ষপাতী, পাঠকও তাই হয়েছেন। অতিকায় জীবেরা পৃথিবী থেকে লুপ্ত হয়েছে বহু পূর্ব্বেই, অতিকায় সাহিত্যও ক্ষীণ হয়ে আসছে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু যেহেতু ছোট গল্পই এ যুগের সাহিত্যে সব চেয়ে বেশী জনপ্রিয়, সেই জন্যে এর ওপর লেখকের অভিনিবেশও পড়েছে সব চেয়ে বেশী। উপন্যাসের বিস্তৃতি এতে নিষিদ্ধ, প্রবন্ধের স্পষ্টতা বা কাব্যের গূঢ়তাও

এতে অচল, অথচ সব কিছুই আছে এর মধ্যে এবং সবই আছে বীজাকারে। সুতরাং সাহিত্য-শিল্প হিসাবে ছোট গল্প হয়ে উঠেছে যেমন সংহত, তেমনি জটিল। তাই সত্যিকার ছোট গল্প লেখাও কঠিন, বোঝাও কঠিন।

ছোট গল্প ছোটও হবে, গল্পও হবে, এই ধরণের একটা কথা রবীন্দ্রনাথের নামে প্রচলিত আছে। গল্প উপন্যাস হবে না, সুতরাং ছোট হবেই—প্রবন্ধ হবে না, সুতরাং গল্প হবেই। কিন্তু কিসে ছোট গল্প হবে, তার নির্দ্দেশ এই কথার ভেতর নেই। ছোট গল্পে কি থাকবে? ঘটনা, না চরিত্র, অথবা এই দুয়ের সমবায়ে গঠিত তৃতীয় একটি ভাব-ব্যঞ্জনা? ঢের প্রথম শ্রেণীর গল্প দেখা গেছে, যাতে ঘটনা নেই বা চরিত্রও নেই, অথচ সেগুলি দিব্যি গল্প হয়ে উঠেছে। পক্ষান্তরে ধারাবাহিক ঘটনা এবং আনুপূর্ব্বিক চরিত্র নিয়েও অনেক গল্প একেবারেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে নি। তাহলে ছোট গল্পের প্রাণ-বস্তু কি? ব্যঞ্জনা নিশ্চয়ই। কিন্তু কবিতার ব্যঞ্জনা এবং গল্পের ব্যঞ্জনা এক জাতের নয়। লিরিক কবিতা কবির একটি বিশেষ moodকে আশ্রয় করে জন্মায়, সেই mood ও তার আনুষঙ্গিকগুলো কবির আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি থেকে জন্মায়। কিন্তু গল্প বস্তুকেন্দ্রিক রচনা, তাতে কবির ব্যক্তিত্ব প্রচুর হলেও প্রচ্ছন্ন।

ছোট গল্প বিদ্যুৎচমকের মতো। তার চকিত-আলোকে কতকগুলো চরিত্র ও তাদের আশেপাশের কতকগুলো ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া কতকটা অনাবৃত হয়েই আবার অদৃশ্য হয়ে যায়। তার গোড়াটা আমাদের অনুমান করে নিতে হয়, শেষটাও থাকে কল্পনাসাপেক্ষ। মাঝখানের যে খণ্ডিত অংশটুকু আমরা পাই, তাতে পূর্ণাঙ্গ ঘটনা সমাবেশের বা পরিপূর্ণ চরিত্র-সৃষ্টির অবসর নেই। মাঝখানকার এই স্তরটুকুকে কবিত্বের

ভেজাল দিয়ে ভারী করে তোলা হলে, সাধারণের মনস্তুষ্টি হতে পারে হয়ত, কিন্তু গল্পের তাতেই হয় অপমৃত্যু। গল্প-লেখক গল্পের আসরে থাকেন তন্ত্রধারকের মতো, তিনি চরিত্রগুলিকে নিজেদের প্রাণ-শক্তিতে ভর করে, ঘটনার আলোকে ফুটে উঠতে সাহায্য করেন, কিন্তু তাঁর নিজের জবানীতে গল্পকে এগিয়ে দেবার অবকাশ তাতে নেই।

সুতরাং দেখা গেল, ছোটগল্প অত্যন্ত সূক্ষ্ম জাতের শিল্প। জনসাধারণ অসংযত উল্লাসে এ নিয়ে মাতলেও, এর মর্ম্মে পৌঁছানো বেশ কঠিন। আর সত্যিকার গল্প লেখাও যে সহজ নয়, তা ত আগেই বলেছি।

[২]

বাংলা গল্প-সাহিত্যের ইতিহাস বেশীদিনের পুরাতন নয়। বঙ্কিমের হাতে বাংলা উপন্যাসের জাত-কর্ম্ম নিষ্পন্ন হলেও, প্রকৃত ছোটগল্প বলতে আমরা যে-শ্রেণীর রচনাকে বুঝি, তা বঙ্কিম লেখেন নি। বঙ্কিমের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী কালীপ্রসন্ন সিংহ লিখিত 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' গ্রন্থে এক জাতীয় ব্যঙ্গাত্মক চিত্র আছে—তার কোন কোনটায় কিছু পরিমাণ গল্পের লক্ষণ দেখা গেলেও, সত্যিকার গল্প তারা নয়। সত্যিকার বাংলা গল্প লেখা সুরু হয় রবীন্দ্রনাথ থেকে। তিনিই এর সূত্রপাত করেন এবং তাঁর হাতেই এর বারো-আনা রকম পূর্ণতাও সাধিত হয়ে যায়। এ দেশের ঐতিহ্যে একদা ছিল রূপকথা এবং পশুপক্ষী নিয়ে উপকথা। রূপকথাগুলো অন্তঃপুরের মহিলাদের মুখে-মুখে ফিরতো, আর উপকথাগুলো ছিল সাহিত্যের পৃষ্ঠায়—জাতক, কথাসরিৎসাগর, হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদিতে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এ দেশেও এদের যুগ শেষ হয়েছে, তার স্থান অধিকার করেছে মানবীয় আবেদনসম্পন্ন ছোটগল্প। কিন্তু এই ছোটগল্পের প্রাণ-প্রেরণা এ দেশের

মৃত্তিকা থেকে জন্মায় নি, এ এসেছে পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এবং এসেছে আধুনিক কালে।

ইংরাজাধিকারের যুগে আমরা আমাদের ইতিহাসে নূতন করে একটা মাত্র জিনিষ গড়ে তুলেছি, তা হচ্ছে সাহিত্য। আমাদের প্রাচীন বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত যে সাহিত্য, আজকের বাংলা সাহিত্য তা থেকে এত বেশী পরিমাণ বিচ্ছিন্ন যে দুয়ের ভেতর কোনো সুদূর সংস্থিত জ্ঞাতিত্বের আভাস পর্যন্ত কল্পনা করা যায় না। প্রাচীন সাহিত্য ছিল প্রধানতঃ ধর্ম্মমূলক। তার বিষয়-বিন্যাস, চরিত্র-চিত্রণ, রচনা-পদ্ধতি, সবই ছিল তার অনুরূপ। এ দেশের সংস্কৃতি, শিক্ষা ও ঐতিহ্য সেই সমস্ত সাহিত্যশাখাকে সঞ্জীবিত করেছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী বৈচিত্র্যবিহীন উত্থানপতনবিহীন একটানা পথে এই সাহিত্য-ধারা বয়ে এসেছে। ইংরাজী আমলে যেমন আমাদের দীর্ঘদিন-লালিত সমাজ-সংস্থান ও শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে প্রথম প্রবেশ করলো বিজাতীয় ভাবাদর্শ এবং সেই আদর্শ-বিপর্যয়ের ফলে একটা নূতন জীবনাদর্শই গড়ে উঠলো ধীরে ধীরে, তেমনি আমাদের সাহিত্যেও কৃষ্ণসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, বাউল গীতি ও মঙ্গলকাব্যের সুপরিচিত আসরে প্রথমে প্রবেশ করলো পাশ্চাত্য সাহিত্যের নূতন নূতন আদর্শ। আমাদের পুরাতন পুঁজিপাটা এই বিক্ষোভে ভেঙে-চুরে উল্টে-পাল্টে ধুয়ে-মুছে নিঃশেষ হয়ে গেল। উদ্দামতা যখন থামলো, তখন দেখা গেল, নূতন করে একটা সাহিত্যাদর্শের মৃত্তিকান্তর জেগে উঠেছে, যা আমাদেরই, অথচ আমরা যা কোনদিনই প্রত্যাশা করি নি।

জীবনের দিক থেকে নূতনে-পুরাতনে একটা সমন্বয়-সাধন অল্পে অল্পে সম্ভব হয়েছে—যদিও পুরাতনের ধ্বংসাবশেষ সমাজদেহে অনেক রয়ে গেছে আজও—কিন্তু সাহিত্যের দিক থেকে সম্বন্ধ-সূত্র একেবারে

বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। কেমন করে এটা সম্ভব হল ভাবা যায় না। এটা ভালো হয়েছে, কি মন্দ হয়েছে, সে প্রশ্নও তুলে লাভ নেই। যে দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তি এ দেশে বৈদেশিক শাসনের পত্তন করেছিল, তারই প্রভাব থেকে এ অনিবার্য্য রূপে ঘটেছে।

এই আদর্শ-সঙ্ঘাতের ফলে বাংলা সাহিত্যে প্রথম দেব-দেবীর কাহিনীর বদলে দেখা দিলে নর-নারীর কাহিনী এবং দেব-মাহাত্ম্যের স্থানে এলো দেশ-মাহাত্ম্য। নানা সংস্কার, নানা অন্ধ অযৌক্তিক বিশ্বাস, নানা খেলো আদর্শে এ দেশের সাহিত্য হয়ে পড়েছিল দিনে দিনে মেরুদণ্ডহীন। তারই নির্ব্বিরোধ আশ্রয়ে দেশের মনও ধীরে-ধীরে কুণো হয়ে উঠেছিল। এই অসাড় গতানুগতিকতার ওপর প্রবল ধাক্কা দিলে ইংরেজী সাহিত্য। এই বহিরাদর্শ জাতিকে আত্মমর্য্যাদা বোধে সজাগ করে তুললো। বাঙালীর মনে নিজেদের দেশকে, নিজেদের আদর্শকে বড় করে নূতন করে, গড়ে তোলার প্রেরণা এলো।

এদেশে আগে সাহিত্য বলতে বোঝাতো কাব্যকে। ইংরেজ মিশনারীরা প্রচার-কার্য্যের সহায়ক রূপে বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার প্রবর্ত্তন করেন। বাংলা দেশে মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন ও বাংলা সংবাদপত্র প্রকাশের গৌরবও তাঁদেরই প্রাপ্য। এর অল্প পরেই রামমোহন রায়। তিনিও জন-শিক্ষা এবং ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে বাংলা গদ্য রচনায় হস্তক্ষেপ করেছিলেন। কিন্তু মিশনারী বাংলা বা রামমোহন রায়ের বাংলা প্রাথমিক প্রয়াস রূপে যতটা সম্মানই পাক, সে জিনিষ স্থায়ী হতে পারেনি। সে বাংলা গদ্যের ধারণা-শক্তিই কম, তাতে কোন রকমে বক্তব্য প্রকাশ করা যায় মাত্র, সাহিত্য রচনা করা যায় না। বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় দত্ত সংস্কৃত idiomকে বাংলায় রূপান্তরিত করে, একটা ধ্বনিবহুল গদ্যরীতি তৈরী করলেন। তারই পাশাপাশি দেশজ ইডিয়ম

ও ভঙ্গী সম্বলিত একটি সহজ গদ্যরীতিও চলতে লাগলো টেকচাঁদ প্রমুখ লেখকের হাত দিয়ে। এই দুই ধারাকে মিশিয়ে একটা নূতন সতেজ রচনা-রীতি তৈরী করে, বঙ্কিমই প্রথম বাংলা গদ্যের শৈশব দশার ওপর যৌবনের উদ্বোধন করলেন। ভাষার গঠন সম্পূর্ণ হয়ে এবার সাহিত্য রচনা সুরু হল। সেই নবযুগের সাহিত্য-ইতিহাসে বঙ্কিমই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম। তাঁর আগে বাংলা গদ্য ছিল, কিন্তু সাহিত্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের রচনাবলী বা টেকচাঁদের রচনাবলী ভাষার ক্রমবিকাশের দিক থেকে যতটা, সাহিত্য হিসাবে ততটা গণনীয় নয়, অন্ততঃ এমন কিছু নয়, যা নিয়ে বাগাড়ম্বর চলতে পারে।

বঙ্কিম যখন তাঁর প্রসিদ্ধ উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন, তখন রস-সৃষ্টির প্রয়োজন অপেক্ষা আদর্শ-স্থাপনের প্রয়োজনই তিনি বেশী করে অনুভব করেছিলেন। বিজাতীয় শিক্ষা ও আদর্শ একান্ত করে অনুসরণ করার ফলে জাতি তখন হয়ে উঠেছিল দিকভ্রান্ত। তাকে প্রকৃতিস্থ করে আনার জন্যে দরকার ছিল প্রকাণ্ড স্ত্রী-পুরুষের আলেখ্য তাদের সাম্নে মেলে ধরা। শিল্প-সৃষ্টির সূক্ষ্ম কারুকার্য্য ও কলাকৌশল তাই তিনি অবলম্বন করতে পারলেন না—তিনিও না, মধুসূদনও না। তাই একে ছোটগল্প এবং অন্যে লিরিক কবিতায় হস্তক্ষেপ করবার অবসর পাননি। হয়ত কতকটা দায়ী এজন্যে তৎকালীন শিক্ষা এবং রুচিও। প্রথম স্কটকে এবং দ্বিতীয় মিল্টনকে সাহিত্যক্ষেত্রে আদর্শ স্বরূপ নিয়েছিলেন।

সৌভাগ্যবশতঃ বঙ্কিম-মধুসূদনের যুগ সমগ্রভাবে শেষ হবার আগেই রবীন্দ্রনাথ আবির্ভূত হলেন এবং তিনি একাই ভাষা ও সাহিত্যের সমস্ত দিকে এক শতাব্দীর উপযোগী প্রাণ-শক্তি দিয়ে, নূতন করে দেশীয় সংস্কৃতির ইতিহাস স্থাপন করলেন। এই বহুশাখা বিশিষ্ট বিচিত্র রবীন্দ্র-সাহিত্যে ছোটগল্প একটি খণ্ড পর্য্যায় মাত্র—রবীন্দ্র-প্রতিভার এ

একটি গৌণ দিক, কিন্তু এই একটি মাত্র দিকেও তাঁর সমান কৃতিত্ব থাকলে, অন্য যে-কোন লেখকই ধন্য হতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষায় প্রথম গল্পের প্রবর্ত্তক এবং সম্ভবতঃ এখনো স্বকীয় আদর্শের তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গল্প লেখক। তাঁর গল্পে বৈচিত্র্য যত বেশী, বাঁধুনি যত নিখুঁত, ব্যঞ্জনা যত গভীর, বাংলার আর কারুর লেখাতেই এ পর্য্যন্ত তার জুড়ি পাওয়া যায় নি। বাংলার প্রকৃতি ও বাঙালীর নিত্যকার সুখ-দুঃখ-তরঙ্গিত প্রশান্ত জীবনের পটভূমিতে এই গল্পগুলির জন্ম। লিরিক কবিতার মতো এরা স্বচ্ছ, সুন্দর, মর্ম্মান্তস্পর্শী। কবি রবীন্দ্রনাথের সমস্ত গল্পই কাব্যধর্ম্মী। কাজেই এর স্ত্রী-পুরুষগুলিতে বা তাদের কার্য্য-কলাপে প্রত্যক্ষ সংসারের সুকঠিন বাস্তবতার ছাপ অপেক্ষা, ভাবময় কল্প-পৃথিবীর ছাপই অধিক পাওয়া যায়। বাস্তবানুগামী গল্পের জন্যে আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে, শরৎচন্দ্র এবং তাঁর অনুগামীদের আবির্ভাব পর্য্যন্ত।

[৩]

রবীন্দ্রনাথ থেকে শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব পর্য্যন্ত বাংলা গল্পে আর কোন নূতন পরিণতি লক্ষ্য করা যায় নি। শুধু একটা জিনিষ হয়েছিল। এই সময়টায় বহুল পরিমাণে বৈদেশিক গল্পের অনুশীলন হয়েছিল—অনুবাদ ত বটেই, অনুকরণও। মোপাসাঁ, ব্যালজাক, জোলা, গতিয়ে, দোদে প্রমুখ জগৎবিখ্যাত ফরাসী লেখকদের গল্প বাঙালীর চোখের সাম্নে নূতন নূতন ধারা, ধরণ ও আদর্শ মেলে ধরলো, তাতে গল্পের রস-পরিবেষণে দেশীয় লেখকদের যেমন করলো উদ্বুদ্ধ, দেশীয় পাঠকদের তেমনি করলো গল্পের রস-আস্বাদনে অভ্যস্ত। রবীন্দ্রনাথ গল্প-রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন বিদেশ থেকেই, কিন্তু তাঁর পদ্ধতি বরাবরই তাঁর নিজস্ব। ‘মণিহারা,’ ‘দুরাশা,’ ‘কঙ্কাল,’ ‘পোষ্টমাষ্টার,’ ‘ক্ষুধিত পাষাণ,’

'আপদ,' যে-কোন গল্পেই তিনি এক-একটি নূতন রীতির প্রবর্ত্তন করেছেন, যা সম্পূর্ণরূপে মৌলিক। অপূর্ব্ব কাব্যিক অলঙ্করণে, পরিবেশ চিত্রণে, ভাব-ব্যঞ্জনায় এই সব গল্প যে-কোন উচ্চশ্রেণীর গল্পলেখকের রচনার সঙ্গেই সমান-জ্ঞাতিত্বের দাবী করতে পারে। শরৎ-সাহিত্যে ছোট গল্পের সংখ্যা কম। কিন্তু যে-কটা গল্প তিনি লিখেছেন, তা নিখুঁত এবং বিশেষ ভাবে আত্ম-স্বতন্ত্র পথে প্রবাহিত। শরৎচন্দ্রের গল্পে মানুষের ভাবময় সত্তা ও তার আনুষঙ্গিক বেদনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয়নি—তিনি মানুষের প্রত্যক্ষ অস্তিত্বকে তার প্রাত্যহিক আবেষ্টনীর মাঝখান থেকেই দেখেছেন এবং তাকেই রূপায়িত করেছেন আন্তরিক মমতার দৃষ্টিতে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথে গল্পের পটভূমি কিয়ৎপরিমাণে নৈর্ব্যক্তিক, কিন্তু শরৎচন্দ্রে তা অনেকটা ব্যক্তিমুখী।

এই দুয়ের মাঝখানে যাঁর নামটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচনা লঘু, রবীন্দ্রনাথের মতো তা ভাবগর্ভও নয়, শরৎচন্দ্রের মতো জীবনাভিমুখীও নয়। রহস্য ও কৌতুকের মিশ্রণে তাঁর কোন কোন গল্প বিশেষ উপভোগ্য, তবে অধিকাংশ রচনাই যেন একটু একঘেঁয়ে। দু'একটি গল্পে একটা নূতন সুর দেখা যায়। ইংলণ্ড-প্রবাসী ভারতবাসীর সঙ্গে ইংরেজের বৈষয়িক ও মানসিক আদান-প্রদানের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা যে গল্পগুলি 'দেশী ও বিলাতী'তে স্থান পেয়েছে, তার মধ্যে কয়েকটি সত্যিই সুন্দর।

এই তিনজনকে নিয়েই বাংলা গল্প সাহিত্যের ঊনবিংশ শতাব্দী সীমাবদ্ধ। এঁরা সমাজের যে স্তরকে চিত্রিত করেছেন, তা মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত। এদের জীবনে একদা কিছু সুখ ছিল, দুঃখ যা ছিল, তাও অপরিসীম নয়। এর পরের স্তরটি দরিদ্র, যা এঁদের সাহিত্যে প্রাধান্য নিতে পারে নি—শরৎচন্দ্রে কিছুটা অবশ্য সেই স্তরও ভাষা

পেয়েছে, কিন্তু তা আনুষঙ্গিক রূপে। কাজেই এঁদের গল্পের আবেষ্টনী অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিরোধ, অর্থাৎ যাকে আধুনিক কাল বলেন বুর্জোয়া, এঁরা সেই সম্প্রদায়ের লেখক। সে হিসাবে এঁরা সবাই-ই অল্পবিস্তর আদর্শবাদী। শরৎচন্দ্র শেষের দিকে ধীরে ধীরে বাস্তবে নেমে আসছিলেন, তাঁর প্রসিদ্ধ 'মহেশ' গল্প তার পরিচায়ক। এর পর আধুনিক কাল, যা আমাদের অন্ততঃ পাঁচজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকের সঙ্গে পরিচিত করেছে, যাঁদের প্রত্যেকেই রীতিমতো শক্তিমান এবং রবীন্দ্র-শরৎ-পরিমণ্ডলের ব্যর্থ অনুকারক নন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ও বিংশ শতাব্দীর আরম্ভের সন্ধিস্থলে যে মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়, তা একদিকে যেমন পৃথিবীর আর্থিক ও সামাজিক ভিত্তিকে সজোরে নাড়া দিয়েছিল, অন্য দিকে তেমনি নাড়া দিয়েছিল তার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ভিত্তিকে। এতবড় সার্ব্বভৌম বিপ্লব দুনিয়ার ওপর দিয়ে আর এর আগে বয়ে যায় নি। প্রত্যক্ষ জগতে এই বিপর্য্যয়ের ফলে জন্ম নিয়েছে সমাজতন্ত্রবাদ—রাজা ও গুরু-পুরোহিত নিয়ে গঠিত গতানুগতিক সমাজাদর্শে মানুষের শ্রদ্ধা চলে গেছে, মানুষ এই চিরাচরিত জীবন-ধারাকে প্রশ্ন করেছে। মানসিক জগতে এই বিপর্য্যয়ের ফলে জন্ম নিয়েছে মনোবিজ্ঞান, যা শিল্প, সভ্যতা, প্রেম ও মনুষ্যত্বের মূলসূত্র গুলিকে নিয়ে বিশ্লেষণ করে, তার প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত করেছে—চিরাচরিত বিশ্বাস, আদর্শ ও সংস্কার সম্বন্ধে মানুষের মনে তা থেকে দেখা দিয়েছে সন্দেহ। এই সঙ্গে যন্ত্র-বিজ্ঞানের অপরিসীম উন্নতি সাধিত হওয়ায় মানুষ অনায়াসেই যখন বহুবিধ প্রাকৃতিক বাধার:ওপর জয়ী হতে আরম্ভ করেছে, অমনি তার চিন্তা থেকে দুজ্ঞের্য়তা ও কুয়াসাচ্ছন্ন বিশ্বাসপ্রবণতার ভয় দূর হয়ে গিয়েছে এবং তার স্থান নিয়েছে বিচারসহ প্রত্যক্ষতা এবং বিজ্ঞানসম্মত সত্যানুসন্ধান।

এই নূতন আবহাওয়ার মধ্যেই আধুনিককালের সাহিত্য জন্মগ্রহণ করেছে। তাই স্বভাবধর্ম্মেই তা পূর্ব্বতন ঐতিহ্য থেকে স্বতন্ত্র। এই স্বাতন্ত্র্য তার বিগতকালীন আদর্শকে চূর্ণ করেছে, তার স্থানে নূতন যা পত্তন করেছে, তাতে প্রধানতঃ তিনটি জিনিষ পাওয়া যাবে। প্রথম—সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, দ্বিতীয়—দয়া-মায়া, প্রেম, প্রতিভা ইত্যাদির স্বরূপ নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ, তৃতীয়—ব্যথিত, পতিত, অপমানিতের উন্নয়ন নিয়ে আন্দোলন। এরই অয়নকে কেন্দ্র করে এযুগের গল্প-উপন্যাস, নাটক-কবিতা। যুগ-রুচি হিসাবে গল্পটাই এখন চলে বেশী, তাই গল্পেই এই আধুনিকতার সমধিক পরিচয় পাওয়া যায়। যে-সব কথা একদা ভাবাও পাপ বলে গণ্য হয়েছে, এখন নির্ভয়ে সে-সব কথা লেখা চলছে। সন্তান ও পিতা-মাতার সম্পর্ক, ভাই-বোনের সম্পর্ক, ধনিক-শ্রমিকের সম্পর্ক, রাজা-প্রজার সম্পর্ক, সমস্ত জিনিষের ওপরই এযুগের লেখকের শাণিত দৃষ্টি এবং কখনো যৌন-বিজ্ঞান, কখনো সমাজ-বিজ্ঞান, কখনো বা রাষ্ট্র-বিজ্ঞানের দিক থেকে এই চিরাগত সম্বন্ধগুলিকে এখনকার সাহিত্যে যাচিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে ব্যভিচার হচ্ছে না এমন নয়, কিন্তু নূতন চিন্তার সন্ধান মিলছে প্রচুর।

এযুগে গল্প-লেখকদের মধ্যে যেমন একটা অপ্রত্যাশিত উৎকর্ষ দেখা যাচ্ছে, গল্প-পাঠকদের মধ্যেও তদনুরূপ রুচি বিকাশের পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। আমি আগেই বলেছি যে ছোট-গল্পের শিল্প-রস উপলব্ধি করা খুব সহজ নয়, কারণ ছোট গল্পের মতো সংহত বস্তুতে সবই থাকে ইঙ্গিত আকারে। যাকে বলে সমগ্রতা, ছোটগল্পে তা দেওয়ার পরিসর নেই—ঘটনাই হক, চরিত্রই হক, কথাবার্ত্তাই হক, সমস্তই তাতে খণ্ডিত, আংশিক। যতটা দেওয়া যাচ্ছে, তার বাইরে তার একটা আরম্ভ আছে,

একটা শেষও আছে, মাঝখান থেকে একটা টুকরোকে লেখক ফুটিয়ে তোলেন। এই যে অল্প একটু দেখা, এ সম্পূর্ণ নয়, কিন্তু গল্পের আসর এতেই সীমাবদ্ধ, এর বাইরে তাকে তৈরি করে নিতে হয় পাঠককে নিজের কল্পনা দিয়ে, উপন্যাসে যে প্রয়োজন একেবারেই হয় না। অথচ এই স্বল্প পরিসরের ভেতরই লেখক তাঁর সমস্ত মতবাদ প্রচ্ছন্ন রাখেন, সমস্ত বিচার-বিশ্লেষণ নিপুণভাবে প্রয়োগ করেন, কাজেই শিল্প হিসাবে ছোট গল্প হয়ে ওঠে অত্যন্ত compact জিনিষ। এই জিনিষ যখন সাধারণ্যে আদৃত, তখন বুঝতে হবে, সাধারণের রস-বুদ্ধি উন্নত হয়েছে।

এইখানে একটা কথা। বাংলা গল্প-সাহিত্যের সূচনা থেকে আধুনিকতম পরিণতি পর্য্যন্ত যত লেখকের আবির্ভাব হয়েছে, তাঁদের সকলকে নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আমাদের নেই। এই আলোচনায় আমরা মূলতঃ বাংলা গদ্যের উৎপত্তি ও বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে গল্প-পর্য্যায়টি কি ভাবে তার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং কোন্ কোন্ লেখক সেই ক্রমপরিণতির পথে তাকে সব চেয়ে [illegible] করেছেন, তারই একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে চেষ্টা [illegible] এই ভূমিকার ওপর এবার আমি গল্পসাহিত্যের ইতিহাসটা [illegible] বলে যাবো, হয়ত তাতে পুনরাবৃত্তিও কিছু হতে থাকবে। [illegible]র উপায় কি ?

[৪]

আগেই বলেছি, বাংলা ভাষায় প্রকৃত গল্প লেখা আরম্ভ হয় রবীন্দ্র-যুগে। 'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ প্রথম বিদেশী ধারায় ছোটগল্প লেখার সূত্রপাত করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠা ভগিনী স্বর্ণকুমারী দেবী এবং তিনি নিজে 'বালক' ও 'ভারতী' পত্রিকায়ও বহু গল্প লেখেন। এঁদের

অল্প পরেই আসেন একদা-বিখ্যাত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্র-নাথের সমসাময়িক, অল্প-পরবর্ত্তী এবং অনুগামীদের মধ্যে দীনেন্দ্র-কুমার রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, সরোজনাথ ঘোষ, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, জলধর সেন, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ লেখকেরাও বিভিন্ন পত্রিকায় অসংখ্য ভালো-মন্দ-মাঝারি গল্প লেখেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, মোপাসাঁ, ব্যালজাক, দোদে, গতিয়ে, জোলা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ফরাসী গল্প-লেখকদের উৎকৃষ্ট গল্পগুলি বাংলায় অনুবাদ করেন। বাংলা গল্পের উৎপত্তি ও পরিণতির এই ভূমিকা। এর ওপর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের আসন।

এঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমার এই দু'জনের গল্প দেশে এক সময় বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। জীবনের ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা স্তরকে আশ্রয় করেই রবীন্দ্রনাথের গল্প। মানব জীবনের যে সমস্ত বেদনা, যে সমস্ত অনুভূতি পৃথিবীর কাব্যে যুগে যুগে ভাষা পেয়েছে, কবি তাই নিয়েই এই সমস্ত গল্প লিখেছেন। প্রকৃতির নানা রূপান্তর, মানুষের নানা অবস্থা-বিপর্য্যয় তাঁর গল্পে জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তাঁর গল্পের ব্যঞ্জনা যেমন গভীর, তার ভঙ্গীও তেমনি মনোজ্ঞ। 'অর্থাৎ এরা উৎকৃষ্ট গল্প ত বটেই, উৎকৃষ্ট কাব্যও। 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'অধ্যাপক', 'আপদ' 'দুরাশা', 'মণিহারা', 'পোষ্টমাষ্টার', 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি গল্প যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই একথা বিশেষ ভাবে হৃদয়ঙ্গম করেছেন। পক্ষান্তরে প্রভাতকুমার জীবনের গভীর স্তরকে বিশেষভাবে স্পর্শই করেন নি। তার রঙ্গের দিকটা বা কৌতুকের অংশটাই তাঁকে বেশী করে নাড়া দিয়েছে, তাঁর সব চেয়ে ভালো লেখাগুলি সমস্তই হাসির। সে হাসি বিদ্বেষ-কলুষিত আক্রমণ নয়, নীতিজ্ঞান পরিচালিত সংস্কারক মনের শাণিত কষাঘাত-কলুষিত নির্ম্মম কৌতুকও নয়—তা স্বচ্ছ, সহজ ও

সর্ব্বজনগ্রাহ্য হাসি। জাতে তা নীচু, কিন্তু প্রকৃতিতে হৃদ্য। গভীর গল্প তাঁর নেই তা নয়, 'কুমুদের বন্ধু' বা 'ফুলের মূল্য' সত্যিই ভালো রচনা। কিন্তু 'বলবান জামাতা', 'রসময়ীর রসিকতা', 'মাষ্টার মশায়'ই তাঁর প্রতিভার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন।

এছাড়া আর যাঁদের নাম করেছি, তাঁদের মধ্যে অনন্যসাধারণতার দাবী কারুরই বড় নেই। এঁরা রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্ম্মী গল্প বা প্রভাত-কুমারের রঙ্গ-গল্পের মধ্যে একটা যোগ-সূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। কেউ কেউ বেশ সুখপাঠ্য, সুন্দর গল্পও লিখেছিলেন। বাঙালী গৃহস্থ জীবনের নানা সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা এঁদের গল্পে জীবন্ত হয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ-প্রভাতকুমারের পর এরা আদৌ অপ্রত্যাশিত নয়। তাছাড়া রবীন্দ্র-যুগের প্রথমাংশে বাঙালী পাঠকের সাহিত্য-জ্ঞান যখন ছিল সীমাবদ্ধ, যখন মোপাসাঁ-ব্যালজাক খুব কম বাঙালীই পড়েছিলেন, তখন এই ধরণের গল্প লোকে সাগ্রহে উপভোগ করতেন। পরে আর তা করা সম্ভব রইলো না, কারণ তখন পাঠকের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র হয়ে গেল প্রশস্ত। বাঙালী তখন বিশ্বসাহিত্যের [illegible] গিয়ে দাঁড়ালেন এবং সেই তুলনায় এই সব গল্প তাঁর কাছে [illegible]ই অকিঞ্চিৎকর ঠেকতে লাগলো।

গার্হস্থ্য প্রশান্তির চিত্র ও কাব্যিক মাধুর্য্য দিয়ে আর পাঠককে [illegible] গেল না। জীবনের আর সমস্ত দিক সম্বন্ধে পাঠকের দৃষ্টি অত[illegible] [illegible] হয়ে উঠলো। রবীন্দ্রনাথে জীবনের আদর্শবাদের দিকটা পূর্ণভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করেছিল, জীবনের প্রত্যক্ষতার দিকটা এবার প্রকাশের দাবী নিয়ে উপস্থিত হল। এই দাবী মেটালেন শরৎচন্দ্র। তিনিই বাংলার সাহিত্যে প্রথম নূতন কতকগুলি পথ খুলে দিলেন, যে পথ দিয়ে জীবনের যে সমস্ত বৃত্তি চিরদিন হেয় বলে, ঘৃণ্য বলে, আড়ালে

থেকেছে, স্বীকৃতির দাবী পায়" নি—মানুষ তাদের দেখেছে বুঝেছে, অথচ মেনে নেয়নি—তারা সবেগে আত্মপ্রতিষ্ঠ হল। অর্থাৎ তাঁর হাত দিয়েই বাংলা গল্প-সাহিত্যে মধ্যবয়সের পূর্ণতা এলো। তাঁর 'মহেশ', 'সতী', 'হরিলক্ষ্মী' প্রভৃতি গল্প পড়ে প্রত্যেক পাঠকই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবেন।

[৫]

শরৎচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গেই হেমেন্দ্র কুমার রায়, সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লোকেরাও প্রচুর ছোট গল্প লিখেছেন এবং রবীন্দ্র-শরৎ-প্রভাবান্বিত গল্প হিসাবে সে সমস্ত রচনার মূল্যও কম নয়। এঁরা কত রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভেতর দিয়ে বাংলা গল্পকে যাচাই করেছেন, কত রকম ধারা, ধরণ ও আদর্শ এনে বাংলা ভাষায় পত্তন করেছেন। এঁদের পর যাঁরা গল্প-লেখক রূপে দেখা দিলেন, তাঁরা যে এতটা সাফল্যের সঙ্গে লেখনী চালনা করতে পেরেছিলেন, তার কারণ এঁরা নিজেরা কেউ বড় স্রষ্টা না হয়েও, ভাবী সাহিত্যিকদের সৃষ্টির পথ বিশেষ ভাবেই প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

আধুনিক কালের গল্প লিখিয়েদের সকলের সম্বন্ধে আলোচনা করে উঠতে পারবো, এমন জায়গা আমাদের নেই। আর তা করারও সার্থকতা নেই। তাঁরা এখনো লিখে চলেছেন এবং তাঁদের সম্বন্ধে পাকাপাকি সিদ্ধান্তে উপনীত হবার সময়ও আসেনি। এঁদের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ কুমার সান্যাল ইত্যাদি বিশিষ্ট লেখকের লেখা কে না পড়েছেন? কয়লা-খাদের কুলী মজুরদের বা সাঁওতাল-কুর্মীদের জীবন নিয়ে শৈলজানন্দ যে সমস্ত গল্প লিখেছেন বা নিম্ন মধ্যবিত্ত

সহুরেদের জীবন নিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্র যে সমস্ত গল্প লিখেছেন, তা সাহিত্যে নূতন একটি দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রবর্ত্তন করেছে। শৈলজানন্দের এবং বিশেষ করে জগদীশ গুপ্তের লেখায় মানুষের বিকৃত মনস্তত্ত্বের যে রূপ প্রকাশ পেয়েছে, অথবা প্রেমেন্দ্র মিত্রের লেখায় যে বুদ্ধিদীপ্ত আধুনিক মনের ঔজ্জ্বল্য পরিস্ফুট হয়েছে, তা সত্যই বিস্ময়কর! প্রবোধ কুমার এবং অচিন্ত্য কুমার জীবন-রহস্যের ব্যাখ্যাতা রূপে এঁদের চেয়ে কমা, কিন্তু গল্পের আঙ্গিক বিন্যাসে উভয়েই উন্নততর পর্য্যায়ের লেখক। প্রবোধ কুমারের ব্যঞ্জনা-মধুর গল্পে জীবনের নানা বিচিত্র স্তর কাব্যিক সুষমা নিয়ে ফুটে উঠেছে। অচিন্ত্যকুমার ইদানীং সরকারী দপ্তরখানার অন্ধকারে অবরুদ্ধ নর-নারীর জীবন নিয়ে যে গল্পগুলি লিখেছেন, তা বাংলা ভাষায় একটি অনাবিষ্কৃত দিকের দরজা খুলে দিয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সরোজ কুমার রায়চৌধুরী, মনোজ বসু, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র ঘোষাল, আশীষ গুপ্ত, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ লেখকের গল্পও ইদানীন্তন সাহিত্যে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়েছে। বিভূতি বন্দ্যো-[illegible] দেখিয়েছেন পল্লী-প্রকৃতির পটভূমিতে সুখ-দুঃখে প্রবাহিত প্রাত্যহিক জীবনের প্রাচুর্য্য—তারাশঙ্কর এঁকেছেন তার বিলুপ্ত গরিমার মহাশ্মশান—মনোজ ফুটিয়েছেন পল্লী-জীবনের ভাব-স্বপ্ন, সরোজকুমার [illegible] বাস্তব চিত্র, তার দলাদলি, তার কুৎসা কলঙ্ক, দুঃখ দৈন্যের [illegible]। বিভূতি মুখোপাধ্যায় হাসি-কান্নার যুগপৎ মিশ্রণে গার্হস্থ্য জীবনের নিত্য বহমান ধারাকে তাঁর গল্পে রূপায়িত করেছেন। এঁরা সকলেই সুলেখক, ভাষা-সম্পদে, লিপি-চাতুর্য্যে, গল্প-গঠনে এঁদের কৃতিত্ব মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার যোগ্য। কিন্তু দৃষ্টি-ভঙ্গীর বিচারে এঁরা অনাধুনিক —অন্ততঃ শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, জগদীশচন্দ্রের মতো অনুপেক্ষণীয়

স্বাতন্ত্র্য এঁদের রচনায় পাই না। অবিনাশচন্দ্র এবং মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় সে হিসাবে আধুনিকতর আদর্শের লেখক। যৌন-বৃত্তির নানা ব্যতিক্রম স্বাভাবিক জীবনের ও সহজ ভব্যতার আড়ালে থেকে, কি করে জীবনে আবর্ত্ত সৃষ্টি করে, অবিনাশচন্দ্র তা অনাবৃত করে দেখিয়েছেন এবং তাতে দুঃসাহসের অভাব নেই। এই দুঃসাহসেরই আরো কয়েকটি দিক প্রকাশ পেয়েছে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায়—যদিও অবশ্য বিকৃত জীবন আঁকতে বসে, তিনি জীবনকেই অনেক স্থলে বিকৃত করে এঁকেছেন, তাই তাঁর গল্পে বাস্তবতার নামে বীভৎসতা প্রবল হয়ে উঠেছে। অবিনাশচন্দ্র এবং মাণিক, উভয়েরই ভাষার ধার লক্ষ্যণীয়। আশীষ গুপ্তের রচনাও যথেষ্ট শক্তির পরিচয় বহন করে—তা যেমন পরিচ্ছন্ন, তেম্নি সংহত। নূতন সাহিত্যাদর্শের প্রবর্ত্তনে এঁরা প্রত্যেকেই উল্লেখের যোগ্য।

আধুনিক কালে হাসির গল্প রচনাতেও বহু লেখক মনোনিবেশ করেছেন। পরশুরাম, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, স্বর্গীয় রবীন্দ্রনাথ মৈত্র, বিশ্বপতি চৌধুরী, অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, বনফুল, সজনীকান্ত দাস প্রমুখ লেখকের হাসির গল্প পাঠকরা অবশ্যই পড়ে থাকবেন। এঁদের মধ্যে সত্যিকার সাহিত্য-শিল্পী হলেন পরশুরাম—যিনি বাইরে হাস্য-পরিহাসের আবরণ টেনে দিয়ে, ভেতরে হিংসার নখ-দন্ত গোপন করে রাখেন নি। জীবন সম্বন্ধে তাঁর সুগভীর অভিজ্ঞতা ও সহজ সত্যদৃষ্টি এমনি উঁচু পর্দ্দায় যে বাংলার সনাতন হাস্যরসের ইতিহাসে তাঁর জুড়িই মেলে না।

এইখানেই আপাততঃ আমরা শেষ করলাম। কিন্তু আমাদের গল্প সাহিত্যের ধারা এখানেই থেমে নেই—তা পূর্ণ বেগে প্রচুরতর সম্ভাবনীয়তার দিকেই এগিয়ে চলেছে, যার ইতিহাস অন্য কোন ভাগ্যবান আবার কোন দিন লিখবেন।

অষ্টম অধ্যায়

শিশু সাহিত্য

[শিশুদের জন্যে পৃথক করে সাহিত্যের রচনার প্রয়োজন বাঙালী লেখকরা বিগত শতাব্দীতে অনুভব করেন নি। তখন ছেলে-মেয়েদের জ্ঞানবৃদ্ধির জন্যে পাঠ্য পুস্তক লেখা হত এবং তাতে গদ্যে-পদ্যে জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবেশ এবং উপদেশ বিতরণ করা হত। বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মদনমোহন তর্কালঙ্কার, মনোমোহন বসু, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার সকলেই এই কাজ করে গেছেন। শিশুদের আনন্দ ও কৌতুকের ভেতর দিয়ে শিক্ষা দেবার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেন নি। এটা করলেন রবীন্দ্র-যুগের লেখকরা। এঁদের মধ্যে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যোগীন্দ্রনাথ সরকার, সুকুমার রায় চৌধুরী পথ-প্রদর্শক স্বরূপ। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে শিশুদের জন্যে লিখেছেন এবং অন্যকে লেখবার প্রবর্ত্তনা দিয়েছেন। শিশুদের জন্যে নানা রকমের মাসিক এবং উপহারের বই ইদানীং কালে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ আকর্ষণ হয়েছে। আজকের বিশিষ্ট লেখক সকলেই ছেলেমেয়েদের জন্যে কিছু-না-কিছু লিখেছেন—শরৎচন্দ্র, হেমেন্দ্রকুমার, সৌরীন্দ্রমোহন, শৈলজানন্দ, প্রেমেন্দ্র, সকলেরই শিশু-সাহিত্যে অল্প-বিস্তর দান আছে। আধুনিক কালের লেখকদের মধ্যে কাব্যে সুনির্ম্মল বসু ও গল্পে শিবরাম চক্রবর্ত্তী শিশু-সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক রূপে খ্যাত হয়েছেন। আজকের শিশু-সাহিত্যে একদিকে যেমন কবিতা, গল্প ও উপন্যাসের ভীড় হয়েছে, অন্যদিকে তেম্নি দেশ-বিদেশের ইতিহাস, ভূগোল ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিত্তাকর্ষক বিবরণ সমূহ লেখা হচ্ছে এবং বিশিষ্ট লেখকরাই সে ভার নিয়েছেন। আশা করা যায়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো এদেশেও একদিন এমন সাহিত্যিক জন্মাবেন, যাঁরা শিশু-সাহিত্য রচনা করেই বিশ্ব-সাহিত্যে বরণীয় হবেন।]

[১]

শিশু-সাহিত্য বলে কোন বিশেষ শ্রেণীর সাহিত্য হতে পারে কিনা সন্দেহ, কারণ যা শিশুদের লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে, তা যদি সত্যি জাতের সাহিত্য হয়ে থাকে ত তা পড়ে, বড়রাও প্রচুর আনন্দ পেতে পারেন, এ কথা পৃথিবীর বিখ্যাত শিশু-সাহিত্য যা, তাতে বিশেষ ভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। হ্যান্স এণ্ডারসনের বা গ্রীমের রূপকথা, 'আজব দেশে এলিস, 'রবিনসন ক্রুসো', 'গালিভারের ভ্রমণ', ষ্টীভেনসনের 'শিশুদের কবিতার বাগান', কিপলিং-এর 'বুনো বই', ধনগোপালের 'পায়রা', মেটারলিঙ্কের 'নীল পাখী', আসলে লেখা ছোট ছেলে-মেয়েদের জন্যে, কিন্তু বড়দের আসরেও এরা উপেক্ষিত হয় নি, সাহিত্যের মূল শাখা থেকে এই সমস্ত রচনাকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা বা দেখাও হয় নি। আমাদের দেশে কিন্তু শিশু-সাহিত্যকে একটা স্বতন্ত্র জাতের সাহিত্য বলেই গণ্য করা হয় এবং ছেলে-মেয়েদের জন্যে যাঁরা লিখেছেন বা লেখেন, তাঁদের রীতিমতো অকুলীন বলেই ধরা হয়।

অবশ্য একথা ঠিক যে ইদানীং আমাদের দেশে যে শ্রেণীর শিশু সাহিত্য প্রত্যহ পায়কারি হারে উৎপন্ন হচ্ছে, তার অনেকটুকুই জন্মাচ্ছে অসাহিত্যিক লেখক এবং অসমঝদার প্রকাশকের ব্যবসায়িক বুদ্ধি থেকে। তাই তাতে সাহিত্যের কুল-লক্ষণ থাকে কম, আকর্ষণ থাকে প্রচুর। যেমন-তেমন একটা রচনাকে ত্রিবর্ণরঞ্জিত মলাটে বেঁধে, অজস্র ছবিতে ঢেকে, রকমারি কৌশলে ছেপে বাজারে ছাড়া হয়। সেই সব ঝকঝকে বই স্কুলের প্রাইজে, জন্মদিনের উপহারে সমাদরের সঙ্গে গৃহীত হয়। ছোটদের বিচারবিমূঢ় মন রচনার ভালোমন্দ বোঝে না, বইয়ের লোভনীয়তায় মুগ্ধ হয় এবং সেই মোহের সুযোগেই এরা আসর মাৎ করে ফেলে। বলা বাহুল্য, এই শ্রেণীর সাহিত্য মণিহারী জিনিষের

সামিল এবং যাঁরা এর উৎপাদক, তাঁদের উঁচুদরের সাহিত্যিক বলা শুধু প্রকৃত সাহিত্যিকদের অপমান করা! কিন্তু সত্যিকার সাহিত্যিকরাও শিশুদের জন্যে লেখনী ধরেছেন। তাঁদের হাত দিয়ে যে সমস্ত বই জন্মেছে, তা শিশু সাহিত্যরূপে ত বটেই, সাধারণ সাহিত্য হিসাবেও সমাদৃত হবার যোগ্য।

রবীন্দ্র-যুগের আগে বাংলাদেশে ছোটদের জন্যে পাঠ্যপুস্তক ছাড়া আর কোন রকমের বইই ছিল না। বিদ্যাসাগরের 'কথামালা', 'বোধোদয়', 'আখ্যানমঞ্জরী', অক্ষয় দত্তের 'চারুপাঠ', মদনমোহন তর্কালঙ্কারের 'শিশুশিক্ষা', মনোমোহন বসুর 'পদ্যমালা' ইত্যাদি বই এদেশের সকলেই ছেলেবেলায় পড়েছেন। একটু ওপরের দিকে উঠে, তাঁরা পেয়েছেন 'সীতার বনবাস', 'শকুন্তলা', 'কাদম্বরী', 'রামের রাজ্যাভিষেক', 'টেলিমেকস'। আরো ওপরে উঠে, বাইরের বই পড়ার তাগিদ যখন প্রবল হয়েছে, তখন লুকিয়ে পড়েছেন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস, দীনবন্ধুর নাটক, মাইকেল-নবীন-হেমচন্দ্রের কাব্য—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। কেউ কেউ হয়ত ওরি মধ্যে একটু 'হরিদাসের গুপ্তকথা', নয়ত 'মডেল ভগিনী'র মিশেল দিয়ে নিয়েছেন। কিন্তু ঐ পর্য্যন্তই। অর্থাৎ পাঠ্যপুস্তকের এলাকার বাইরে, তাঁদের বয়স ও বুদ্ধির ক্রমবর্দ্ধনশীল গতিকে যথাযোগ্য পথ্য দিয়ে নিয়ন্ত্রিত করার মতো কোন বই দেশে ছিল না। তাই দুর্ব্বল পাকস্থলিতে গুরুপাক পথ্য প্রবেশ করিয়ে, সে-কালের ছেলে-মেয়েরা ভুগতেন অকাল-পক্কতার অজীর্ণ রোগে। এই রোগ সারাবার জন্যে সাহিত্যের মূল শাখা থেকে খাল কেটে, নূতন একটা খাড়ি তৈরী করে নেওয়া হল রবীন্দ্র-যুগে, যার নাম হল শিশু-সাহিত্য।

আগেই বলেছি, সত্যিকার শিশু-সাহিত্য লেখা সুরু হয় রবীন্দ্র-যুগে।

রবীন্দ্র সমসাময়িক কবি-সাহিত্যিক যাঁরা এদিকে মনোনিবেশ করেছিলেন, তাঁদের সঙ্গে এখানকার ছেলে-মেয়েদের পরিচয় অনেকটা আলগা হয়ে আসছে। কিন্তু সেদিন দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদারের 'ঠাকুরমা'র ঝুলি', অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজকাহিনী', যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'হাসিখুসী', 'বনেজঙ্গলে', উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর 'টুনটুনির বই', নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'টুকটুকে রামায়ণ' দেশের ছেলে-মেয়ের চোখের সামনে একটি নূতন রাজ্যেরই দরজা খুলে দিয়েছিল। 'বীবরের বাসস্থান', 'মিথ্যা কথা বলার পরিণাম,' 'জল', 'বায়ু', 'ঈশ্বর' বা এই ধরণের গুরুগম্ভীর বিষয়ের ওপর অধিকতর গুরুগম্ভীর ভাষায় লেখা প্রবন্ধের জাঁতাকলে যাদের বুদ্ধি ও কল্পনা দিনের পর দিন ঘা খেয়ে খেয়ে মৃতপ্রায় হয়ে উঠেছিল, রাক্ষসক্ষোসদের, ভূতপ্রেত, দানা যক্ষ পরীদের কাহিনী বা রাজপুতদের বীরত্ব কাহিনী পড়ে, তারা হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছিল।

অবনী ঠাকুরের শিল্পোজনোচিত রঙীন ভাষা, কথা দিয়ে ছবির পর ছবি এঁকে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া—সেই গল্পের ভেতর এক দিকে কাব্যের সুষমা বৃষ্টি করে চলা, অন্যদিকে পৃথিবীর মাটিকে আলতো পায়ে মাড়িয়ে চলা, যেমন বিচিত্র, তেমনি অদ্ভুত। বাংলা গদ্যের প্রাণবন্ত কাব্য-রূপ যাঁরা দেখতে চান, 'রাজকাহিনী' তাঁদের পড়া চাইই। দক্ষিণারঞ্জনের ভাষাও চমৎকার। রূপকথা বলার যে নিজস্ব ধরণ এ-দেশের ঠাকুরমা-দিদিমাদের মুখে-মুখে চলিত ছিল, দক্ষিণারঞ্জন তাকেই সাহিত্যের ভাষায় রূপ দিয়েছেন। ঘরোয়া ফ্রেজ-ইডিয়াম, খাস বাংলা ষ্টাইল—তার বিচিত্র বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, নাম ধাতু ইত্যাদির ব্যবহারে রচনা কি রকম জীবন্ত হয়ে ওঠে, 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে তার পরিচয় পাবেন। যোগীন সরকারের জীবজন্তুদের গল্প, তাদের

অদ্ভুত বুদ্ধি ও অদ্ভুততর কার্য্য-কলাপের বিবরণ, আর সেই বিবরণ লেখবার মতো ঝরঝরে হাল্কা ষ্টাইল, যে-কোন দেশের সাহিত্যেই চিরস্মরণীয় হত। তাঁর 'হারাধনের দশটি ছেলে'কে কে ভুলেছে? নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'টুকটুকে রামায়ণ' যিনি পড়েননি, তিনি বাংলা রামায়ণের আসল রসই পাননি।

উপেন্দ্রকিশোর বাংলাদেশে শিশু সাহিত্যের একজন পায়োনিয়ার। তিনি নিজে ত গদ্যে ও পদ্যে প্রচুর লিখেছিলেনই, অন্যকেও লিখবার প্রবর্ত্তনা দিয়েছিলেন 'সন্দেশ' নামক শিশুদের মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠা করে। সন্দেশ যেদিন প্রথম বেরুলো, বাংলাদেশের ছেলে-মেয়েদের সে কি আনন্দের দিন! এমন ছবি, এমন ছাপা, এমন সুন্দর গল্প-কবিতা তারা কখনো দেখেনি। 'সদ্ভাবশতক', 'শিশুবোধক' আর 'আখ্যান মঞ্জরী'র চড়াই উৎরে, এমন একটি বিচিত্র স্বপ্ন-রাজ্যের সন্ধান বাঙালী ছেলে-মেয়ে প্রথম যাঁর কাছে পেয়েছে, সেই অদ্ভুতকর্ম্মা উপেন্দ্র-কিশোরকে দেশ চিরদিন মনে রাখবে। সন্দেশের আগেও অবশ্য ছেলে-মেয়েদের মাসিকপত্র হয়েছিল কয়েকখানি—প্রমদাচরণ সেনের 'সখা' ও ভুবনমোহন রায়ের 'সাথী' (পরে দুটি একত্র হয়ে 'সখা ও সাথী') তার মধ্যে প্রধান। 'মুকুল' ও বোধহয় এই সময়েরই কাগজ। কিন্তু 'সখা ও সাথী'ই হক, আর 'মুকুল'ই হক, 'সন্দেশে'র আগে সত্যিকার মাসিকপত্র হয়নি একটিও।

সন্দেশ থেকেই প্রসিদ্ধ সুকুমার রায়চৌধুরীর সঙ্গে বাংলা দেশের পরিচয় হ'ল। এঁর 'আবোল তাবোল' এবং এবং 'হ-য-ব-র-ল' পড়েন নি, এমন কোন ছেলে-মেয়েই সেদিন ছিলেন কিনা সন্দেহ! বড়দের লেখায় ছন্দোবৈচিত্র্য এনে স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত যেমন নাম করে-ছিলেন, ছোটদের লেখায় সুকুমার রায়চৌধুরীর নাম তার চেয়ে

কম হবার কথা নয়। কিন্তু এইটুকুই তাঁর প্রতিভার সমগ্র পরিচয় নয়। তাঁর ছড়াগুলোর একদিকে যেমন অপূর্ব্ব কথার কেরামতি, অন্যদিকে তাদের আপাত-পাগলামির ভেতর তেমনই সত্যিকার রসিকতার ছোঁয়া তাদের এতখানি জনপ্রিয় করেছিল। সেই 'রামগরুড়ের ছানা, হাসতে তাদের মানা', নয়ত, 'ও হরিদাস আয় ত দেখি', নয়ত 'শুনতে পেলুম পোস্তা গিয়ে, তোমার নাকি মেয়ের বিয়ে' প্রভৃতির চেয়ে উৎকৃষ্ট ছড়া বোধকরি আজো কেউ লেখেন নি। এমন কি, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই 'খাপছাড়া' বইয়ে সুকুমার রায় চৌধুরীর পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। আজো শিশু সাহিত্যের কবিতা-ভাণ্ডার প্রধানতঃ ভরে রয়েছে সুকুমার রায় চৌধুরীর অনুকরণে লেখা কবিতায়। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁর লেখার প্রভাব দেশের ওপর কতকটা পড়েছিল।

[২]

সুকুমার রায়চৌধুরীর সমসাময়িক মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ লেখক ছোটদের জন্যে গল্প লিখে খ্যাতিমান হন। সৌরীন্দ্রমোহনের 'চালিয়াৎ চন্দর' এবং হেমেন্দ্রকুমারের 'যখের ধন' আধুনিক শিশু সাহিত্যের বিশিষ্ট রচনা—বড়রাও তা থেকে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন। এঁদের আগেকার লেখকরা লিখেছেন রূপকথা—ভূত-প্রেত রাক্ষস-খোক্ষস রাজা-রাণীর গল্প। যুগ-রুচির পরিবর্ত্তনে এঁরা ঘরোয়া মানুষদের নিয়ে গল্প লেখার সূচনা করেছেন এবং সেই জন্যেই এঁদের লেখা এত বেশী আদৃত হয়েছে। এঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার পরে সম্পূর্ণরূপেই শিশু-সাহিত্যে আত্ম-নিয়োগ করেছেন এবং এখনকার হিসাবে বোধহয় এ রাজ্যে তিনিই সবচেয়ে বেশী জনপ্রিয় লেখক। তাঁর হাত দিয়ে বাংলা শিশু

উপন্যাসে অ্যাডভেঞ্চার কাহিনী প্রবেশ করেছে। সেই অ্যাডভেঞ্চার ক্রমে আজ বাড়াবাড়িতে গিয়ে পৌঁছেছে অপরাপর লেখকদের হাতে। কুমীরের মস্তিষ্ক মানুষের মাথায় চালানো, বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে মরা মানুষকে নাচানো, আটলাণ্টিকের কোন অনাবিষ্কৃত দ্বীপে নিয়ে গিয়ে বাঙালীর ছেলেকে দিয়ে একটি গুপ্ত সহর স্থাপন করানো, কঙ্গো, ব্রেজিল, ফিজি, সাংহাই-এ ফেলে তার বল-বীর্য্যের পরাকাষ্ঠা দেখানো, এম্নি সমস্ত উদ্ভট ব্যাপার আজকের অ্যাডভেঞ্চার নভেলকে পেয়ে বসেছে। আগেকার রূপকথাকে আজ অবিশ্বাস্য এবং অবাস্তব বলে বাতিল করা হয়, কিন্তু তার ভেতর ছিল কবি-কল্পনার সুষমা— এই সব অধিকতর অবিশ্বাস্য লেখায় তা নেই, আছে সস্তা বিদেশী বইয়ের নকল। এজন্যে হেমেন্দ্রকুমার আর কি করবেন? তিনি আদর্শ দিতে পারেন, কিন্তু যার মস্তিষ্ক নেই, তাকে তা ত দিতে পারেন না!

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ শিশু-সাহিত্য যা রচনা করেছেন, যেমন 'সে', 'ছড়ার ছবি', 'মুকুট' 'খাপছাড়া'—সাহিত্য হিসাবে তা খুবই সুন্দর। কিন্তু তার আবেদন অনেকটা উঁচু পর্দ্দায় বাঁধা, যা অপরিণত-দৃষ্টি ছেলেমেয়ের নাগালের বাইরে। শিশু তাঁর এই সমস্ত রচনার বিষয়, কিন্তু সব সময় তারাই এর পাঠক নয়। যদিও অবশ্য 'সে' বইয়ের 'গেছো বাবা'র কাহিনী বা 'হাঁচিয়ান্দিয়ানি কুরুক্কুনা'র গল্প এবং 'খাপছাড়া'র বহু ছড়া তাদের বিশেষ ভালো লাগে, 'ছড়ার ছবি'র অনেক কবিতাও তারা সানন্দেই পড়ে বা আবৃত্তি করে! লেখনীকে যতটা নীচু গ্রামে নামিয়ে আনলে, তা থেকে পরিণত বয়সের গভীরতা ঝেড়ে ফেলা সম্ভব, কবি তা পারেন নি—তাই তাঁর শিশু সাহিত্য ঠিক শিশুদের সাহিত্য হয়নি! শরৎচন্দ্রেরও ছোটদের গল্পের একটি

সঙ্কলন বের হয়েছে, 'ছেলেবেলার গল্প'—অত বড় শিল্পীর উপযুক্ত না হলেও, তাতে মজার জিনিষ ঢের আছে। এঁদের দলবর্ত্তী লেখক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বা কার্ত্তিক দাশগুপ্ত, রবীন্দ্র সেন, যোগেন্দ্র গুপ্ত, কুলদারঞ্জন রায়, সুখলতা রাও প্রভৃতি (যাঁরা কেবলমাত্র শিশু-সাহিত্যই রচনা করেছেন), তাঁরাও দেশের ছেলে-মেয়েকে যথেষ্ট হাসি-কান্নার, কৌতুক ও উপদেশের উপকরণ জুগিয়েছেন। আজকের বিশিষ্ট কথা-সাহিত্যিকরাও প্রায় সকলেই ছোটদের জন্যে কিছু-না-কিছু লিখেছেন, এখনো লিখছেন।

আজকের শিশু-সাহিত্যে গল্প-কবিতা ছাড়াও বহু প্রয়োজনীয় জিনিষ এসেছে। তার মধ্যে প্রধান হল দেশ-বিদেশের ক্ল্যাসিক সাহিত্যকে ছোটদের মতো করে লেখা, তারপর ইতিহাস, বিজ্ঞান এবং জ্ঞানের অপরাপর শাখা সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলির সহজবোধ্য ভাষায় পুনর্লিখন! এই দুটি জিনিষের জন্যেই আজকের শিশু-সাহিত্য তার সত্যিকার শ্রেষ্ঠতা লাভ করেছে। 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ', 'পৃথিবীর সেরা সাহিত্য', 'জ্ঞান বিজ্ঞানের কি ও কেন', 'দেশবিদেশের গল্প', 'ভিক্টর হুগোর গল্প', 'সেক্সপীয়ারের গল্প', ওল্ড কিউরিওসিটি সপ', 'আজব দেশে এলিস', 'টলষ্টয়ের কাহিনী'—আজকের শিশু-সাহিত্যে প্রচুর বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। 'শিশু ভারতী'র নামও এই সঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, ছোটদের Cyclopaedia হিসাবে যা প্রথম।

নিছক সাহিত্যের দিকেও ইদানীন্তন লেখকরা কম মন দেন নি। 'মৌচাক', 'শিশুসাথী', 'রামধনু', 'পাঠশালা', 'রংমশাল' বিভিন্ন কাগজে তাঁদের রচনার সাক্ষাৎ পাই। এঁদের মধ্যে কবিতায় সুনির্ম্মল বসু এবং গল্পে শিবরাম চক্রবর্ত্তী বিশিষ্টতার পরিচয় দিয়ে যশস্বী হয়েছেন।

ভ্রম সংশোধন

বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'সারদা মঙ্গল' বেরিয়েছিল 'আর্য্যদর্শন' পত্রিকায়, আর তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'স্বর্ণলতা' বেরিয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুরে'। এ দুয়েরই প্রকাশকাল হল ১৮৭১-৭২, কিন্তু এ দুটি বই কোনদিন 'অবোধ বন্ধু' নামক পত্রিকায় বের হয়নি। রবীন্দ্রনাথ বাল্যে আর্য্যদর্শন পড়তেন এবং জ্ঞানাঙ্কুরে তাঁর প্রথম কাব্য 'বন ফুল' প্রকাশিত হয়েছিল, সুতরাং এই দুই গ্রন্থকারের প্রভাব তিনি ঐ দুটি কাগজ থেকেই পেয়েছিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কোন লেখকের ভুল অনুসরণ করে আমি এই ভুল ঘটিয়েছি। আর একটু ভুল করেছি 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' গ্রন্থের সময়কাল নিয়ে। এর রচয়িতা প্রতাপ ঘোষ কালীপ্রসন্ন সিংহের বন্ধু ছিলেন, অতএব তিনি প্রাক্-রবীন্দ্র লেখক নন, প্রাক্-বঙ্কিম লেখক। এই ভুলের কারণ হল শকাব্দ সংযুক্ত একখানি পুরাতন বই, যা থেকে তারিখ উদ্ধার করার সময় আমি হিসাবে গরমিল করে ফেলেছি।